ত্রয়ী

বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ

ডঃ অপর্ণা মৈত্র

এম. এ, ডি. ফিল।

প্রাপ্তিস্থান :—

দাশগুপ্ত এণ্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড।

৫৪/৩, কলেজ ষ্ট্রীট।

কলিকাতা—১২

প্রকাশক :—
শ্রী রঞ্জিতা মৈত্র, বি. এস. সি।
কোঃ নং বি ২৪৬, বি, ই, কলেজ
হাওড়া-৩

মুদ্রাকর :—
শ্রীবিভাস কুমার গুহঠাকুরতা
ব্যবসা ও বাণিজ্য প্রেস।
৯/৩ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট।
কলিকাতা-৯

পরমারাধ্য পিতৃদেব

৺স্বরাজলাল লাহিড়ীর

উদ্দেশে

নিবেদিত

— মুখবন্ধ —

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি,ফিল (কলা) উপাধির জন্য উপস্থাপিত "বঙ্কিমচন্দ্রের ত্রয়ী ও রবীন্দ্রনাথের ত্রয়ী" গবেষণাপত্রের পরিবর্তিত ও পরিমার্জিত রূপে এই পুস্তক প্রকাশিত হ'ল। গবেষণাকালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রাক্তন প্রধান কীর্তিমান সাহিত্যিক শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক প্রমথনাথ বিশী মহাশয়ের কাছ থেকে অকৃপণভাবে নির্দেশ, উপদেশ ও উৎসাহ পেয়েছি—তাঁর অসীম স্নেহধারা আমাকে আচ্ছন্ন করেছে। স্বতোৎসাহী হয়ে তিনি আমার এই গ্রন্থের ভূমিকাও লিখে দিয়েছেন। আমার বিশ্বাস এই ভূমিকাই আমার গ্রন্থের একমাত্র ভূষণ। তাঁর প্রতি আমার গভীর শ্রদ্ধা প্রকাশের এই সুযোগে আমি তাঁর নীরোগ দীর্ঘজীবন কামনা করি।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রাক্তন প্রধান অধ্যাপক বিজনবিহারী ভট্টাচার্য্য, শান্তিনিকেতনের অধ্যাপক অশোকবিজয় রাহা ও পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ ঘোষাল মহাশয়েরা আমার গবেষণার স্বীকৃতি দিয়ে আমাকে গৌরবান্বিত করেছেন—তাঁদের সশ্রদ্ধ ধন্যবাদ জানাই। আমার শিক্ষাগুরু অধ্যাপক ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের কাছে আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের তদানীন্তন সমস্ত অধ্যাপকই প্রয়োজনমত আমাকে সাহায্য ও উৎসাহ দিয়েছেন—তাঁদের আলাদাভাবে কৃতজ্ঞতা জানাতে না পারার ত্রুটির জন্য আশাকরি তাঁদের মার্জনা পাব। এছাড়া আরও অনেকের কাছে গবেষণা থেকে পুস্তক প্রকাশ পর্য্যন্ত বিভিন্ন সময়ে যে সহায়তা পেয়েছি তার জন্য তাঁদের কাছেও আলাদাভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা সম্ভব হ'ল না স্থানাভাবে, আশা করি তাঁদেরও মার্জনা পাব।

পুস্তকের বিষয়বস্তু সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করাই রীতিসম্মত। শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক প্রমথনাথ বিশী মহাশয়ের ভূমিকাতে সেই কাজ এমন সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়েছে যে আমার পক্ষে সে বিষয়ের অবতারণা বাহুল্যই হবে। কিন্তু লেখকের নিজস্ব বক্তব্য হিসাবে দু একটি কথা বলা প্রয়োজন।

বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন যুক্তিবাদী লেখক। কেবলমাত্র সৌন্দর্য্যসৃষ্টির জন্য সাহিত্য রচনা তিনি করেননি বললেই হয়। তবু প্রথম পর্বের উপন্যাসে তাঁর মতবাদ

প্রচ্ছন্ন ছিল, সৌন্দর্য্যই প্রাধান্য পায়। কিন্তু শেষ পর্বের উপন্যাসে তাঁর মতবাদ একেবারে স্পষ্ট। এইখানে কবি বঙ্কিম ও সৌন্দর্য্যসাধক বঙ্কিমের সঙ্গে দেশের ও জাতির অভিভাবক যুক্তিনিষ্ঠ স্বদেশপ্রেমিক বঙ্কিম মিলিত হয়েছেন। এই শেষ পর্বের তিন খানি উপন্যাসে তিনি জাতিগঠনের উদ্দেশ্য নিয়ে এক তত্ত্ব প্রচার করেছেন। এই তিনটি উপন্যাসের বক্তব্যের ঐক্য লক্ষ্য করে এদের 'ত্রয়ী' বলা হয়।

রবীন্দ্রনাথের মানসিকতা ভিন্ন ভিন্ন পর্বে কাব্যে, গানে, নাটকে, ছোটগল্পে ও প্রবন্ধে বিচিত্ররূপ গ্রহণ করেছে। প্রকৃতির ঋতু বদলের মত কবির মনেও নানা বয়সে নানা সময়ে রং বদল হয়েছে। তাই রবীন্দ্র সাহিত্যে এত রূপ, রস, বর্ণ, গন্ধ—এত অপরূপ বৈচিত্র্য। বিপুল রচনা সম্ভারের মধ্যে তাঁর উপন্যাসগুলিও কাব্য-সৌন্দর্য ও মননধর্মী বক্তব্যে পর্ব থেকে পর্বান্তরে নতুন নতুন স্বাদে ও সৌন্দর্যে, বৈশিষ্ট্যে ও বৈচিত্র্যে ভরা। তাঁর প্রথম পর্বের উপন্যাস 'বৌঠাকুরানীর হাট' ও 'রাজর্ষি'। দ্বিতীয় পর্বে—'চোখের বালি', 'নৌকাডুবি' ও 'গোরা'। এই দ্বিতীয় পর্বের উপন্যাস রচনার সময়ে রবীন্দ্রনাথ এক মানসদ্বন্দ্বে অস্থির হয়েছিলেন। এই উপন্যাসগুলি আরম্ভ হবার কিছু আগে থেকে তিনি হিন্দুত্বের ভাবোচ্ছাসে ভরপুর ছিলেন। প্রাচীন ভারতীয় আদর্শকে দেশের জাগরণের জন্য প্রচার করা প্রয়োজন বলে তাঁর মনে হয়েছিল। যদিও সাহিত্যে কোন মতবাদ প্রচার রবীন্দ্রনাথের মনের মত নয় তবুও এই সময়ে তিনি অল্পকালের জন্য হলেও প্রাচীন সনাতন আদর্শে এতদূর আচ্ছন্ন ছিলেন যে নিজের রীতিবিরুদ্ধ কাজই করেছেন এবং অল্পদিনের মধ্যেই এই আবেশ কাটিয়ে পুনরায় নিজের মুক্ত স্বরূপে ফিরে এসেছেন। এই পর্ব তাঁর প্রাচীন মতবাদের আচ্ছন্নতা ও মুক্তির জন্য খ্যাত। এই সময়কার বিশিষ্ট মানসিক চিন্তাধারার বাহক হিসাবেই এই উপন্যাসগুলির বৈশিষ্ট্য আরও পরিস্ফুট। তাই বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ', 'দেবীচৌধুরাণী' ও 'সীতারাম'কে যেরকম বঙ্কিমচন্দ্রের 'ত্রয়ী' বলা হয়,—রবীন্দ্রনাথের বিশেষ সময়ের এক চিন্তাসূত্রে গ্রথিত এই উপন্যাস তিনটি —'চোখের বালি', 'নৌকাডুবি' ও 'গোরা'কে রবীন্দ্রনাথের 'ত্রয়ী' বলে প্রতিষ্ঠিত করাই এ গ্রন্থের মূল বক্তব্য।

বিপুল রবীন্দ্রানুরাগী পাঠক সমাজের একাংশের কাছেও যদি আমার এই গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয় গ্রহণীয় হয় তবে নিজেকে সার্থক মনে করবো।

২।৭।৫৬ অপর্ণা মৈত্র

হাওড়া।

সূচীপত্র

ভূমিকা

বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠ, দেবীচৌধুরাণী ও সীতারাম উপন্যাস তিনখানি ত্রয়ী নামে পরিচিত। এদের ভাবসাম্যে নামও সাম্য। উপন্যাস তিন খানির কথাবস্তু এক নয়, যদিচ প্রথম দুখানির ঘটনাকালের অল্প ব্যবধান। শেষের খানির পটভূমিকা বাদশাহী আমল। উপন্যাসগুলির মানের সার্থকতা নিয়ে পণ্ডিত সমাজে মতভেদ আছে কিন্তু এদেশের রাজনীতি ও সমাজের উপরে তাদের প্রভাব সম্বন্ধে মতভেদের অবকাশ নেই। আনন্দমঠের প্রভাব সবচেয়ে বেশী তারপরেই দেবীচৌধুরাণী, সীতারামের প্রভাব তেমন বেশী নয়। আগে ভাবসাম্যের কথা বলেছি। সেই ভাবসাম্যের ভাবটি বঙ্কিমচন্দ্রের অনুশীলন বা ধর্মতত্ত্ব গ্রন্থে জীবিত।

রবীন্দ্রনাথ ও বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস সংখ্যা প্রায় সমান সমান। তারমধ্যে চোখের বালি, নৌকাডুবি ও গোরা পর পর অল্পকালের ব্যবধানে লিখিত। আগের উপন্যাস দুখানি বহুকাল আগে লিখিত এবং তাঁর কাঁচাহাতের রচনা, গোরার পরবর্তী উপন্যাসগুলির প্রসঙ্গ এক্ষেত্রে আসে না। চোখের বালি প্রভৃতি উপন্যাস তিনখানিতে একটা ভাবসাম্য কিংবা ভাবের রূপান্তর আছে। এই ভাবসাম্য বা রূপান্তরকে অবলম্বন করে এদেরও রবীন্দ্রনাথের ত্রয়ী বলা যেতে পারে।

বর্ত্তমান গ্রন্থ এই উভয় লেখকের ত্রয়ীর আলোচনা। গ্রন্থের প্রারম্ভে ত্রয়ীর ভূমিকা পরিচ্ছেদে সমস্ত বিষয়টি কথিত হয়েছে। কাজেই আমার এই ভূমিকা বস্তুত ভূমিকার ভূমিকা। এর আসল উদ্দেশ্য পাঠকের সংগে লেখকের পরিচয় সাধন।

আজকাল বিশ্ববিদ্যালয়গুলির কৃপায় পাইকারী হারে ডক্টরেট ডিগ্রী বিতরিত হচ্ছে। প্রত্যেক ডক্টরেট ডিগ্রী মানে একখানি মুদ্রিত পুস্তক। আর গত ত্রিশ বৎসরের মধ্যে এই শ্রেণীর পুস্তক এত প্রকাশিত হয়েছে যার ভারে বাংলাসাহিত্য পীড়িত। অধিকাংশ গ্রন্থ ডক্টরেট ডিগ্রীধারীকে জীবিকা সংগ্রহে সাহায্য দান ছাড়া আর কোন মূল্য বহন করে কিনা সন্দেহ। তবু এ মূল্যটাও অকিঞ্চিৎকর নয়। কিন্তু এই রাশিকৃত পুস্তকমালার মধ্যে মাঝে মাঝে দু দশ খানি এমন প্রকাশিত হয় খুব সম্ভব স্থায়িত্ব লাভ করবার অধিকার তাদের আছে। বর্ত্তমান গ্রন্থ সেই রকম একখানি।

যে সব কারণ বইখানিকে স্থায়িত্ব দেবে মনে হয় সেগুলির বর্ণনা করছি। বঙ্কিমচন্দ্রের ত্রয়ী সম্বন্ধে লেখিকা যা বলেছেন তার উপর তেমন জোর দেব না কেননা তাঁর আগে অনেক প্রসিদ্ধ সমালোচক সে বিষয়ে ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করেছেন। রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসমালাতেও যে ত্রয়ী থাকা সম্ভব এ তথ্যটি লেখিকার নিজস্ব আবিষ্কার। এ ভাবে চোখের বালি, নৌকাডুবি ও গোরা উপন্যাস তিনখানিকে আগে আর কেউ বিচার করেন নি। রবীন্দ্রনাথের পর পর লিখিত আর কোন উপন্যাস সমূহকে এভাবে একটি লক্ষণের দ্বারা বিশ্লিষ্ট করা চলে না। 'চতুরঙ্গ' ও 'ঘরে বাইরে' সমকালে লিখিত বটে কিন্তু তাদের মধ্যে ভাবসাম্য কোথায়? আবার 'যোগাযোগ' ও 'শেষের কবিতা' সমকালে লিখিত হলেও তাদের মধ্যে ভাবসাম্যের চেয়ে ভাবান্তর বেশী। অবশ্য 'দুই বোন' ও 'মালঞ্চে'র মধ্যে ভাবসাম্য ও ঘটনাসাম্য দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু এ দুটির কোনটাই রবীন্দ্রনাথের প্রধান উপন্যাসের অন্তর্গত নয়। কাজেই ব্যতিক্রমের দ্বারা বিশিষ্ট চোখের বালি ও পরবর্ত্তী দুখানি। প্রথম খানির প্রকাশ—১৯০৩, দ্বিতীয় খানির—১৯০৬, তৃতীয় খানির ১৯১০। এ যেন একই ভাবের রেশ টেনে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত এসেছে যদিচ তাদের মধ্যে একটা ক্রমবিকাশের নিয়ম ও পরিণতি লক্ষ্যগোচর।

রবীন্দ্রনাথের দীর্ঘ জীবন পর্বে পর্বে নানা ভাবে ছায়াতল অতিক্রম করে চলেছে। এই সময়টায় চলছিল বর্ণাশ্রম ধর্মের প্রভাব। তিনি তখন জাতীয়তাবাদী এবং হিন্দুজাতীয়তাবাদী। বিংশ শতাব্দীর গোড়াতে হিন্দুত্ব ও জাতীয়তা এমন জটিলভাবে মিশে গিয়েছিল যে তার জট এখনও সম্পূর্ণভাবে ছাড়ান যায়নি। এমন কেন হলো? অনেক কারণ।

বঙ্কিমচন্দ্রের ত্রয়ীর প্রভাব, স্বামী বিবেকানন্দ ও নিবেদিতার প্রভাব, পরাধীনতার আত্মগ্লানি এবং জাপানী মনীষী কোকাকুরার উসকানি। তিনি কলকাতার শিক্ষিত সমাজের কানে Asia is one মন্ত্র দিয়ে গেলেন। মনে রাখতে হবে তখন জাপান রুশিয়ার বিরুদ্ধে নেমে পড়েছে বা নামবার উদ্যোগ করছে। জাপানের পক্ষে তখন এ মন্ত্র প্রচারের প্রয়োজন ছিল। সবশুদ্ধ মিলে এমন তালগোল পাকিয়ে গেল যে রবীন্দ্রনাথের মতো মনীষী এবং একেশ্বরবাদী ব্রাহ্মসন্তান গোলে হরিবোল দিয়ে উঠলেন। ঠিক তখনই আবার লর্ড কার্জন বঙ্গ ভঙ্গ করে সুপ্ত সিংহকে খুঁচিয়ে দিলেন। ফলে রবীন্দ্রনাথ প্রাচীন আর্য-সমাজের অনুকরণে শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্যাশ্রম স্থাপিত করলেন, সেখানে

হিন্দুশাস্ত্র সংহিতার বিধিনিষেধ নির্দ্দিষ্ট হলো, আনুষ্ঠানিকভাবে গঙ্গাস্নান শুরু হলো তার উপরে রাখীবন্ধন ও অরন্ধন। এ সমস্ত যে ঠিক এক বছরেই হয়েছে তা নয়, তবে পর পর কয়েক বছরের মধ্যে ঘটেছে বটে। এ হেন মনোভাবের প্রেরণায় পূর্বোক্ত উপন্যাস তিনখানি রচিত। আগে যে ক্রমবিকাশের কথা বলেছি, সেই সূত্র অবলম্বন করে অগ্রসর হলে দেখতে পাওয়া যাবে যে চোখের বালির শেষাংশে যার সূত্রপাত, নৌকাডুবিতে তার পূর্ণতা এবং গোরা উপন্যাসে তার অভাবিত পরিণাম। লেখিকা যথোচিত উপমা দিয়ে একে সূর্যগ্রহণের আরম্ভ, পূর্ণগ্রাস ও মোক্ষ বলে বর্ণনা করেছেন। বর্ণাশ্রমধর্মী লেখকের পরিকল্পিত বিনোদিনীর পক্ষে বিধবা বিবাহ করা অসম্ভব ; কমলার পক্ষে অদৃষ্টপূর্ব স্বামীর ঘরে অনায়াসে প্রবেশ একান্ত সম্ভব আর আত্মদ্বন্দ্বজর্জর গোরার পক্ষে মুক্তিলাভ আকস্মিক মনে হলেও নিয়তির নির্দেশ। গোরার দ্বন্দ্ব রবীন্দ্রনাথেরই। তিনি গোরা রচনাকালে হিন্দু জাতীয়তাবাদ ও বর্ণাশ্রমধর্মের জাল ছিন্ন করে আত্মপদে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। হঠাৎ গোরার এই পরিবর্ত্তন আকস্মিক মনে হলেও সমগ্র উপন্যাসটির অনিবার্য গতি এই পরিণতির দিকেই চলছিল। গোরা ও তৎপরবর্ত্তী রবীন্দ্রনাথ এক নয়। তিনি যে শুধু দামিনীর বিধবা বিবাহ দিয়েছেন তা নয়, নিজের একমাত্র পুত্রকেও বিধবার সঙ্গে বিবাহ দিয়েছেন। এখন রবীন্দ্রনাথের জীবনের এই পর্বটি সবিশেষ আলোচনাযোগ্য হলেও অনেকেই এটাকে এড়িয়ে গিয়েছেন বা আলগোছে স্পর্শ করেছেন। তাঁদের ভাবটা এই যে এ পর্বটা লোকগোচর করলে যেন রবীন্দ্রনাথকে খাটো করা হয়। তাঁরা ভুলে জান যে কোন পর্ববন্ধনে বা মতবন্ধনে বাঁধা পড়বার মতো লোক রবীন্দ্রনাথ নন। 'বাঁধন ছেড়ার সাধন'ই তাঁর ধর্ম। এখানে তাঁর মহত্ব। সেই জন্যেই বিপুল রবীন্দ্র সাহিত্যে পরস্পর বিরোধী নানারূপ মতবাদ পাওয়া যাবে। লোকে স্থির করতে পারে না কোন্‌টা তাঁর প্রকৃত মত। সবগুলোই তাঁর প্রকৃত মত বা কোনটাই তাঁর প্রকৃত মত নয়। তিনি কোন এক প্রসঙ্গে বলেছিলেন যে তাঁর প্রধান দোষ Inconsistency, আবার গুণও তাই। Inconsistencyর মধ্যেই তিনি Consistent,—যেমন নদীর বক্রগতি, নির্মলতা, পঙ্কিলতা, গভীরতা, শুষ্কতা প্রভৃতি সত্বেও নদীত্ব Consistent। অবিচল Consistency ক্ষুদ্রমনের লক্ষণ।

লেখিকা বিশেষ অভিনিবেশ ও গভীরতা সহকারে উপন্যাস তিনখানির মধ্যে দিয়ে রবীন্দ্রনাথের মনের গতি অনুসরণ করতে সমর্থ হয়েছেন। এবং সেই

সঙ্গে দুই বিরাট মনীষী সাহিত্যিকের মনের গতিকেও তুলনায় আলোচনা করে দুজনকেই বুঝতে সাহায্য করেছেন। এই কারণে তিনি বাঙালী পাঠকের আশীর্ভাজন।

শ্রীপ্রমথনাথ বিশী

॥ ১ ॥

॥ "ত্রয়ী"র ভূমিকা ॥

বঙ্কিমচন্দ্র লিখিত 'আনন্দ মঠ', 'দেবী চৌধুরাণী' ও 'সীতারাম' 'ত্রয়ী' নামে পরিচিত। পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি সমালোচকগণ এই তিনখানিকে একটি বিশিষ্ট লক্ষণযুক্ত মনে করেন। তাঁদের মতে এই লক্ষণের দ্বারাই উপন্যাস তিনখানি সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত। তারা পূর্ববর্ত্তী ও পরবর্ত্তী উপন্যাস থেকে স্বতন্ত্র হয়ে পড়ে একটি গুচ্ছ রচনা করেছে, তাই অন্য নামের অভাবে সমালোচকগণ তাদের 'ত্রয়ী' বলেছেন। একথা অবশ্যই স্বীকার করতে হয় যে এই তিনখানির বিশেষ লক্ষণ ও ধর্ম আছে। সংক্ষেপে বলতে গেলে বলা অন্যায় নয় যে বঙ্কিমচন্দ্র লিখিত অনুশীলন তত্ত্বই এদের বিশেষ লক্ষণ ও ধর্ম। এই অনুশীলন তত্ত্বের পূর্বাভাষ পূর্ববর্ত্তী কোন কোন উপন্যাসে থাকলেও এবং অনুশীলন তত্ত্বের উপসংহারের ভাব তাঁর শেষতম উপন্যাস রাজসিংহে (১৮৯৩) থাকলেও যে ভাবে 'ত্রয়ী'তে আছে এমন অবশ্য কোথাও নাই। না আগে না পরে। সত্য কথা বলতে কি উপন্যাস তিনখানির মেরুদণ্ড অনুশীলন তত্ত্ব। ঐ মেরুদণ্ড বাদ দিলে উপন্যাস তিনখানি থাকে না। তবে অনুশীলন তত্ত্বের প্রভাব উপন্যাস তিনখানিতে সমান নয়। 'আনন্দমঠে' যে পরিমাণ আছে 'দেবী চৌধুরাণীতে' তার চেয়ে অনেক বেশী, আবার 'সীতারামে' অপেক্ষাকৃত অল্প। চন্দ্রগ্রহণ বা সূর্য্যগ্রহণের উপমা ব্যবহার করে বলা চলে যে 'আনন্দমঠে' স্পর্শ, 'দেবী চৌধুরাণীতে' পূর্ণগ্রাস, 'সীতারামে' মোক্ষ। এই উপমার জের টেনেই আরও বলা চলে যে পূর্ণগ্রস্ত 'দেবী চৌধুরাণী' সম্পূর্ণভাবে অনুশীলন তত্ত্বের উপাদানে গঠিত। একথা বঙ্কিমচন্দ্র নিজেই পূর্বপক্ষ হয়ে পাঠককে জানিয়ে দিয়েছেন। সত্যকথা বলতে কি 'অনুশীলন তত্ত্ব', 'কৃষ্ণচরিত্র' ও 'দেবী চৌধুরাণী' সমসূত্রে স্থাপিত। 'অনুশীলন' বা 'ধর্মতত্ত্বে' যা তত্ত্বাকারে বিবৃত, 'কৃষ্ণচরিত্রে' তার ঐতিহাসিক উদাহরণ, আর 'দেবী চৌধুরাণীতে' তারই সামাজিক উদাহরণ। 'আনন্দমঠে' বঙ্কিমচন্দ্র দেখিয়েছেন যে উদ্দেশ্য যতই মহৎ হ'ক, মানুষ যদি অনুশীলিত না হয় তবে সেই উদ্দেশ্যের লক্ষ্যে পৌঁছন সম্ভব নয়। 'দেবী

চৌধুরাণীতে' এই কথাটাই আর এক ভাবে তিনি ব্যক্ত করেছেন। প্রফুল্ল পাঁচ বৎসর জ্ঞান ও পাঁচ বৎসর কর্ম শিক্ষা করে অনুশীলনকে জীবনে আয়ত্ত করে নিয়েছে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে অনুশীলন কার্যকরী হয়নি। সমাজ যদি ব্যাপকভাবে অনুশীলনের দ্বারা প্রভাবিত না হয় তবে একক ব্যক্তি সেই সমাজের কোন মহৎ কার্য্য করতে পারে না। যে দুইজন ব্যক্তির জীবনে অনুশীলন সার্থক হয়ে উঠেছিল গ্রন্থের শেষে দেখতে পাই তাদের একজন স্বামীর গৃহে ফিরে গিয়েছে, অন্যজন স্বেচ্ছায় ধরা দিয়ে দ্বীপান্তর বরণ করেছে। 'সীতারামে' এই কথাটাই আর এক ভাবে বলেছেন বঙ্কিমচন্দ্র।

সীতারাম বীরপুরুষ ও আদর্শ রাজা, আনুষ্ঠানিকভাবে অনুশীলিত না হলেও অনুশীলনের সারমর্ম সহজাতরূপে সে আত্মস্থ করতে সক্ষম হয়েছিল। ভবানী পাঠকের মতে দেবীচৌধুরাণী খাঁটি ইস্পাত, তাকে দিয়ে তিনি অস্ত্র গড়ে নিয়েছেন। ভবানী পাঠক বলেছিলেন যে পুরুষ হলেই ভাল হত কিন্তু এত গুণসম্পন্ন পুরুষ কোথায় পাওয়া যাবে, তাই প্রফুল্লকে দিয়ে অস্ত্র গড়ে নিয়ে তিনি কাজ চালিয়েছেন। এবারে 'সীতারামে' সেই বহুগুণসম্পন্ন পুরুষ তিনি পেয়েছেন। সীতারাম আদর্শ গৃহী ও আদর্শ রাজা। তবে তার পতন হল কেন? পরিত্যক্ত পত্নী শ্রীর আকর্ষণই এই পতনের কারণ। বঙ্কিমচন্দ্র বোধ করি বলতে চান যে মানুষ যতই অনুশীলিত হ'ক তার প্রবৃত্তির সমস্ত রন্ধ্রগুলি কখনই সম্পূর্ণভাবে বন্ধ হয় না, তারা সুযোগের অপেক্ষায় থাকে, সুযোগ পেলেই সেই রন্ধ্রপথে সর্বনাশের বন্যা ঢুকে পড়ে। এই সর্বনাশের বন্যায় সপরিবারে সীতারাম ও প্রজাপরিপূর্ণ সমাজ ভেসে গিয়েছে। এখানে প্রাসঙ্গিকভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে যে মহারাণা রাজসিংহ সীতারামেরই সার্থকতর ও পূর্ণতর সংস্করণ।

'ত্রয়ী'র উপরে অনুশীলন তত্ত্বের এই প্রভাব সম্বন্ধে দ্বিমত হবার আশঙ্কা আছে। তৎসত্ত্বেও সাধারণভাবে 'ত্রয়ী'র লক্ষণ ও ধর্ম বঙ্কিমচন্দ্রের অন্যান্য উপন্যাসগুলির থেকে যে আলাদা সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। 'ত্রয়ী'র সাহিত্যগুণ আমাদের আলোচ্য নয়, যদিও আমাদের বিশ্বাস যে সাহিত্যগুণেও এদের মান অত্যুচ্চ। এখানে আমাদের বক্তব্য এই যে বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনে উপন্যাস তিনখানি লিখবার সময়ে এমন একটা পর্ব এসেছিল যখন তিনি অনুশীলন তত্ত্বের দ্বারা সম্পূর্ণ আবিষ্ট ছিলেন এবং অনুশীলনকেই মনুষ্যত্ব লাভের একমাত্র পন্থা বলে মনে করতেন। এ ধারণা তাঁর সম্পূর্ণ দূর হ'ক বা না হ'ক,

পরবর্তী কালে লিখিত 'ইন্দিরা' (১৮৯৩) উপন্যাসে এ ভাবটার উপরে তিনি জোর দেননি। 'রাজসিংহে' (১৮৯৩) এ ভাবটা থাকলেও প্রচ্ছন্ন থেকে শিল্পকে অগ্রাধিকার দিয়েছে। অনুশীলন তত্ত্বের আত্যন্তিক প্রভাব বঙ্কিমচন্দ্রের শিল্পকলাকে 'ত্রয়ী' লিখবার সময় কয়েক বছর প্রভাবিত করেছিল; আগেই বলা হয়েছে তার স্পর্শ 'আনন্দমঠে' ও তার মোক্ষ 'সীতারামে'।

রবীন্দ্রনাথের জীবনেও অনুরূপ একটা পর্ব এসেছিল। তবে সেটা তেমন প্রকট হয়ে ওঠেনি। আর পরবর্তীকালে সে ভাবটা সম্পূর্ণ দূরীভূত হয়ে যাওয়ায় লোকে এক রকম এই পর্বটাকে ভুলেই গিয়েছে। বড়ই আশ্চর্যের বিষয় এই যে ব্রাহ্মসমাজভুক্ত একেশ্বরবাদী রবীন্দ্রনাথ এক সময়ে হিন্দু বর্ণাশ্রম ধর্মের সমর্থক হয়ে উঠেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের অনুশীলনতত্ত্ব সমর্থনে এবং শ্রীকৃষ্ণকে আদর্শ মানব বলে ঘোষণা করায় বিস্ময়ের কিছু নাই, কারণ তিনি আনুষ্ঠানিক হিন্দু ও গৃহদেবতা রাধামাধবের সেবক ছিলেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের এই সাময়িক পরিবর্তন সত্যই বিস্ময়কর। ব্রাহ্মসমাজের গুরুস্থানীয় মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সন্তান হঠাৎ হিন্দু বর্ণাশ্রম ধর্মের সমর্থক হয়ে উঠলেন, আনুষ্ঠানিক ভাবে গঙ্গাস্নান করতে লাগলেন এবং সদ্য প্রতিষ্ঠিত শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে হিন্দুশাস্ত্র বিরোধী কোন আচার হতে পারবে না বলে ঘোষণা করলেন। হঠাৎ কেন এমন হতে গেল অনুসন্ধানযোগ্য; খুব সম্ভব তলে তলে অনেকগুলো কারণ কাজ করেছিল। নবোদ্বোধিত জাতীয়ভাবোধ, বিবেকানন্দের শিক্ষা, নিবেদিতার দৃষ্টান্ত প্রভৃতি হয়তো প্রেরণা যুগিয়ে থাকবে। তবে ফল হয়েছিল এই যে এই সময়টাতে লিখিত রবীন্দ্রনাথের অনেক রচনা বর্ণাশ্রমধর্ম প্রভাবিত। স্থূলভাবে ১৯০১ সাল থেকে 'গোরা' রচনার সময় অবধি এই পর্বটাকে চিহ্নিত করা চলে। রচনার নাম করতে গেলে কাব্যের মধ্যে 'নৈবেদ্য' ও উপন্যাসের মধ্যে 'চোখের বালি', 'নৌকাডুবি' ও 'গোরা'র নাম অবশ্যই করতে হয়। এই তিনখানি উপন্যাস একটি বিশেষ লক্ষণ ও ধর্মাক্রান্ত বলে উপন্যাস তিনখানিকে রবীন্দ্রনাথের 'ত্রয়ী' বললে অসঙ্গত হয় না। আবার গ্রহণের উপমা অবলম্বন করে বলা চলে যে এই ভাবের স্পর্শ 'চোখের বালিতে', পূর্ণগ্রাস 'নৌকাডুবিতে' এবং মোক্ষ 'গোরায়'। ঠিক এই ভাবে ও দৃষ্টিতে রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস তিনখানিকে কেউ বিচার করছেন কিনা সন্দেহ। তবে এ ভাবে বিচার করলে বোধ হয় অন্যায় হয় না। অনুশীলনতত্ত্বের মর্য্যাদা রক্ষা করতে গিয়ে 'ত্রয়ী'র সাহিত্যগুণ যদি অল্পাধিক

ক্ষুণ্ণ হয়ে থাকে রবীন্দ্রনাথের 'ত্রয়ী'তেও তার অনুরূপ হয়েছে। 'চোখের বালিতে' বিধবা বিনোদিনীর বিবাহ যে লেখক সমর্থন করতে পারেন নি তার প্রধান কারণ বর্ণাশ্রমধর্মের অনুশাসন। আর 'নৌকাডুবিতে' কমলার মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ করতে গিয়ে হিন্দু বিবাহিতা নারীর মনস্তত্ত্বকেই মাপকাঠি বলে গ্রহণ করেছেন। হিন্দু বিবাহিতা নারীর মনে স্বামী সম্বন্ধে যে নিত্যতাবোধ থাকে, তাকেই মানবজীবনের আদর্শরূপে গ্রহণ করে কমলার চরিত্র পরিকল্পিত হয়েছে। 'নষ্টনীড়ে'র লেখকেব পক্ষে এ সত্যই এক অদ্ভুত ব্যাপার, কারণ তখন তাঁর মনে হিন্দু বর্ণাশ্রমধর্মের পূর্ণগ্রাস অবস্থা; 'গোরা'তে গিয়ে এই অবস্থা থেকে মুক্তিলাভ করেছেন রবীন্দ্রনাথ। বর্ণাশ্রমধর্মেব সমর্থক হয়ে উঠলেও ভিতরে ভিতবে নিশ্চয় একটা দ্বন্দ্ব চলছিল তাঁর মনে। সে দ্বন্দ্বটা বর্ণাশ্রম ধর্মেব সঙ্গে—মানবতাবোধের। 'গোরা'তে গিয়ে শেষ পর্যন্ত মানবতাবোধ জয়যুক্ত হয়েছে। নিজের জীবনের এই দ্বন্দ্বটাকে উপন্যাসের নায়ক গোরার জীবনে আরোপ কবে, মানবতাবোধেব জয়ধ্বনি উচ্চারণ করে, ববীন্দ্রনাথ যেন স্বস্তি অনুভব করেছেন। মহাপ্রতিভাধর ব্যক্তিগণ কোন একটা সময়ে কোন একটা বিশেষ ভাবেব দ্বারা সমাচ্ছন্ন হলেও দীর্ঘকাল তার জের টেনে চলেন না, সেই মোহ কাটিয়ে তাঁরা আবার মুক্ত দৃষ্টি লাভ করেন। এক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্র বিবৃত অনুশীলনতত্ত্ব যতই মহৎ হ'ক মানবজীবনের রহস্য তাব চেয়ে অনেক গভীর; রবীন্দ্রনাথ অনুসৃত বর্ণাশ্রমধর্ম যতই মহৎ হ'ক মানবজীবন তাব চেয়ে অনেক গভীর। এই সরল সত্যটা বুঝতে বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের কিছু সময় লেগেছিল। কিন্তু যেহেতু তাঁরা প্রতিভাবান ও মহামনীষী ব্যক্তি ছিলেন, দীর্ঘকাল তত্ত্বেব দ্বারা সমাবৃত হয়ে না থেকে মানবজীবনের উদার আলোকে আবার প্রত্যাবর্তন করতে সমর্থ হয়েছেন।

এই আলোচনায় আমরা পূর্বোক্ত বিষয়সমূহকে যথাসাধ্য তথ্য ও উদাহরণ যোগে বিবৃত করার চেষ্টা করছি। বঙ্কিমচন্দ্রের 'ত্রয়ী' সুপরিচিত নাম। রবীন্দ্রনাথের 'ত্রয়ী' নামটি আদৌ পরিচিত নয়। বঙ্কিমচন্দ্রের 'ত্রয়ী'র উদাহরণে রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস তিনটিকে কেন 'ত্রয়ী' বলা চলে তা আগেই ব্যাখ্যা করেছি। এই দুই সাহিত্যরথীর 'ত্রয়ী' তাঁদের জীবনের একটা পর্বের অভিজ্ঞতা, ইতিহাস ও পরীক্ষালব্ধ সত্যের বাহন। সেই ইতিহাস, অভিজ্ঞতা ও পরীক্ষালব্ধ সত্যের ব্যাখ্যান এখানে আমাদের মূল আলোচ্য বিষয়।

॥ ২ ॥

॥ বঙ্কিমচন্দ্রের পারিবারিক পরিবেশ ॥

বঙ্কিমচন্দ্রের শেষ পর্বের তিনখানি উপন্যাস 'আনন্দমঠ', 'দেবী চৌধুরাণী' ও 'সীতারাম' লেখকের পরিণত মনের এক বিশেষ ভাবনার বাহক। অধিকাংশ সমালোচকের মত যে, উদ্দেশ্য শিল্পকে নিয়ন্ত্রিত করেছে। তবে অনেকে শিল্প ও উদ্দেশ্যের সমন্বয় হয়েছে একথাও বলেছেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের এই তত্ত্বমূলক তিনখানি উপন্যাসের—অর্থাৎ, 'ত্রয়ী'র শিল্প ও তত্ত্বই আলোচ্য বিষয়। শিল্পের সঙ্গে শিল্পীর অচ্ছেদ্য সম্পর্ক আর একথা অনস্বীকার্য যে সৃষ্টিকে অনেকখানি নিয়ন্ত্রিত করে পরিবেশ। স্রষ্টার মানসিক গঠন ও আদর্শ, পবিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় পবিবেশের উপর নির্ভরশীল। অতএব বঙ্কিমচন্দ্রের সৃষ্টি সম্বন্ধে আলোচনা করতে হলে তাঁর পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র ও মানসিক প্রবণতার আলোচনা হওয়া দরকার।

১৮৩৮ সালের ২৬শে জুন (১৩ই আষাঢ় ১২৪৫) রাত্রি নয়টার সময় কাঁটালপাড়ায় বঙ্কিমচন্দ্রেব জন্ম হয়। তিনি রামহরি চট্টোপাধ্যায়ের প্রপৌত্র, যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের তৃতীয়পুত্র এবং প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ভবানীচরণ বিদ্যাভূষণের দৌহিত্র। তাঁর জ্যেষ্ঠ দুই ভাই শ্যামাচরণ ও সঞ্জীবচন্দ্র এবং কনিষ্ঠ পূর্ণচন্দ্র, সকলেই কৃতবিদ্য ছিলেন।

সঞ্জীবচন্দ্র সাহিত্যিক হিসাবেও পরিচিত। তিনি 'পালামৌ', 'জাল প্রতাপচাঁদ', 'কণ্ঠমালা' ও 'মাধবীলতা'র লেখক। বঙ্গদর্শনের দ্বিতীয় সম্পাদক হিসাবেও তিনি প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের পিতা যাদবচন্দ্র ইংরাজী ও ফার্সিতে সুশিক্ষিত ছিলেন। তিনি সরকারী চাকুরী করতেন। ১৮৩৮ এর জানুয়ারীতে মেদিনীপুরের ডেপুটি কালেক্টর হন। ১৮৫৭ সালে তিনি অবসর গ্রহণ করেন। তারপর দীর্ঘ ২৪ বৎসর ধর্মচর্চায় অতিবাহিত করে ১৮৮১ সালের জানুয়ারী মাসে (১৩ই মাঘ ১২৮৭) ৮৭ বৎসর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়।

মেদিনীপুরেই বঙ্কিমচন্দ্রকে ইংরাজী স্কুলে ভর্তি করা হয়। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভা ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় তাঁর বাল্যকালের কথাতেই পাওয়া যায়। পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'বঙ্কিমচন্দ্রের বাল্যশিক্ষা' প্রবন্ধে লিখেছেন,মেদিনীপুরে

যখন বঙ্কিমচন্দ্রের বাবা ডেপুটি কালেক্টর ছিলেন, বঙ্কিমচন্দ্র টিড সাহেবের স্কুলে ভর্ত্তী হন। প্রতিদিন বৈকালে টিড সাহেবের স্ত্রী লোক পাঠিয়ে তাঁকে নিয়ে যেতেন। কাছেই ম্যাজিষ্ট্রেট মলেট সাহেবের বাংলো ছিল। সেখানে মিসেস টিডের সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রও প্রতিদিন বৈকালে যেতেন। বাল্যকালে খেলাধূলার আগ্রহ না থাকায় মেমসাহেবদের সঙ্গে গল্প করতেন। একদিন মলেট সাহেবের বাড়ীতে অন্য একজন সাহেব, মেমেদের অনুপস্থিতির সময়ে, অন্যান্যছেলেদের ডেকে নিয়ে চা খাওয়ান। বঙ্কিমচন্দ্রকে তিনি ডাকেন নি। বঙ্কিমচন্দ্র সেদিন থেকে আর কোনদিন মলেট সাহেবের বাড়ীতে যান নি। যতদিন মেদিনীপুর থেকে বদলি হয়ে তাঁর বাবা চলে না আসেন টিড সাহেবের বাড়ী যেতেন। বাল্যকাল থেকে এই তীব্র সম্মানবোধ তাঁর চরিত্রের লক্ষণীয় দিক বলা যায়।

বাল্যকাল থেকে বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যে আরও অনেক সদগুণ লক্ষ্য করা যায়। তিনি নাকি একদিনে বাংলা বর্ণমালা আয়ত্ত করেছিলেন। বাড়ীর পড়াশোনার আবহাওয়া তাঁর তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও জ্ঞানাকাঙ্ক্ষার অনুকূল ছিল। কবিতা ও শ্লোক মুখস্থ করে সুন্দর উচ্চারণে আবৃত্তি করতে তিনি বড় ভালবাসতেন। দেশপূজ্য হলধর তর্কচূড়ামণি বঙ্কিমচন্দ্রের আবৃত্তিতে আকৃষ্ট হয়ে তাঁকে ডেকে আলাপ করেন। তিনি বঙ্কিমচন্দ্রকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন। এই প্রসঙ্গে পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বঙ্কিমচন্দ্রের বাল্যশিক্ষা' প্রবন্ধে বলেন—

"আমার ধারণা, বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভা চূড়ামণি মহাশয়ের প্রতিভাকে আকৃষ্ট করিয়াছিল, নতুবা এই অসাধারণ পণ্ডিত বালক বঙ্কিমচন্দ্রকে শিক্ষা দিবার জন্য এত চেষ্টিত হইবেন কেন?" (বঙ্কিমচন্দ্রের বাল্যশিক্ষা—শ্রীপূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়; বঙ্কিম-প্রসঙ্গ—৺সুরেশচন্দ্র সমাজপতি-সঙ্কলিত। ৩৮ পৃঃ। মুখার্জি বোস কোং)

বঙ্কিমচন্দ্র গোঁড়া হিন্দু পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন এবং সনাতন ধর্মের আবহাওয়াতেই লালিত হন। শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন—

'গৃহে দেবোপম পিতা, দেবী প্রতিমা মাতা, জাগ্রত দেবতা রাধাবল্লভ। ভট্টপল্লীর দেশ প্রসিদ্ধ অধ্যাপকেরা নিয়ত আসিয়া শাস্ত্র আলোচনা করিতেন। পূজার দালানে হোম, চণ্ডীপাঠ, শান্তি-স্বস্ত্যয়ন, উঠানে গোবিন্দ অধিকারীর কৃষ্ণযাত্রা, দুর্গোৎসব, রথ, রাস প্রভৃতি বার মাসে তের পার্বণ; ক্ষুদ্র পল্লীর গৃহে গৃহে শঙ্খধ্বনি, মন্দিরে মন্দিরে স্তোত্রপাঠ। বাল্যজীবনে বঙ্কিমচন্দ্র

এই পরিবেশ হইতে রস টানিয়াছেন, এবং এই ঐতিহ্যের প্রভাব তাঁহার উপর অনস্বীকার্য। মধ্যজীবনে বিজ্ঞানের চর্চ্চার ফলে তিনি ঘোরতর সংশয়বাদী হইয়া উঠিলেও এই ঐতিহ্যের আকর্ষণ তিনি পরিপূর্ণ কাটাইয়া উঠিতে পারেন নাই।" (বঙ্কিম—মানস, অরবিন্দ পোদ্দার, এম এ, ডি-ফিল (কলিকাতা) ১৪০ পৃঃ—১ম সংস্করণ, ইণ্ডিয়ানা লিমিটেড)

জয়দেবের "ধীর সমীরে যমুনাতীরে বসতি বনে বনমালী" বঙ্কিমচন্দ্রের ছোটবেলা থেকে শেষ পর্য্যন্ত বড় প্রিয় ছিল। তার স্বাক্ষর বহন ক'রে আনন্দমঠে আছে—

"ধীর সমীরে তটিনীতীরে বসতি বনে বরনারী।
মাকুরু ধনুর্দ্ধর গমন বিলম্বনমতি বিধুরা সুকুমারী॥"

পূর্ণ চট্টোপাধ্যায়ের লেখা থেকে জানা যায় "হবে মুরারে মধুকৈটভারে" গানটি ছোটবেলা একদিন রাত্রি শেষে এক বৈষ্ণবীর মুখে শোনেন। তারপর থেকে তিনি প্রায় সর্ব্বদা গানটি করতেন। তাঁর এই প্রিয় গানটি আনন্দমঠের সন্ন্যাসীদের মুখে দিয়ে দেন।

দোল পূর্ণিমা উপলক্ষ্যে একবার বঙ্কিমচন্দ্রের বাড়ীতে বিরাট উৎসবের আয়োজন হয়েছিল। বালক বঙ্কিমচন্দ্র ঠাকুরবাড়ীর ভিড় ঠেলে ভিতরে গেলেন। হলধর তর্কচূড়ামণিও সেখানে ছিলেন। তিনি বঙ্কিমচন্দ্রকে কাছে টেনে নিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র হঠাৎ প্রশ্ন করেছিলেন—"যে শ্রীকৃষ্ণকে দেখিবার জন্য আপনি কষ্ট করিয়া আসিয়াছেন, যে শ্রীকৃষ্ণের নাম ইতর ভদ্র মেয়ে-পুরুষ সকলেই জপ করিতেছে সেই শ্রীকৃষ্ণ ষোল-শ' গোপিনী ভর্ত্তা ছিলেন? তিনি গোপিনীদের বস্ত্র হরণ করিয়াছিলেন? বঙ্কিমচন্দ্র তাহার পূর্ব্বে বাঙ্গালা শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রশ্ন শুনিবামাত্র সমবেত পণ্ডিত ও ভদ্রলোকগণ স্তম্ভিত হইলেন। চূড়ামণি মহাশয় বঙ্কিমচন্দ্রকে আদর করিতে করিতে বলিলেন, এ প্রশ্নের উত্তর আমি তোমাকে পরে দিব এক্ষণে বুঝাইবার চেষ্টা করিলেও তুমি বুঝিতে পারিবে না। তবে এইমাত্র জানিয়া রাখ যে, শ্রীকৃষ্ণ আদর্শ পুরুষ ও আদর্শ চরিত্র।" (বঙ্কিমচন্দ্রের বাল্যশিক্ষা—শ্রীপূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়; বঙ্কিম-প্রসঙ্গ—৺সুরেশচন্দ্র সমাজপতি সঙ্কলিত। ৪১ পৃঃ। মুখার্জ্জি বোস কোং)

শ্রীকৃষ্ণ আদর্শ পুরুষ ও আদর্শ চরিত্র এই মূল মন্ত্র তিনি মনে প্রাণে গ্রহণ করেছিলেন। বাল্যের এই শিক্ষা তিনি কোনদিনই বিস্মৃত হননি। যে

প্রশ্ন করে বাল্যকালে একদিন বাড়ীভরা লোককে চমকিত করেছিলেন, সেই প্রশ্নেরই উত্তর ও বিশ্লেষণ বার করে পরিণত বয়সের পরিণত লেখনী চালনা করে তিনি দেশজোড়া লোককে চমকিত সচকিত করে তুলেছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের ভ্রাতার লেখা থেকে দেখা যায় তিনি কখনও পাঠাশালায় পড়েননি। তবু পাশের পাঠশালায় রোজ যেতেন। গুরুমশায় তাঁর হাতে বেত তুলে দিলে তিনি হাতে করে নিয়ে সকলের পড়ার তদারক করে বেড়াতেন। পড়ার উৎসাহ দেবার স্বভাব তখন থেকেই ছিল। পরবর্ত্তীকালের বঙ্কিমের লক্ষণ এই সময়ের থেকেই দেখা যায়।

"বঙ্কিমচন্দ্র না জন্মাইলে রমেশচন্দ্র দত্ত চন্দ্রনাথ বসু প্রভৃতি কখনও বাঙ্গলা ভাষাব লেখক হইতেন না, চিরকাল ইংরাজি লেখক থাকিতেন। বঙ্কিমচন্দ্রেব প্ররোচনায় ও অনুপ্রেরণায় তাঁহারা বাঙ্গলা ভাষায় লিখিতে আরম্ভ করিলেন।" (বঙ্কিমচন্দ্রের বাল্যকথা—শ্রীপূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়; বঙ্কিম-প্রসঙ্গ-৺সুরেশচন্দ্র সমাজপতি সঙ্কলিত, ৪৩পৃঃ, মুখার্জ্জী বোস কোং)

বাল্যবয়সেই তাঁর স্বাতন্ত্র্য ধরা পড়ে। একবার গ্রামে গোরার নৌকো লাগে। তারা আর একবার গ্রামে এসে অযথা অত্যাচার কবেছিল। তাই গ্রামের লোকেরা গোরার নৌকা লাগা দেখে যে যেখানে পাবে পালায। ঘরে ঘরে দরজা বন্ধ হয়ে যায়। বঙ্কিমচন্দ্র পাঠশালায় ছিলেন। তিনি গুরুমশায়ের বেত হাতে নিজের বাডীর গেটের কাছে একা দাঁডিয়ে থাকলেন গোরারা তাঁর কাছে এসে বেতটা হাত দিয়ে দেখে কি বলাবলি করে চলে যায়। ঘটনাটি সামান্য হলেও বালকের বীরত্ব ও স্বাতন্ত্র্য ধবা পড়ে।

বঙ্কিমচন্দ্র নাকি ছোটবেলায় দৌড় ঝাঁপ খেলা করতেন না, বসে বসে তাস খেলতেন। ষাঁড়, গোরু ইত্যাদি দেখলে দূরে সরে যেতেন। ঘোডায় চড়া. সাঁতারকাটা, মই দিয়ে ছাতে ওঠা—এসব পারতেন না।

"কিন্তু আশ্চর্য্যেব বিষয় এই যে, ইনিই বাল্যকালে একদিন ডাকাতদের ভয় করেন নাই; কৈশোবে নদীবক্ষে ঝড় তুফানের ভয় করিতেন না। আর যৌবনে গুলিভরা পিস্তল গ্রাহ্য না করিয়া একজন সাহেবকে গ্রেপ্তার করিয়াছিলেন।" (বঙ্কিমচন্দ্রের বাল্যকথা—শ্রীপূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়; বঙ্কিম-প্রসঙ্গ—৺সুরেশচন্দ্র সমাজপতি সঙ্কলিত– ৪৬ পৃঃ, মুখার্জ্জী বোস কোং)

বাল্যকালে বঙ্কিমচন্দ্রের গল্প শোনার ঝোঁক ছিল। তবে যে সে গল্প যে সে লোকের মুখে শুনতে ভালবাসতেন না। তাঁর পিতার কাকার মুখে গল্প শুনতে

ভালবাসতেন। কারণ তিনি অত্যন্ত নিপুণভাবে ইতিহাসের ঘটনার মত করে গুছিয়ে গল্প করতে পারতেন। দুর্গেশনন্দিনীর মান্দারনের গল্প প্রথমে এই ঠাকুর্দার কাছে শুনেছিলেন। 'আনন্দমঠে'র ছিয়াত্তরের মন্বন্তর সম্বন্ধেও তিনি মেজঠাকুর্দার কাছে সমস্ত অবস্থা ভাল করে শুনেছিলেন।

"সেকালের লোকে 'ফসল', 'অজন্মা' এই সকল কথাও সর্বদা আন্দোলন করিতে ভালবাসিত। মেজঠাকুর্দা প্রথমে ফসলের কথা তুললেন। পরে কি প্রকারে তিল তিল করিয়া মন্বন্তর ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া বঙ্গদেশ ছারখার করিল, তাহা বিবৃত করিলেন। তিন চারি বৎসর পূর্ব হইতে অজন্মা হইল, আর ঐ বৎসর (১২৭৬ সালে) ফসল হইল না। এই কয়বৎসর অজন্মার ফলে নিম্নশ্রেণীর লোকদের আহার বন্ধ হইল, পরে মধ্য শ্রেণীর গৃহস্থের, পরে ধনবানদেরও আহার বন্ধ হইল। এই শেষোক্ত শ্রেণীর লোকদিগের কাহারও কাহারও লক্ষ লক্ষ টাকা পোতা থাকিত, (সেকালে এইরূপে টাকা সঞ্চিত থাকিত), তবু তাহারা অনাহারে মরিতে লাগিল, কেননা টাকা খাইতে পারে না। টাকাতে ধানচাল কিনিবে, তাহা দেশে নাই। এইরূপ অবস্থাতে বঙ্গে নানা প্রকার পীড়ার আবির্ভাব হইয়া অবশেষে চুরি ডাকাতি আরম্ভ হইল। আমার মনে হয় ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের অবলম্বনে কোন উপন্যাস লিখিবার তাঁহার অনেকদিন ইচ্ছা ছিল, কিন্তু যৌবনে লেখেন নাই, কিঞ্চিৎ পরিণত বয়সে আনন্দমঠ লিখিলেন।" (বঙ্কিমচন্দ্রের বাল্যকথা—শ্রীপূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিম প্রসঙ্গ—৺সুরেশচন্দ্র সমাজপতি সঙ্কলিত—৫২ পৃঃ। মুখার্জী বোস কোং)।

বঙ্কিমচন্দ্রের চরিত্রের উপর তাঁর পিতা ও পরিবারের প্রভাব অপরিসীম। তিনি নিজেই দেবী চৌধুরাণীর উৎসর্গ লিপিতে লিখেছেন—"যাঁহার কাছে প্রথম নিষ্কাম ধর্ম্ম শুনিয়াছিলাম, যিনি স্বয়ং নিষ্কাম ধর্ম্মই ব্রত করিয়াছিলেন, যিনি এখন পুণ্যফলে স্বর্গারূঢ়, তাঁহার পবিত্র পাদপদ্মে এই গ্রন্থ ভক্তিভাবে উৎসর্গ করিলাম।"

বঙ্কিম সাহিত্যে সন্ন্যাসী ও সিদ্ধ মহাপুরুষের চরিত্র প্রতিটি উপন্যাসেই প্রায় পাওয়া যায়। এখানেও পিতার প্রভাব কাজ করেছে। পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন যে তাঁর পিতার গুরুদেব একজন সিদ্ধপুরুষ ও সন্ন্যাসী ছিলেন। তাঁর অলৌকিক শক্তির কথা তাঁদের পরিবারে প্রচলিত ছিল। মনে হয় তাঁর

যে সন্ন্যাসী ও সাধুদের প্রতি একটা শ্রদ্ধার ভাব ছিল, পারিবারিক কাহিনী তার একটা বিশেষ কারণ। তবে বঙ্কিমচন্দ্র কখনও সর্বত্যাগী সন্ন্যাসকে গৃহধর্মের উপরে স্থান দেন নি।

"বঙ্কিম সাহিত্যে অনেক সাধুসন্ন্যাসী আছে, তারা পরপিণ্ড ভোজী নিষ্কর্মা সামাজিক পরগাছা নয়; তারা সকলেই পরহিতে সমর্পিত প্রাণ, সমাজ দেশের কল্যাণকামী, শুধু তারা কেউ নায়কত্বের সম্মান পায়নি। বঙ্কিমচন্দ্র সন্ন্যাসকে পূর্ণ মনুষ্যত্বলাভের, পরবর্তীকালে যাকে অনুশীলন বা ধর্ম আখ্যা দিয়েছেন, অন্তরায় মনে করতেন। সংসারত্যাগী যীশু ও বুদ্ধ তাঁর চোখে আদর্শ মানব নয়; তাঁর বিবেচনায় হিন্দু ধর্ম, যাকে তিনি সনাতন ধর্ম অর্থাৎ ধর্মের আদর্শ মনে করতেন, গৃহীর ধর্ম, সংসারত্যাগী সন্ন্যাসীর ধর্ম নয়। সংসারে কিছু পরহিতব্রতী সন্ন্যাসীর প্রয়োজন আছে, তবে সংসারত্যাগের দ্বারা আদর্শে পৌছবার পথটা স্বেচ্ছায় যেন তারা পরিত্যাগ করেছেন, এখানেই তাদের চরম আত্মত্যাগ, তুলনায় সংসার ত্যাগ অকিঞ্চিৎকর। সন্ন্যাসকে সামাজিক আদর্শ বলে বঙ্কিমচন্দ্র মনে করেন নি বলা বোধ করি যথেষ্ট নয়, তাঁর মতে সন্ন্যাসের ভ্রান্ত আদর্শ সমূহ ক্ষতির কারণ।"

(বঙ্কিম সরণী···অধ্যাপক প্রমথনাথ বিশী—দেশ—৩৩ বর্ষ—১৩৬৩ বঙ্গাব্দ ৩১ সংখ্যা ২১শে জ্যৈষ্ঠ ৬১৬ পৃঃ।)

বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে শ্রীশচন্দ্র মজুমদার অনেক সময়ই যেতেন। তিনি একদিন বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনী লিখবেন বলে তাঁর মুখ থেকে তাঁর জীবনের কথা শুনতে চান। বঙ্কিমচন্দ্র বলেন যে তাঁর পক্ষে নিজের ভুলত্রুটির কথা বলা বড় শক্ত। তবে বলতে পারলে ভাল হয়। সমস্ত অকপটে স্বীকার না করলে জীবনী হয় না। তাঁর জীবনের সমস্ত উন্নতির মূলে তাঁর স্ত্রীর প্রভাব কাজ করেছে। যদি তাঁর জীবনী লিখতে হয় তবে তাঁর স্ত্রীরও লেখা উচিত। তাঁর জীবনের যত ভুল ত্রুটির কথা তাঁর স্ত্রীও জানেন।

"আগে আমি নাস্তিক ছিলাম, তাহা হইতে হিন্দুধর্মে আমার মতিগতি আশ্চর্য রকমের। কেমন করিয়া তাহা হইল জানিলে লোকে আশ্চর্য হইবে। আমি আপন চেষ্টায় যা কিছু শিখেছি। ছেলেবেলা হতে কোন শিক্ষকের কাছে কিছু শিখিনি। হুগলী কলেজে একটু আধটু শিখেছিলাম ঈশানবাবুর কাছে। ক্লাসে কখনও থাকতাম না ক্লাসের পড়াশুনা কখনও ভাল লাগিত না বড় অসহ্য বোধ হইত। কুসংসর্গটা ছেলেবেলায় বড় বেশী হয়েছিল। বাপ

থাকতেন বিদেশে, মা সেকেলের উপর আর একটু বেশী, কাজেই তাঁর কাছে শিক্ষা হয়নি ; নীতিশিক্ষা কখনও হয়নি। আমি যে লোকের ঘরে সিঁদ দিতে কেন শিখিনি বলা যায় না।" (বঙ্কিমবাবুর প্রসঙ্গ—শ্রীশচন্দ্র মজুমদার, বঙ্কিম-প্রসঙ্গ—৺সুরেশচন্দ্র সমাজপতি সঙ্কলিত—১৯৫ পৃঃ। মুখার্জী বোস কোং)

বঙ্কিমচন্দ্রের এইকথার পরও আমরা বলবো তাঁর পিতার চরিত্রগত প্রভাব, শিক্ষার সুষ্ঠু ব্যবস্থা, হলধর তর্কচূড়ামণি ও অন্যান্য পণ্ডিতদের সাহচর্য—তাঁর নিজের তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও জ্ঞানাকাঙ্ক্ষা একত্রিত হয়ে তাঁকে এরকম সর্বগুণ সম্পন্ন ব্যক্তিতে পরিণত করে। পারিবারিক প্রভাব তাঁর চরিত্র গঠনে ও সাহিত্যিক প্রতিভা বিকাশে যে সাহায্য করেছে এ সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই।

॥ ৩ ॥

॥ বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভা বিকাশের সময় সামাজিক অবস্থা ॥

বঙ্কিমচন্দ্রের জন্মের আগে থেকে বাংলায় একটা বিরাট পরিবর্ত্তনের লক্ষণ দেখা দিতে থাকে। ১৮১৭ সালে হিন্দু কলেজ স্থাপিত হয়। তারও আগে থেকে ইংরাজী শিক্ষার প্রতি লোকের আগ্রহ দেখা যায়। দেশের শাসকরা খুব একটা উৎসাহ না দেওয়ায় ডেভিড হেয়ার ও অন্যান্য কয়েকজন বিদেশীর সাহায্যে এদেশের কিছুলোক ইংরাজী শিক্ষার জন্য দুই একটি বিদ্যালয় চালান। এইভাবে হিন্দু কলেজও স্থাপিত হয়। জাতিবর্ণ নির্বিশেষে দেশীয় যুবকরা এখানে ইংরাজী শিক্ষা করতে থাকেন। ইংরাজী শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা ইংরেজের আচার আচরণও শিক্ষা করেন।

সে সময়ে দেশের শিক্ষা সংস্কৃতির কথা উল্লেখ করে—

"শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রণীত রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিতে উদ্ধৃত 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার' উক্তি হইতে তুলিয়া দেওয়া যাইতেছে।

বেদের যে সকল কর্মকাণ্ড উপনিষদের ব্রহ্মজ্ঞান, তাহার আদর এখানে কিছুই ছিল না। কিন্তু দুর্গোৎসবের বলিদান, নন্দোৎসবের কীর্ত্তন, দোলযাত্রার আবীর, রথযাত্রার গোল, এই সকল লইয়াই লোকের মহা আমোদ ছিল।" (রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ সমাজ—শ্রীশিবনাথ শাস্ত্রী এম. এ., তৃতীয় সংস্করণ—৫৮ পৃঃ, এস. কে. লাহিড়ী এণ্ড কোং।)

হিন্দু সমাজের মধ্যে তখন সনাতন ধর্মের আসল ধর্মবোধ নষ্ট হয়ে গিয়েছে, কেবল আচার অনুষ্ঠান ও জাত নিয়ে বাড়াবাড়ি চলছে। শিক্ষার ব্যাপারেও দীর্ঘদিনের শাসন ব্যবস্থার অরাজকতার ফলে দেশে শিক্ষার উন্নতি হওয়া তো দূরের কথা দিন দিন অবনতি হতে থাকে। তাই দেশের লোক নতুন ইংরাজী শিক্ষাকে সাদরে গ্রহণ করে। তবে সর্ব্বদাই প্রগতিবাদী ও প্রাচীনপন্থী লোক থাকেনই। সে সময়ও তাই নতুন শিক্ষা ও আচার আচরণকে একদল যেমন অন্তর থেকে গ্রহণ করলেন অন্যদল তেমনি এর বিরোধিতা করেন। দেশের এই দুঃসময়ে রামমোহন রায়ের ধর্মান্দোলন আরও গোলমালের কারণ হয়। ১৭৭৪ সালে রামমোহন রায়ের জন্ম হয়। ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি স্থায়ীভাবে

কলকাতায় বাস করতে আসেন। তিনি বেদান্ত উপনিষদ ইত্যাদি হিন্দুর প্রাচীন শাস্ত্র অধ্যয়ন করে একেশ্বরবাদ মত প্রচার করেন। ব্যাপটিষ্ট মিশনারি উইলিয়াম এডাম তাঁর মতবাদ মেনে নেওয়ায় খ্রীষ্টান মিশনারিদের সঙ্গে রামমোহনের বিবাদ উপস্থিত হয়। গোঁড়া হিন্দুরাও তাঁর নিরাকার ব্রহ্ম উপাসনা ও একেশ্বরবাদকে মেনে নিতে পারেননি। রামমোহন রায় তাঁর সমর্থকদের নিয়ে প্রথমে আত্মীয়সভা নামে এক আলোচনা সভা করেন। তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী সমাজের প্রথম সম্পাদক ছিলেন। রামমোহনের সমর্থক ছিলেন টাকীর কালীনাথ রায়, মথুরনাথ মল্লিক, রাজকৃষ্ণ সিংহ, দ্বারকানাথ ঠাকুর, প্রসন্ন কুমার ঠাকুর প্রভৃতি। প্রাচীন হিন্দু দলে ছিলেন রাধাকান্ত দেব, মতিলাল শীল, রামকমল সেন, প্রভৃতি।

১৮২৮ সালে ডিবোজিও হিন্দু কলেজেব শিক্ষক নিযুক্ত হন। ছাত্ররা তাঁর অত্যন্ত অনুগত হয়।

"যখন একদিকে এই সকল বাগ্‌বিতণ্ডা ও আন্দোলন চলিতেছে তখন হিন্দু কলেজের মধ্যে ঘোব সামাজিক বিপ্লবের সূচনা দৃষ্ট হইল। ডিরোজিও হিন্দু কলেজে পদার্পণ করিয়াই চুম্বক যেমন লৌহকে টানে—সেইরূপ কলেজের প্রথম চারি শ্রেণীর বালককে কিরূপ আকৃষ্ট করিয়া লইলেন তাহা অগ্রেই বলিয়াছি। এরূপ অদ্ভুত আকর্ষণ, শিক্ষক ছাত্রের এরূপ সম্বন্ধ, কেহ কখনও দেখে নাই। ডিরোজিও তিনবৎসর মাত্র হিন্দু কলেজে ছিলেন, কিন্তু এই তিন বৎসরের মধ্যে তাঁহার শিষ্যদলের মনে এমন কিছু রোপন করিয়া দিলেন যাহা তাঁহাদের অন্তরে আমরণ বিদ্যমান ছিল। তাঁহাদের অনেকেই উত্তরকালে এক এক বিভাগে প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন। কিন্তু যিনি যে বিভাগে গিয়াছিলেন ডিরোজিওর শিক্ষাকে পশ্চাতে ফেলিয়া যাইতে পারেন নাই।"

ডিরোজিও কলেজের পর এক সভা করতেন তাঁর ছাত্রদের নিয়ে। তাতে —"রসিককৃষ্ণ মল্লিক, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রামগোপাল ঘোষ, রাধানাথ শিকদার, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, হরচন্দ্র ঘোষ প্রভৃতি উক্ত সভার প্রধান বক্তা, রামতনু লাহিড়ী, শিবচন্দ্র দেব, প্যারীচাঁদ মিত্র প্রভৃতি অপরাপর উৎসাহী সভ্য শ্রোতারূপে উপস্থিত থাকিতেন।" (রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ সমাজ। শ্রীশিবনাথ শাস্ত্রী। তৃতীয় সংস্করণ। ১৪০ পৃঃ ও ১০৭ পৃঃ, এস. কে. লাহিড়ী এণ্ড কোং।)

দেশের মধ্যে সত্যিকার ধর্মভাব সুশিক্ষা ছিল না, ধনীরা অকারণ আলস্যে ও

বিলাসে সময় কাটাতেন। দিনেরবেলা বুলবুলির লড়াই ও রাত্রে নেশা করে হৈ চৈ করতেন। তাই বাংলাদেশে নতুন শিক্ষাকে সাদরে গ্রহণ করা হল।

"প্রথম দীক্ষাগুরু ডেভিড হেয়ার, দ্বিতীয় ডিরোজিও ও তৃতীয় দীক্ষাগুরু মেকলে। তিনজনেই তাঁহাদিগের এক ধূয়া ধরাইয়া দিলেন; প্রাচীতে যাহা কিছু আছে তাহা হেয় এবং প্রতীচিতে যাহা আছে তাহাই শ্রেয়ঃ। এই অতিরিক্ত প্রতীচ্য পক্ষপাতিতার ঝোঁকে বঙ্গসমাজ বহুকাল চলিয়া আসিয়াছে।" (রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ। শ্রীশিবনাথ শাস্ত্রী এম. এ., তৃতীয় সংস্করণ, ১৫৫ পৃঃ. এস. কে. লাহিড়ী এণ্ড কোং)

নতুন ইংরাজী শিক্ষা আমাদের দেশে যেমন পাশ্চাত্য শিক্ষার নতুন দিগন্ত খুলে দিল, তেমনি সেই সঙ্গে পাশ্চাত্যের প্রতি অন্ধ ভক্তিভাব ও নিজ দেশীয় ঐতিহ্যের প্রতি বিতৃষ্ণার ভাব এনে দেয়। সমস্ত সামাজিক বিপ্লবেরই ঘাত প্রতিঘাত আছে। তাই উগ্র নবীন দলের পাশে উগ্র প্রাচীন পন্থীও ছিলেন। নবীনদলের মনে ফরাসী বিপ্লবের তরঙ্গের আঘাত এসে তাঁদেরও আন্দোলিত করে তোলে; প্রাচ্যের কিছুই ভাল নয় সবই পাশ্চাত্যের ভাল এই ভাব থেকে নবীন দলের মধ্যে অনেক ত্রুটি প্রবেশ করে। স্বাধীনচিন্তার ভাবটাও এ বিষয়ে একদেশদর্শীর মত হয়ে গিয়েছিল। তাই তৎকালের অনেক প্রতিভাধর বড় বড় ব্যক্তিদেরও অনেক উদ্যম সফল হতে পারেনি। তবে সেদিনের শক্তিক্ষয় থেকে ঘরের দিকে লোকের দৃষ্টি ফিরে এল।

১৮২৯ সালে সতীদাহ প্রথা আইন করে বন্ধ করা হয়।

"১৮৩০ সালের ১১ই মাঘ দিবসে রামমোহন রায় তাঁহার নবনির্ম্মিত গৃহে ব্রহ্মসভাকে স্থাপন করিলেন। প্রতিষ্ঠার দিনে সেই ভবনের ট্রাষ্টডীড হইতে বচন উদ্ধৃত করিয়া বলিয়া দেওয়া হইল যে ঐ ভবন জাতি বর্ণ সম্প্রদায় নির্ব্বিশেষে সকল শ্রেণীর মানবের ব্যবহারার্থ থাকিবে; এবং সেখানে একমাত্র নিরাকার সত্যস্বরূপ পরমেশ্বরের উপাসনা হইবে; তদ্ভিন্ন তথায় কোনও পরিমিত দেবতার পূজা হইবে না।" (রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ সমাজ—শ্রীশিবনাথ শাস্ত্রী এম. এ, তৃতীয় সংস্করণ, ১০৯ পৃঃ। এস. কে. লাহিড়ী এণ্ড কোং)

এই ঘটনায় কলকাতার হিন্দুরা অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে রাধাকান্ত দেবের নেতৃত্বে ধর্মসভা নামে এক সভা স্থাপন করেন। ঐ বছরই আলেকজাণ্ডার ডফ নামে এক মিশনারি খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের জন্য কলকাতায় আসেন। হিন্দু

কলেজের ছাত্র কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ও মহেশচন্দ্র ঘোষ খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করায় প্রাচীনপন্থীরা আরও উত্তেজিত হয়ে ওঠেন।

তখনকার লর্ড উইলিয়াম বেণ্টিকের আমলে ঠগী দমন, সতীদাহ নিবারণ, ইংরাজী শিক্ষার প্রচলন ও মেডিক্যাল কলেজ স্থাপন ইত্যাদি বহু সামাজিক উন্নয়ন ব্যবস্থা হয়। ১৮৩৫ সালে প্রধানতঃ তাঁর চেষ্টায় ভারতবর্ষে মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা হয়।

১৮৩৬ সালে বাংলাদেশে আরও একজন মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করেন।

"যে শিশু রামকৃষ্ণ নামে একদা পৃথিবীতে পরিচিত হইবেন, ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই ফেব্রুয়ারী তারিখে তাঁর জন্ম হইল।" (রামকৃষ্ণের জীবন রোমাঁ রোঁলা, অনুবাদ, ঋষি দাস। তৃতীয় সংস্করণ, ৬ পৃঃ। ওরিয়েন্ট বুক কোং, কলিকাতা)

১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্কিমচন্দ্রের জন্ম হয়। বাল্যে পাঁচ বৎসর বয়সে হাতে খড়ি হয় ও মেদিনীপুরে ছয় বৎসর বয়সে ইংরাজী স্কুলে ভর্তি হন। ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে মেদিনীপুর থেকে কাঁটালপাড়ায় ফিরে আসার অল্পদিন পরে ফেব্রুয়ারী মাসে, বঙ্কিমচন্দ্রের একটি পাঁচ বৎসরের মেয়ের সঙ্গে বিবাহ হয়। ঐ বছরই হুগলী কলেজে (মহম্মদ মহসীন কলেজ নাম ছিল) প্রবেশ করেন।

"এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, হুগলী কলেজে পড়িতে পড়িতেই ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের রচনার আদর্শে বঙ্কিমচন্দ্র 'সংবাদ প্রভাকরে' গদ্য পদ্য রচনা স্থরু করেন। দুই বৎসর ধরিয়া বঙ্কিমচন্দ্রের অনেক গদ্য পদ্য রচনা ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের প্রশস্তি সমেত সংবাদ প্রভাকরে প্রকাশ হইতে থাকে।" (সাহিত্য সাধক চরিতমালা (২২০) ব. চ., ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—১৫ পৃঃ। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ।)

১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে বঙ্কিমচন্দ্র আইন পড়বার জন্য হুগলী কলেজ থেকে প্রেসিডেন্সী কলেজে আসেন। তিনি থার্ড ইয়ার থেকে ট্রান্সফার নিয়ে এসেছিলেন।

"১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে এনট্রান্স ও ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে বি-এ পরীক্ষার প্রবর্ত্তন হয়। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে বঙ্কিমচন্দ্র প্রেসিডেন্সী কলেজের আইন বিভাগ হইতে এনট্রান্স পরীক্ষা দিলেন। তিনি পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। সে বৎসর উত্তরপাড়া স্কুল হইতে হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, কলুটোলা ব্রাঞ্চ স্কুল (বর্তমানে হেয়ার স্কুল) হইতে শিশিরকুমার ঘোষ, সংস্কৃত কলেজ হইতে কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য এবং হিন্দুস্কুল হইতে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও যোগেশচন্দ্র ঘোষ প্রভৃতি ও এনট্রান্স পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে

উত্তীর্ণ হন।" (সাহিত্য সাধক চরিতমালা (২২০), বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—১৯ পৃঃ। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ)

১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে এপ্রিলের গোড়ায় সর্বপ্রথম বি-এ পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়। বঙ্কিমচন্দ্র প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে আইন পড়তে পড়তে এই পরীক্ষা দিলেন। ১০ জন পরীক্ষা দেন। তার মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র ও যদুনাথ বসু দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হন। বঙ্কিমচন্দ্র প্রথম ও যদুনাথ বসু দ্বিতীয় হন। তবে তাঁদের দুজনকেই ৭ নম্বর গ্রেস দেওয়া হয়। বি.এ পাশ করার পরও কিছুদিন বঙ্কিমচন্দ্র প্রেসিডেন্সী কলেজে আইন পড়েন। পরে পড়া ছেড়ে যশোহরের ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর হন। ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে চাকুরী করতে করতে প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে বি-এল পরীক্ষা দেন এবং প্রথম বিভাগে তৃতীয় স্থান অধিকার করেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের বাল্যকালে কলকাতায় রামমোহন প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্ম সমাজের নতুন করে উন্নতি হয়। ১৮৩৩ সালে রামমোহন-রায় বৃষ্টলে মারা যাবার পর ব্রাহ্মসমাজ কোনরকমে টিকে ছিল। ১৮৪৩ সালে দ্বারকানাথ ঠাকুরের পুত্র দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হন। তিনি এই সমাজের নতুন করে উন্নতি করেন।

দেবেন্দ্রনাথ ১৮১৭ সালে জন্মগ্রহণ করেন তিনি হিন্দু কলেজে রামতনু লাহিড়ীদের সঙ্গে পাঠ করলেও ডিরোজিওর দ্বারা প্রভাবিত হননি। তাই তখনকার দিনের নব্যযুবকদের মত তাঁর মধ্যে অন্ধ পাশ্চাত্য প্রীতি দেখা যায় না। তিনি বাড়ীর প্রভাবে প্রাচীন ধর্মে আস্থাবান ছিলেন। পরে বেদান্ত ধর্মের অনুশীলনে যত্নবান হলেন। ১৮৩৮ সালে তত্ত্ববোধিণী সভা নামে এক সভা স্থাপন করেন। ১৮৪৩ সালে তত্ত্ববোধিণী পত্রিকা প্রকাশিত হয়। অক্ষয়কুমার দত্ত এর সম্পাদক ছিলেন। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, দেবেন্দ্র-নাথ ঠাকুর ও অন্যান্য প্রসিদ্ধ লোকেরা লিখতেন।

সাহিত্য সাধক চরিতমালা থেকে জানা যায়—

"প্রথম শ্রেণীতে দীর্ঘ দেড়বৎসর কাল বঙ্কিমচন্দ্র গোবিন্দচন্দ্র শিরোমণির কাছে পড়েন। ইনি কুমারহট্ট নিবাসী গঙ্গাধর তর্কবাগীশের পুত্র। এই শ্রেণীর পাঠ্য ছিল—'বেতাল পঞ্চবিংশতি' (২য় সং) ও 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' (১৭৭৪ শকাব্দা)।" (সাহিত্য সাধক চরিতমালা—২২০, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—১৮ পৃঃ। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ)

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকালে পিতার সঙ্গে কলকাতায় পড়তে আসেন। অত্যন্ত দারিদ্র্যের মধ্যে তাঁর বাল্যকাল কেটেছে। সংস্কৃত সাহিত্যে পণ্ডিত হয়েও নিজের চেষ্টায় তিনি ভাল ইংরাজী শিক্ষা করেছিলেন। বিদ্যাসাগর বাংলা গদ্যের ছন্দ ধরতে পেরেছিলেন। তাঁর বাংলা লেখা সংস্কৃত বহুল হলেও মাধুর্য মণ্ডিত।

"এককালে রামমোহন রায় যেমন শিক্ষিত ও অগ্রসর ব্যক্তিগণের অগ্রণী ও আদর্শ পুরুষরূপে দণ্ডায়মান ছিলেন এবং তাঁহার পদভরে বঙ্গসমাজ কাঁপিয়া গিয়াছিল, এই যুগে বিদ্যাসাগর মহাশয় সেই স্থান অধিকার করিয়াছিলেন।...

....

......বঙ্গ দেশের আভ্যন্তরীণ ইতিবৃত্ত গঠন বিষয়ে তিনি এই যুগের সর্বপ্রধান পুরুষ ছিলেন।" (রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ সমাজ, শিবনাথ শাস্ত্রী, ২০৮ পৃঃ, ৩য় সং)

১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে বিদ্যাসাগরের মৃত্যু হয়। তিনি একাধারে পণ্ডিত, স্রষ্টা, মানবপ্রেমিক, শিক্ষাপ্রচারক ও সমাজসংস্কারক ছিলেন। এরকম দৃঢ় চরিত্র বাংলাদেশে আর হয়নি।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত বাংলা সাহিত্যের আর একজন দিক্‌পাল। তিনি ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে মারা যান। এই অল্পদিনের জীবনেই তিনি বাংলা সাহিত্যে অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রচলন করেন ও নাটক ও প্রহসন লেখেন। তাঁর বহুভাষায় দখল ছিল। ইয়ংবেঙ্গল দলের ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও তিনি দেশের ঐতিহ্য সম্বন্ধে অত্যন্ত আগ্রহী ছিলেন; তাই বিদেশী সাহিত্যের সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃত সাহিত্যও অধ্যয়ন করেন। তাঁর বাংলা লেখায় তাই বিদেশী ও দেশীধারার মিশ্রণ দেখতে পাওয়া যায়।

ছাত্র জীবনে বঙ্কিমচন্দ্রের উপর দীনবন্ধু মিত্রের প্রভাব পড়েছিল বলে মনে হয়। দুজনে এক সময়ে ঈশ্বর গুপ্তর সংবাদ প্রভাকরে লিখতেন।

"১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাস হইতে ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের আগষ্ট মাসের প্রথম ভাগ পর্য্যন্ত বঙ্কিমচন্দ্রের কলিকাতার ছাত্র জীবন; এই সময়ে তিনি সম্ভবতঃ পড়াশুনা ও পরীক্ষা লইয়াই ব্যাপৃত্ত থাকিতেন। ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের আগষ্ট হইতে তাঁহার চাকুরী জীবন আরম্ভ হয়। যশোহরে গিয়াই দীনবন্ধুর সহিত তাঁহার পরিচয় হয় এবং এই পরিচয় ক্রমশঃ ঘনিষ্ঠতায় পরিণত হয়।" (সাহিত্য সাধক

চরিতমালা ২২০—৪১ পৃঃ, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ)

দীনবন্ধু মিত্র ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৮৭৩ সালে তাঁর মৃত্যু হয়। তিনি বাংলা সাহিত্যের একজন প্রসিদ্ধ লেখক। ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে ডাক-বিভাগে কাজ গ্রহণ করেন। ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে 'নীলদর্পণ' নামে বিখ্যাত নাটকটি ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয়। এতে লেখকের নাম ছিল না। নীলকরের অত্যাচারের কাহিনী এমন জীবন্তভাবে লেখা হয়েছিল যে পরবর্ত্তী বিদ্রোহের সহায়তা করেছিল। দীনবন্ধু মিত্র আরও অনেকগুলি নাটক লিখেছিলেন; এঁর উপর গুরু ঈশ্বর গুপ্তর প্রভাব ছিল খুব বেশী। বঙ্কিমচন্দ্রেব উপরও ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তর প্রভাব প্রথম জীবনে অল্প কিছু পড়েছিল কিন্তু তিনি কিছুদিন পরে নিজের প্রতিভাবলে তাঁর প্রভাব কাটিয়ে স্বকীয়তা দেখাতে পেরেছিলেন। কিন্তু দীনবন্ধু গুরুর প্রভাব একেবারে কাটিয়ে উঠতে পারেননি।

বঙ্কিমচন্দ্রের সময়ে আর একজন বিখ্যাত লোকের জন্ম হয়। ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দেই কেশবচন্দ্র সেনেরও জন্ম। তিনি হিন্দুকলেজের ছাত্র ছিলেন। ছাত্র অবস্থাতেই তিনি ভগবৎ বিষয়ে আলোচনা ও পড়াশোনা করতেন। তাঁর সহপাঠী সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহায়তায় দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। পরে তিনি ব্রাহ্ম ধর্ম্ম গ্রহণ করেন। ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কলকাতা ব্রাহ্ম-সমাজের আচার্য পদে প্রতিষ্ঠিত হন এবং দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছ থেকে ব্রহ্মানন্দ উপাধি পান।

"নববিধান প্রবর্ত্তক মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেনকে বঙ্কিমবাবু একজন প্রতিভা-সম্পন্ন ব্যক্তি (Genius) মনে করিতেন। প্রেসিডেন্সী কলেজে অধ্যয়নের সময় দুইজনে এক শ্রেণীতে পড়িতেন।" (বঙ্কিমচন্দ্র—৺কালিনাথ দত্ত, বঙ্কিম-প্রসঙ্গ-৺সুরেশচন্দ্র সমাজপতি সঙ্কলিত। ২৩৭ পৃঃ। মুখার্জ্জি বোস কোং)

"কেশবচন্দ্রের জীবদ্দশাতেই ভারতীয় ধর্মের চিন্তাধারা কেশবচন্দ্রের ব্রাহ্ম সমাজের বিরুদ্ধে একটি বিশুদ্ধ ভারতীয় সমাজ গড়িয়া তুলিল এবং পশ্চিমী-করণের সকল চেষ্টার প্রতিরোধ করিতে লাগিল। এই নূতন প্রতিষ্ঠানের পুরোভাগে রহিলেন অন্যতম শ্রেষ্ঠ পুরুষ দয়ানন্দ সরস্বতী।" (রোমাঁ রোঁলা লিখিত রামকৃষ্ণের জীবন—অনুবাদক, ঋষিদাস। তৃতীয় সংস্করণ, ১৯৫৬। পৃঃ ১০৮। ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি)

১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে দয়ানন্দ সরস্বতী বোম্বাইয়ে আর্য-সমাজ প্রতিষ্ঠিত করেন।

আর্য সমাজ বর্ণবিভেদ অস্বীকার করে· এবং স্ত্রী পুরুষের সমান অধিকার প্রচার করে।

বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য জীবন যখন বিকশিত হয় তখনকার একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা চৈত্রমেলা ; এ সম্পর্কে শিবনাথ শাস্ত্রী লিখেছেন—

"কেশবচন্দ্রের বক্তৃতা, দীনবন্ধুর নাটক, বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস, বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের সোমপ্রকাশ, মহেন্দ্রলাল সরকারের হোমিওপ্যাথি, এই সকলে এই কালের মধ্যে শিক্ষিত দলের মনে যেমন নবভাব আনিয়া দিতেছিল, তেমনি আর এক কার্য্যের আয়োজন হইয়া নব আকাঙ্খার উদয় করিয়াছিল। তাহা 'ন্যাশন্যাল পেপার' নামক সাপ্তাহিক পত্রের সম্পাদক নবগোপাল মিত্র মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত, 'জাতীয় মেলা' নামক মেলা ও প্রদর্শনীর প্রতিষ্ঠা এবং দেশের সকল বিভাগের ও সকল শ্রেণীর নেতৃবৃন্দের তাহার সহিত যোগ। বঙ্গ সমাজের ইতিবৃত্তে ইহা একটি প্রধান ঘটনা ; কারণ সেই যে বাঙ্গালীর মনে জাতীয় উন্নতির স্পৃহা জাগিয়াছে তাহা আর নিদ্রিত হয় নাই।" (রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ, শ্রীশিবনাথ শাস্ত্রী, তৃতীয় সংস্করণ, ২৫৭ পৃঃ। এস. কে লাহিড়ী এণ্ড কোং)

১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে চৈত্র সংক্রান্তিতে হিন্দু মেলার অধিবেশন হয়। গণেন্দ্রনাথ. ঠাকুর সম্পাদক ও নবগোপাল মিত্র সহকারী সম্পাদক হন। দেশের শিল্প, সাহিত্য, সঙ্গীত ইত্যাদির চর্চ্চা ও প্রচার হয়। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজনারায়ণ বসু ও দেশের অন্যান্য গণ্য মান্য ব্যক্তিরা সকলেই উৎসাহদাতা ছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের সমকালীন সমাজচিত্র আঁকতে গিয়ে আমরা বাংলার নবযুগের পরিচয় পেয়ে যাই। এই নবযুগ প্রবর্তক হিসাবে আমরা সকলের কাছেই ঋণী।

"রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ, কেশবচন্দ্র. রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, হরিশ মুখোপাধ্যায়, কৃষ্ণদাস পাল, উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, মাইকেল মধুসূদন, ঈশ্বরচন্দ্র, অক্ষয়কুমার, বঙ্কিমচন্দ্র ইঁহারা প্রত্যেকেই এ সম্মান পাইয়াছেন। (বঙ্কিমচন্দ্র, অক্ষয়কুমার দত্তগুপ্ত, কবিরত্ন এম, এ। ২০ পৃঃ। Published by Nogendra kumar Ray, City Library, Dacca.)

বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভা বিকাশে এই নতুন যুগ ও নতুন সমাজ যে অনেকখানি সাহায্য করেছে একথা অস্বীকার করবার উপায় নাই। তিনি প্রথম

যুগের ইয়ং বেঙ্গল দলের উন্মাদনা পাননি, কিন্তু প্রগতিশীল বুদ্ধিদীপ্ত মন পেয়েছিলেন, তার কারণ তাঁর সময়ে বাইরের দিক থেকে ধীরে ধীরে আবার ঘরের দিকে দৃষ্টি ফিরে আসছিল। তাই বঙ্কিমচন্দ্র ইংরাজী শিক্ষিত, সরকারী অফিসারের পুত্র ও সরকারী অফিসার হয়েও পুরাপুরি সাহেবী ভাবাপন্ন হতে পারেন নি। বাড়ীর আবহাওয়া তাঁকে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মাঝখানে রেখেছে

॥ ৪ ॥

॥ বঙ্কিমচন্দ্রের ধর্মমত ॥

বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য আলোচনা করলে দেখা যায় তিনি সাধক বা ধর্ম-প্রচারক ছিলেন না, তাঁর ভূমিকা ফিলসফার বা শিক্ষাদাতার। প্রত্যেক সাহিত্যিকই তাঁদের বক্তব্য সাহিত্যের মধ্যে ব্যক্ত করেন। বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন অত্যন্ত চিন্তাশীল ও যুক্তিবাদী তাই তাঁর লেখায় অকারণ পুলকের সন্ধান বড পাওয়া যায় না; অনেকদিনের সুচিন্তিত মতবাদ থাকে।

বঙ্কিমচন্দ্রের ধর্মমত আলোচনা করতে হলে—আগে দেখা দরকার ধর্ম বলতে আমরা কি বুঝি। ধর্ম এক অর্থে স্বভাব। এই দিক থেকে দেখলে—

"বঙ্কিমচন্দ্র বরাবরই একটু স্বাতন্ত্রধর্মী রাশভারী প্রকৃতির লোক ছিলেন, আপন স্বভাব-সুলভ গাম্ভীর্য্য লইয়া জনতা হইতে ত দূরে থাকিতেনই, সাহিত্যিক মজলিশেও আপন স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিয়া চলিতেন। এই কারণে দাম্ভিক বলিয়া তিনি নিন্দাভাজনও হইয়াছেন। কিন্তু বঙ্গদর্শন প্রকাশের উন্মাদনায় অসামাজিক বঙ্কিম সামাজিক হইয়া উঠিলেন; নিজে সব্যসাচীর মত লেখনী প্রয়োগ করিয়াই সন্তুষ্ট হইলেন না, গোষ্ঠীপাতরূপে নির্ব্বাচিত লেখকদের দিয়া আপন ফরমাশ অনুযায়ী প্রবন্ধ গল্প প্রভৃতি লেখাইতে লাগিলেন।" (সাহিত্য সাধক চরিতমালা—(২২০) ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৫০ পৃঃ। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ)

ধর্ম বলতে আর এক অর্থ করা চলে। মানুষ বঙ্কিম নয়, লেখক বঙ্কিমের বা কবি বঙ্কিমের স্বভাব যেখানে বোঝা যায়।

"এক মানুষের মধ্যে অনেক মানুষের বাস; এক মনের মধ্যেও তেমনি অনেক মন; যে মনটা আমাদের ব্যবহারিক জীবনের প্রধান সহায়, অবশ্য সাহিত্য ও শিল্প সৃষ্টিতেও তার প্রভাব কম নয়, তাকে বলি সচেতন মন। আর যে মন "পাতালে চ ভোগবতী", সজ্ঞান আলোর নীচে লুকিয়ে থেকে নিত্য বহমানা তাকে বলি অবচেতন মন, পাশ্চাত্ত্যরা বলেন, The stream of consciousness। আরও একটা মন থাকা সম্ভব, যাকে বলা চলে উচ্চেতন মন। ব্যক্তিমনের ঊর্দ্ধে যে একটি বিশ্বমানস আছে, সৌভাগ্যের শুভলগ্নে যাকে, "কোন কোন ভাগ্যবানে দেখিবারে পায়", সেই উচ্চেতন মনটাও কোন কোন

মানুষে সক্রিয়। এই তিনের মধ্যে সচেতন মনের প্রবল প্রতাপ তবে অধিকার সঙ্কীর্ণ. অনেকটা পুলিশের দারোগার মত আর কি। প্রশাসনিক উপমার জের টেনে বলা চলে অবচেতন মন যেন পুলিশের গোয়েন্দা, গোপন সঞ্চারে চলাফেরা করলেও তাব গতি-বিধি সর্বত্র, অদৃশ্য প্রভাব সর্বব্যাপী আর ভাব গতিক অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সুবিধার নয় ; আর উচ্চেতন মন, রাষ্ট্রপতি বা তাঁর প্রতিনিধির মতো, যিনি সর্বক্ষমতার আধাব হওয়া সত্ত্বেও কোন ক্ষমতা প্রয়োগ করেন না। থাকেন দূবে, থাকেন উর্দ্ধে, কেবল "কোন কোন ভাগ্যবানে দেখিবারে পায়"।

সাহিত্য ও শিল্প সৃষ্টিতে তিনটি মনেবই প্রভাব ও প্রক্রিয়া বিদ্যমান।" (বঙ্কিম সবণী—অধ্যাপক প্রমথনাথ বিশী, দেশ, ৩৩ বর্ষ, ১৩৭৩, ৩১ সংখ্যা, ৬১৩ পৃঃ।)

বঙ্কিমচন্দ্র নিজেকে আড়ালে রাখতেন। তিনি সর্বদা আত্মগোপন করে সৃষ্টিকে প্রাধান্য দিতেন। তাঁর জীবনে আদর্শ ছিল। বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আদর্শের নিষ্ঠাও তাঁর বৃদ্ধি পেয়েছে। দেশের মঙ্গল ও কল্যাণ কামনা করে তিনি সর্বদা সৃষ্টি কবেছেন। দেশেব মঙ্গলেব জন্যই যে সাহিত্য সৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা একথা অকপটে লিখে গিয়েছেন। এই লেখাতেই তাঁর সাহিত্যিক মন যা ধবা পড়েছে।

"যদি মনে এমন বুঝিতে পাবেন যে, লিখিয়া দেশের বা মনুষ্যজাতির কিছু মঙ্গল সাধন কবিতে পারেন, অথবা সৌন্দর্য সৃষ্টি কবিতে পাবেন, তবে অবশ্য লিখিবেন।... ....

......যাহা অসত্য, ধর্ম বিরুদ্ধ; পরনিন্দা বা পবপীড়ন বা স্বার্থ সাধন যাহার উদ্দেশ্য, সে সকল প্রবন্ধ কখনও হিতকর হইতে পারে না, সুতরাং তাহা একেবারে পরিহার্য। সত্য ও ধর্মই সাহিত্যের উদ্দেশ্য। অন্য উদ্দেশ্যে লেখনী-ধারণ মহাপাপ।" (বিবিধ প্রবন্ধ, ২য় খণ্ড, বাঙ্গালার নব্য লেখকদিগের প্রতি নিবেদন-বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়-২৭২ পৃঃ। যোগেশচন্দ্র বাগল সম্পাদিত বঙ্কিম রচনাবলী, ২য় খণ্ড, তৃতীয় মুদ্রণ।)

মানুষ বঙ্কিম অর্থের জন্য জীবিকার জন্য চাকুরী করেছেন কিন্তু সর্বদা দেশের আপামর জনসাধারণের মঙ্গলসাধনার কথা ভেবেছেন। সেখানে কোন দ্বিধা আসেনি। দেশের ও দশের মঙ্গল করার জন্য তাঁর প্রবন্ধ সাহিত্য, বিশেষতঃ কমলাকান্তর দপ্তর। তাঁর লেখায় সর্বত্র হাস্যরস ছিল কিন্তু কখনও ভাড়ামী

ছিল না।

"তাঁর হাসি বা ব্যঙ্গের অন্তরালে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই জাতিগত অপমান-লাঞ্ছনার জ্বালা ও বেদনার অশ্রু লুকাইয়া আছে।. প্রবন্ধগুলিতে যে চরম কথাগুলি বঙ্কিমচন্দ্র বলিতে পারেন নাই বিদ্রূপের আবরণে সে সকল কথা তিনি অতি সহজেই বলিতে পারিয়াছেন। বাংলাদেশের চিরন্তন গতানুগতিকতার বিরুদ্ধে কমলাকান্তী বঙ্কিমের এই বিদ্রোহ বাংলা সাহিত্যে অমর হইয়া আছে।" (সাহিত্য সাধক চরিতমালা (২২০) বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৫৮ পৃঃ। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ।)

ধর্ম বলতে আর বোঝায় আধ্যাত্মিকতা। যা আমাদের জীবনের সকল ক্ষেত্রে বিদ্যমান, আমাদের ধারণ করে আছে। এই ধর্মেরও আবার একটা সার্বভৌমিক অংশ আছে যা দেশভেদে ও কালভেদে পরিবর্তনশীল নয়। কিন্তু ধর্মের আর একটা অংশ দেশভেদ ও কালভেদে পরিবর্ত্তিত হয়। কারণ কোন দেশেই সমাজ ব্যবস্থা স্থিতিশীল থাকতে পারে না। অন্য সমাজ ও দেশের সঙ্গে মিশে নতুন নতুন ভাবধারা আসে। তাই চিরকালের নিয়ম আঁকড়ে ধরে থাকলে হয় না। আবার নতুনকেও সর্বাংশে গ্রহণ করলে চলে না, কারণ প্রত্যেক দেশের শিক্ষা সংস্কৃতি তার ঐতিহ্যের সঙ্গে জড়িত। তাই নতুন কালের নিয়ম ও ভাবধারার সঙ্গে দেশের প্রাচীন দিনের ভাবধারার একটা সামঞ্জস্য করা দরকার হয়। বঙ্কিমচন্দ্র বুদ্ধি দিয়ে একথাটা বুঝতে পেরেছিলেন। তাই তাঁর ধর্মমতের মধ্যে আমরা প্রাচীনকে নবীনের মধ্যে মিশাবার প্রচেষ্টা দেখতে পাই। কারণ তাঁর ধর্মের প্রধান অবলম্বন স্বাদেশিকতা ও মানবিকতা। মানুষের ভাল তথা দেশের বহুলোকের পরধর্মপ্রীতিকে রোধ করা তাঁর কর্ত্তব্য বলে মনে হয়েছিল; আর সেই জন্যই তিনি যুগোপযোগী ধর্মমত প্রচার করেন।

আমাদের দেশে ইংরাজী শিক্ষা প্রথমযুগে একদিকে যেমন স্বজাতীয় আচার-আচরণ, শিক্ষা বিরোধী ইয়ং বেঙ্গল দল সৃষ্টি করে, অন্যদিকে তেমনি আবার নিজ দেশের ঐতিহ্য ও আচার-আচরণে বিশ্বাসীও সৃষ্টি করে। মধুসূদন, কৃষ্ণমোহন, মহেশ ঘোষ ইত্যাদি হিন্দু কলেজের ছাত্রদের খ্রীষ্টান হওয়াও যেমন সেই তেমনই হিন্দু কলেজের ছাত্র হয়েও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্বদেশের ঐতিহ্যে বিশ্বাসের পরিচয়ও পাওয়া যায়। কারণ প্রত্যেক বিদ্রোহ বা আন্দোলন থেকে তার বিপরীত মতও সৃষ্টি হবেই।

১৮৬৪ থেকে ১৮৯৩ বঙ্কিমের উপন্যাস সৃষ্টির সময়। দেশের উপর তখন নানা ধর্মের আলোচনা ও প্রচার চলছে।

দেবেন্দ্রনাথ নিজেকে রামমোহনের কার্যের ধারক ও বাহক বলে মনে করতেন। তিনি হিন্দুধর্ম থেকে ব্রাহ্মধর্মকে আলাদা করতে চাননি। নিরাকার একেশ্বরবাদের উপাসনা ভিন্ন অন্য হিন্দু আচরণ ত্যাগ করেননি।

কেশবচন্দ্র সেন যুবকদলের উপর অসীম প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। তাঁর প্রচারগুণে দলে দলে লোক ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করতে থাকে। বঙ্কিমচন্দ্রও নিজে কেশবচন্দ্র সেনের প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল ছিলেন।

রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব ও দয়ানন্দ সরস্বতীর আবির্ভাব হয় এই সময়েই। *

বঙ্কিমচন্দ্র ইংরাজী শিক্ষা প্রবর্তনের ২য় যুগের মানুষ। প্রথমযুগের বিদ্বেষ ও আবেগপ্রবণতা নেই, তবে নাস্তিকতা আছে, আর বিশ্বাস করার আগ্রহ এসেছে। বঙ্কিমের যুগ ভাবের যুগ নয়, যুক্তির যুগ। এসময় যুক্তিবাদিতা এসেছে, আর সেই সঙ্গে বেন্থাম ও মিলের চিন্তাধারা ও কোমতের মতবাদ প্রভাব বিস্তার করেছে।

১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে বঙ্গদর্শন প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকায় বঙ্কিমচন্দ্র বিজ্ঞান, দর্শন, সাহিত্য, সমাজতত্ত্ব, ধর্মতত্ত্ব, ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব, অর্থনীতি, সঙ্গীত, ভাষাতত্ত্ব প্রভৃতি সমস্ত প্রয়োজনীয় আলোচনা করেন। তাঁর প্রবন্ধসাহিত্য সৃষ্টি ও বিস্তৃতির কাল, ১৮৭২-১৮৯২।

বঙ্কিমচন্দ্রের ধর্মমত সম্বন্ধে প্রকাশ্য আলোচনা প্রথম পাওয়া যায় ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসের ষ্টেটস্‌ম্যান পত্রিকায়। ঐ সালেরই অক্টোবর নভেম্বর মাসে শোভাবাজার রাজবাড়ীর এক শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে জেনারেল অ্যাসেমব্লিজ ইনষ্টিটিউশনের অধ্যক্ষ পাদরি হেষ্টি ষ্টেটস্‌ম্যান পত্রিকায় হিন্দু ধর্মের উপর যে আক্রমণ করেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র 'রামচন্দ্র' ছদ্মনামে তার উত্তর দেন। সেই সময় থেকেই তাঁর মনে হিন্দু ধর্মের মূল তত্ত্বের সম্বন্ধে নানা প্রশ্ন জাগে। এই লেখার ফলস্বরূপ প্রসিদ্ধ দার্শনিক যোগেশচন্দ্র ঘোষকে লেখা Letters on Hinduism ; এতে হিন্দুধর্মের মূল তত্ত্বের ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা আছে।

১৮৮১ খ্রীঃ সেপ্টেম্বর মাসে বেঙ্গল গভর্ণমেণ্টের অস্থায়ী অ্যাসিষ্ট্যাণ্ট সেক্রেটারী হয়ে বঙ্কিমচন্দ্র কলকাতায় ছিলেন। বউবাজারে তাঁর বাসায় প্রায় প্রতিদিন সাহিত্যিক বৈঠক বসতো। এই বৈঠকে দার্শনিক পণ্ডিত 'পজিটিভিষ্ট'

যোগেশচন্দ্র ঘোষও আসতেন। সমসাময়িক কালেই গোঁড়া কোম্‌ত ভক্ত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্যের সঙ্গেও তাঁর আলাপ আলোচনার কথা জানা যায়।

'বঙ্গদর্শনের' তৃতীয় বৎসবে ১২৮১ বঙ্গাব্দের চৈত্রমাসে (১৮৭৪ খ্রীঃ) বঙ্কিমচন্দ্র অক্ষয়চন্দ্র সরকার সম্পাদিত প্রাচীন কাব্য সংগ্রহের সমালোচনা লিখতে গিয়ে কৃষ্ণলীলা বিষয়ক কাব্যকে প্রতিষ্ঠিত করেন।

"এই অনুসন্ধানের ফলই বঙ্কিমচন্দ্রের 'কৃষ্ণচরিত্র'। এই ফল সম্পূর্ণ ফলিতে অনেক দেবি হইয়াছিল। তিনি কিছুকালের জন্য এই প্রসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। 'প্রচার' ও 'নবজীবন' প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে তিনি হিন্দু ধর্মের বিস্তৃত আলোচনায় বিশেষভাবে মনোনিবেশ করেন। 'প্রচাবেব' আশ্বিন-সংখ্যা হইতে পুনরায় 'কৃষ্ণচবিত্র' ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইতে থাকে। ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রথমভাগ পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় এবং ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে 'কৃষ্ণচরিত্র' (সম্পূর্ণ গ্রন্থ) বাহির হয়। (সাহিত্য সাধক চবিতমালা—(২২০) বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৬৯ পৃঃ। (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ)

বঙ্কিমচন্দ্রের কৃষ্ণচবিত্র সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

"বঙ্গদেশ যদি অসার প্রাণহীন না হইত তবে কৃষ্ণচরিত্রে বর্তমান পতিত হিন্দুসমাজ ও বিকৃত হিন্দু ধর্মের উপর যে অস্ত্রাঘাত আছে সে আঘাতে বেদনাবোধ এবং কথঞ্চিৎ চেতনালাভ করিত। বঙ্কিমের ন্যায় তেজস্বী প্রতিভা-সম্পন্ন ব্যক্তি ব্যতীত আর কেহই লোকাচার দেশাচারের বিরুদ্ধে এরূপ নির্ভীক স্পষ্ট উচ্চারণে আপন মত প্রকাশ করিতে সাহস করিত না। এমন কি বঙ্কিম প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্রের প্রতি ঐতিহাসিক বিচার প্রয়োগ করিয়া তাহার সার এবং অসার ভাগ পৃথক্‌করণ, তাহার প্রামাণ্য এবং অপ্রামাণ্য অংশের বিশ্লেষণ এমন নিঃসংকোচে করিয়াছেন যে এখনকার দিনে তাহার তুলনা পাওয়া কঠিন। (বঙ্কিমচন্দ্র—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর-আধুনিক সাহিত্য, ৮৯৫ পৃঃ। রবীন্দ্র রচনাবলী জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ, একাদশ খণ্ড।)

১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে ১২৯১ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ মাসের 'নবজীবনের' প্রথম প্রবন্ধ বঙ্কিমচন্দ্রের 'ধর্মজিজ্ঞাসা'। এই প্রবন্ধের ধর্মতত্ত্ব গ্রন্থের সূচনা বলা চলে। ১২৯১-এর শ্রাবণ থেকে ১২৯২-এর চৈত্র পর্যন্ত 'নবজীবনে' 'বিবিধ প্রবন্ধে' তিনি অনুশীলন ধর্ম আলোচনা করেন। এই প্রবন্ধগুলি পরিবর্তিত করে ১২৯৫-তে 'ধর্মতত্ত্ব' প্রথম ভাগ' 'অনুশীলন' (১৮৮৮) বার হয়।

'প্রচারে' দেহতত্ত্ব বিষয়ক একটি প্রবন্ধ ও শ্রীমদ্‌ভাগবদ্গীতার ব্যাখ্যা

করেছিলেন। কিন্তু এদুটি তাঁর শেষ করা সম্ভব হয়নি। গীতার ২য় অধ্যায়ের ষোল শ্লোক পর্যন্ত বার হয়। এই অসম্পূর্ণ ব্যাখ্যাই ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়।

১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি ও মার্চ মাসে 'সোসাইটি ফর হায়ার ট্রেণিং অব ইয়ংমেনের' (পরে কলিকাতা ইউনিভারসিটি ইনষ্টিটিউট) সাহিত্য-বিভাগেব সভাপতি হিসাবে বৈদিক সাহিত্যের উপর ইংরাজীতে দুটি বক্তৃতা করেন।

মৃত্যুর কিছুদিন আগে প্রাচীন ভারতবর্ষের পটভূমিতে দুইখানি উপন্যাস রচনার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু সে ইচ্ছা তাঁর পুরণ হয়নি।

"রমেশচন্দ্র দত্ত তৎসম্পাদিত 'হিন্দুশাস্ত্রের' (১৩৩২ বঙ্গাব্দ) 'ভূমিকায়' বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনের শেষ বৎসরের আর একটি ইচ্ছার কথা এইভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন—

আজ তিন বৎসর হইল, একদিন প্রাতঃস্মরণীয় বঙ্কিমচন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলাম। কথায় কথায় তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, বিপুল হিন্দু শাস্ত্র সমূহের সার সংগ্রহ করিয়া একখানি পুস্তকরূপে প্রকাশ করা সম্ভব কিনা? ......বঙ্কিমচন্দ্র উদারমনা, উৎসাহশীল, স্বদেশ-হিতৈষী লোক ছিলেন, অন্যে যে প্রস্তাবে সঙ্কুচিত হইত, তিনি সেরূপ প্রস্তাব শুনিয়া আনন্দিত হইলেন, অন্যে যে কার্যে ভীত হইত, তিনি সে কার্য্যে উৎসাহিত হইলেন। আহ্লাদের সহিত আমার প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন, এবং কয়েকজন স্বধর্মপ্রিয় বন্ধুর মত লইবার প্রস্তাব করিলেন।

কয়েকদিন পর তাঁহার গৃহে ঐরূপ কয়েকজন পণ্ডিত সমবেত হইলেন। প্রস্তাবিত কার্য্যে সকলেই মত দিলেন।......উৎসাহী বঙ্কিমচন্দ্র নিজে মহাভারতভত্ত্ব ভগবদ্গীতার অংশের সঙ্কলনের ভার লইলেন।" (সাহিত্য সাধক চরিতমালা—(২২০) বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৫১ পৃঃ। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ)

কিন্তু একাজও বঙ্কিম করে যেতে পারেননি। তার আগেই ১৮৯৪তে বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যু হয়।

'বঙ্কিমচন্দ্রের ধর্মশিক্ষা' প্রবন্ধে শ্রীপূর্ণ চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন—১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে শশধর তর্কচূড়ামণি হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিতে আরম্ভ করলে বঙ্কিমচন্দ্র একদিন গিয়ে আর যাননি।

"আসল কথা এই যে, পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে ধারাবাহিকভাবে কতকগুলি বক্তৃতা দিবার উদ্দেশ্যে কলিকাতায় আসিয়া বঙ্কিমবাবুর সাহায্য চান। তাঁহার নিকট সাহায্য চাহিবার কারণ এই যে, তখন তিনি 'নবজীবনে' ও 'প্রচারে' হিন্দু ধর্মের ব্যাখ্যা আরম্ভ করিয়াছিলেন। বঙ্কিমবাবু স্বীকৃত হইলে তাঁহার বাটীতে ঐ উদ্দেশ্যে একটি অন্তরঙ্গ সভা বসে, তাহাতে অনেক সাহিত্যিক ও স্বধর্মনিষ্ঠ ভদ্রলোক উপস্থিত হন। Albert Hall বক্তৃতার স্থান ঠিক হইল; বক্তৃতার দিনও স্থির হইল।

প্রথম দিবসে বঙ্কিমচন্দ্র কেবল যে শ্রোতা ছিলেন, এমত নহে, তিনি সভাপতিত্বে বৃত হইয়া চূড়ামণি মহাশয়কে শ্রোতাদিগের নিকট পরিচিত করিয়া ছিলেন। তারপর দুই একদিনমাত্র উপস্থিত হইয়াছিলেন, আর যান নাই। তাঁহার বিবেচনায় চূড়ামণি মহাশয়ের ব্যাখ্যাত ধর্ম এক্ষণে এদেশের উপযোগী নহে।' (বঙ্কিমচন্দ্রের ধর্মশিক্ষা—শ্রীপূর্ণ চট্টোপাধ্যায়—সুরেশচন্দ্র সমাজপতি সঙ্কলিত—বঙ্কিম-প্রসঙ্গ—৯২-৯৩ পৃঃ। মুখার্জি বোস কোং)

পণ্ডিত যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহাশয় নারায়ণ পত্রিকায় লিখেছিলেন শশধর তর্কচূড়ামণির বক্তৃতায় হিন্দুধর্মের প্রতি বঙ্কিমচন্দ্র, ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, অক্ষয়চন্দ্র সরকার প্রভৃতি মনীষীদের অনুরাগ ফিরে আসে। নতুবা বঙ্কিমচন্দ্র পাশ্চাত্য সংসর্গের ফলে কিঞ্চিৎ বিক্ষিপ্ত হয়েছিলেন। আবার চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় নারায়ণ পত্রিকায় 'বঙ্কিম-স্মৃতি' প্রবন্ধে লিখেছিলেন—চণ্ডীবাবু শশধর তর্কচূড়ামণির বক্তৃতা প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করলে—

"তিনি হাসিতে হাসিতে বলিলেন, 'কয়দিন তাঁর বক্তৃতা শুনিতে গিয়াছিলাম। ওরূপ বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাতে কতকগুলি অসার লোকে নাচিয়া ধরাকে সরা জ্ঞান করিতে পারে, কিন্তু ওতে কোন স্থায়ী ফল হইতে পারে না। মালা, তিলক, ফোঁটা ও শিখা রাখায় যে ধর্ম টঁ্যাকে, আর ঐগুলির অভাবে যে ধর্ম লোপ পায়, সে ধর্মের জন্য দেশ এখন আর ব্যস্ত নহে। তর্কচূড়ামণি মহাশয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, তিনি এখনও বুঝিতে পারেন নাই যে, নানা সূত্রে প্রাপ্ত নূতন শিক্ষার ফলে, দেশ এখন উহা অপেক্ষা উচ্চ ধর্ম চায়। কি হইলে এ দেশের সমাজ-ধর্ম এখন সর্বাঙ্গসুন্দর হয়, সে জ্ঞানই এঁদের নাই, তাই যা খুসি তাই বলিয়া লোকের মনোরঞ্জনে ব্যস্ত।" (বঙ্কিমচন্দ্রের ধর্মশিক্ষা—শ্রীপূর্ণ চট্টোপাধ্যায়—বঙ্কিম-প্রসঙ্গ, সুরেশচন্দ্র সমাজপতি—৯১-৯২ পৃঃ। মুখার্জি বোস কোং)

বঙ্কিমচন্দ্রের নিজস্ব ধর্মমত ঠিক প্রচলিত ধর্মমত নয়। আচার আচরণ অপেক্ষা বুদ্ধি ও বিচার দিয়ে তিনি তত্ত্বকে গ্রহণ করেছিলেন। নতুন ও পুরাতনের মধ্যে সমন্বয় সাধন করতে চেয়েছিলেন। তাঁর ধর্মশিক্ষা সম্বন্ধে পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বলেছেন—

"পিতৃদেবের উপদেশে এবং সংস্কৃত গ্রন্থাদি পড়িয়াই তাঁহার হৃদয়ে প্রথম ধর্মের উদ্দীপনা হয়। আমাদের মাতামহ সেকালে সংস্কৃত শাস্ত্রে একজন অদ্বিতীয় পণ্ডিত ছিলেন। তিনি বহুব্যয়ে ও বহুযত্নে অনেক সংস্কৃত গ্রন্থাদি সংগ্রহ করিয়াছিলেন। এই গ্রন্থগুলি সেকালে দুষ্প্রাপ্য ছিল, এখন ত বটেই। বঙ্কিমবাবুর সংস্কৃতের দিকে বড ঝোঁক দেখিয়া আমাদের মাতুল ঐ সমুদয় গ্রন্থ তাঁহাকে দিয়াছিলেন। উহা পাইয়া তিনি প্রত্যেক গ্রন্থখানি খেরুয়া কাপড়ে বাঁধিয়া একটি আলমাবী সাজাইলেন, আলমারী ভরিয়া গেল। ইহাব মধ্যে কোন শাস্ত্র না ছিল! এমন কি জ্যোতিষ ও তন্ত্রের পুঁথিও ছিল। সেজন্য তিনি ফলিত জ্যোতিষ শিখিয়াছিলেন। এই গ্রন্থগুলি পড়িয়াই বঙ্কিমবাবুর সংস্কৃত সাহিত্যে পাণ্ডিত্য জন্মে। নতুবা শ্রীবামবাগীশের টোলে মাঘ, ভারবি. নৈষধ প্রভৃতি কয়েকখানি কাব্য পড়িয়া তাঁহাব সংস্কৃত বিদ্যাব খতম হইত। এই সময হইতেই বঙ্কিমচন্দ্র ইংরাজী গ্রন্থেব পঠন ত্যাগ করিয়া কেবল সংস্কৃত গ্রন্থেব অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হইলেন। তারপর যখন হুগলীতে বদলী হইয়া আসিলেন, তখন কয় বৎসর পিতৃদেবের নিকটে থাকিয়া ধর্ম সম্বন্ধে শিক্ষা পাইতে লাগিলেন। কিছুদিন চুঁচুড়ায় থাকিতে হইয়াছিল; তথাপি রবিবাব রবিবার কাঁটালপাড়ায় আসিতেন। এইরূপে বঙ্কিমচন্দ্রের হিন্দুধর্মে শিক্ষা হইল। এই শিক্ষার প্রভাবেই তিনি তর্কচূড়ামণির হিন্দুধর্ম ব্যাখ্যায় আস্থা প্রদর্শন করিতে পারেন নাই, এই শিক্ষার ফলেই তাঁহার মন কখনও ধর্ম প্রচারকদের বক্তৃতায় গলিয়া হিন্দু ধর্মের দিকে প্রবাহিত হয় নাই; এই শিক্ষার ফলেই তিনি ধর্মতত্ত্ব, কৃষ্ণচরিত্র. আনন্দমঠ, দেবীচৌধুরাণী প্রভৃতি উপন্যাস লিখিয়াছিলেন, এই শিক্ষার ফলেই তিনি গীতার ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, এই শিক্ষার প্রভাবেই তিনি University Institute এ বৈদিক সাহিত্য সম্বন্ধে এক ধারাবাহিক বক্তৃতা আবম্ভ করিয়াছিলেন, কিন্তু শেষ করিতে না পারিয়া স্বর্গারোহণ করিলেন। কোন ধর্ম প্রচারকের নিকটে তিনি হিন্দুধর্ম শিক্ষা পান নাই। তাঁহার একমাত্র ধর্মোপদেষ্টা ছিলেন আমাদের পিতৃদেব। দেবীচৌধুরাণী গ্রন্থখানি তাঁহাকে উৎসর্গ করিতে গিয়া লিখিয়াছেন—

যাঁহার কাছে নিষ্কাম ধর্ম শুনিয়াছি, যিনি স্বয়ং নিষ্কাম ধর্ম ব্রত করিয়াছিলেন—"

······বঙ্কিমচন্দ্রের চুঁচুড়ার থাকা কালেই পিতৃদেবের মৃত্যু হয়। এই ঘটনার পরেই তাঁহার ভিতরে একটা গুরুতর পরিবর্ত্তন হয়। ইহার পর যে উপন্যাস লিখিয়াছিলেন তাহাতেই ঐ উদ্দেশ্য থাকিত। পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি আপনার কণ্ঠদ্বারা হিন্দুধর্মের ঠিক সেই ব্যাখ্যাই করিয়াছেন বলা যায় না।" (বঙ্কিমচন্দ্রের ধর্মশিক্ষা—শ্রীপূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—বঙ্কিম প্রসঙ্গ, সুরেশচন্দ্র সমাজপতি - ৯৫ পৃঃ। মুখার্জী বোস কোং)

বঙ্কিমচন্দ্রের ধর্মমত আলোচনা করে দেখা গেল ইউরোপীয় দর্শন ও হিতবাদের সঙ্গে ভারতীয় সনাতন ধর্মের গীতার দর্শন ও মতবাদকে মিলিয়ে অর্থাৎ সমন্বয় সাধন করে এক নতুন ব্যাখ্যা ও যুক্তিদ্বারা তিনি তাঁর ধর্মমতকে খাড়া করেছিলেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের ভক্তিবাদ ত্রুটিপূর্ণ কারণ অতিরিক্ত ভাববিলাসী করে তোলে। উনবিংশ শতাব্দীর হিতবাদীরা ও নিরীশ্বরবাদী কোম্‌ৎ ধর্মবাদীরা মানবতাকে দেবতার আসনে বসিয়েছেন। সাংখ্যদর্শন একেবারে জ্ঞানাশ্রয়ী। এইজন্য তিনি জ্ঞানকে স্বীকার করেও কর্মের সঙ্গে তাকে না রেখে, শুধু জ্ঞানের মহিমা দেখাতে চাননি। জ্ঞান ও কর্মের পরিণতি ভক্তিতে। আবার কর্ম ও ভক্তির মধ্যে জ্ঞান না থাকলে তা অসম্পূর্ণ। তাঁর এই চিন্তার সঙ্গে মিলেছিল গীতার, আর শ্রীকৃষ্ণের এই প্রসঙ্গে ডঃ সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত বলেছেন—

"বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্যের মধ্য দিয়া ধর্মতত্ত্ব প্রচার করিতে চাহিয়াছিলেন। তাঁহার ধর্মমতের বৈশিষ্ট্য কি? ভারতবর্ষ বহু ধর্মাবলম্বীর দেশ। তাই বঙ্কিমচন্দ্র এমন একটি ধর্ম প্রচার করিতে চাহিয়াছিলেন যাহা অসাম্প্রদায়িক, সার্বভৌমিক ও সার্ব্বজনীন। জলের যেমন কোন রং নাই, ঈশ্বরেরও তেমনি কোন জাতি নাই। কিন্তু ঈশ্বরের নিকট পৌছিবার অনেক পথ আছে। কেহ কেহ পথকেই বড় করিয়া দেখেন, সেইজন্য ধর্ম সাম্প্রদায়িক হইয়া পড়ে। বঙ্কিমচন্দ্র ধর্মকে সাম্প্রদায়িকতার গণ্ডী হইতে মুক্ত করিতে চাহিয়াছিলেন। প্রথমতঃ তিনি সাকারবাদ, জাতিভেদ প্রভৃতি অপচারকে অগ্রাহ্য করিয়াছেন। ঈশ্বর নিরাকার, তিনি একক অথচ সর্বব্যাপী। সুতরাং সকল মানুষই তাঁহার কাছে সমান। দ্বিতীয়তঃ বঙ্কিমচন্দ্র লোকবিশেষের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিলেও কোন মানুষকে দেবতা বলিয়া ভজনা করার বিরোধী ছিলেন। ইহা হইতে

অপর ধর্মে বিদ্বেষের সৃষ্টি হয়। খ্রীষ্টধর্মের এই সঙ্কীর্ণতার কথা তিনি স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন এবং ইসলাম ধর্ম মতাবলম্বীদের পরধর্ম বিদ্বেষেরও উল্লেখ করিয়াছেন। কৃষ্ণচরিত্রের মাহাত্ম্য তিনি কীর্ত্তন করিয়াছেন, কিন্তু কৃষ্ণকে আদর্শ মানুষ হিসাবে বিচার করিয়াছেন। তৃতীয়তঃ তিনি শাস্ত্রোক্ত বিধিকে অভ্রান্ত বা অপরিবর্ত্তনীয় মনে করিতেন না। বৈদিক যাগযজ্ঞকে তিনি তাচ্ছিল্য করিয়াছেন, ধর্ম বলিয়া শিরোধার্য করেন নাই। মল্লিনাথকে বড় করিয়া দেখিলে কালিদাস ছোট হইয়া পড়েন।" (বঙ্কিমচন্দ্র সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত ,তৃতীয় সংস্করণ, ১২ পৃঃ। এস. সি, সরকার অ্যাণ্ড সন্স)

সমগ্র বঙ্কিম-সাহিত্য পাঠ করলে অনেক সাধু সন্ন্যাসী পাওয়া যায়। তার কারণ শৈশবে পিতার কাছে এক সন্ন্যাসীর অলৌকিক ক্ষমতার কথা জেনে তাঁর সংসারত্যাগী সাধু সন্ন্যাসী সম্বন্ধে উচ্চ ধারণা ছিল। তাই বলে বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি তাঁরও কাম্য ছিল না তা বোঝা যায়। কারণ সন্ন্যাসীর ত্যাগের মহিমা বুঝলেও তাকে নায়কের সম্মান দেননি। এই প্রসঙ্গে অধ্যাপক বিশী বঙ্কিম সরণীতে বলেছেন—

"বঙ্কিম সাহিত্যে অনেক সাধু সন্ন্যাসী আছে, তারা পরপিণ্ডভোজী নিষ্কর্মা সামাজিক পরগাছা নয় ; তারা সকলেই পরহিতে সমর্পিতপ্রাণ, সমাজ ও দেশের কল্যাণাকাঙ্ক্ষী, তবু তারা কেউ গ্রন্থনায়কত্বের সম্মান পায়নি। বঙ্কিমচন্দ্র সন্ন্যাসকে পূর্ণ মনুষ্যত্বলাভের, পরবর্তীকালে যাকে অনুশীলন বা ধর্ম আখ্যা দিয়েছেন, অন্তরায় মনে করতেন। সংসারত্যাগী যিশু ও বুদ্ধ তাঁর চোখে আদর্শ মানব নয়, তাঁর বিবেচনায় হিন্দু ধর্ম, যাকে তিনি সনাতনধর্ম অর্থাৎ ধর্মের পূর্ণ আদর্শ মনে করতেন, গৃহীর ধর্ম সংসারত্যাগী সন্ন্যাসীর ধর্ম নয়। সংসারে কিছু পরহিতব্রতী সন্ন্যাসীর প্রয়োজন আছে, তবে সংসারত্যাগের দ্বারা আদর্শে পৌঁছুবার পথটা স্বেচ্ছায় যেন তাঁরা পরিত্যাগ করেছেন, এখানেই তাঁদের চরম আত্মত্যাগ, তুলনায় সংসারত্যাগ অকিঞ্চিৎকর। সন্ন্যাসকে সামাজিক আদর্শ বলে বঙ্কিমচন্দ্র মনে করেননি বলা বোধকরি যথেষ্ট নয়, তাঁর মতে সন্ন্যাসের ভ্রান্ত আদর্শ সমূহ ক্ষতির কারণ। সন্ন্যাস সম্বন্ধে শ্রীর ভ্রান্ত ধারণার ফলে সীতারামের চরিত্রগত মহত্ত্ব ও রাজ্য দুইই ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। গৃহীর মধ্যেই তিনি আদর্শ মানুষের সন্ধান করেছেন এবং তাঁর বিশ্বাস কৃষ্ণের চরিত্রে সেই মানুষের সাক্ষাৎলাভে সমর্থ হয়েছেন।" (বঙ্কিম-সরণী—প্রমথ নাথ বিশী-দেশ-৩৩বর্ষ, ৩১ সংখ্যা, ১৩৭৩ বঙ্গাব্দ, ৬১৬ পৃঃ।)

বঙ্কিমচন্দ্রের ধর্মমত আলোচনা করে দেখা গেল যে বঙ্কিমচন্দ্রের স্বভাবধর্ম, স্বাতন্ত্র্যপ্রিয়তা কিন্তু সাহিত্যিধর্ম ও আধ্যাত্মিকতা দুইই সমন্বয়ধর্মী। তিনি বুদ্ধি ও বিচার বিবেচনা দিয়ে তাঁর এই মতবাদের যুক্তিকে 'ধর্মতত্ত্ব' ও 'কৃষ্ণ-চরিত্রের' মধ্যে প্রকাশ করেছেন আর তার রসরূপ দেখতে পাই 'আনন্দমঠ', 'দেবী চৌধুরাণী' ও 'সীতারামে।'

॥ ৫ ॥

॥ বঙ্কিমচন্দ্রের স্বাদেশিকতা ॥

বঙ্কিমচন্দ্র যে যুগের মানুষ সে যুগে পরদেশপ্রীতির আবেগবিহ্বলতা হ্রাস পেয়েছে। নিজ দেশের প্রতি তাকাবার আগ্রহ আসতে আরম্ভ করেছে। তবে সংশয় তখনও কাটেনি, তাই দেশপ্রেম বা স্বাজাত্যবোধ দেখা গেলেও তার উপলব্ধির সঙ্গে আজকের উপলব্ধির মিল নেই। বঙ্কিমচন্দ্র যে যুগ পরিবেশে বেড়ে উঠেছেন তাঁর বুদ্ধি, জ্ঞান ও দূরদর্শিতা দিয়ে তাকে অতিক্রম করে গেলেও তার প্রভাবকে একেবারে পরিত্যাগ করতে পারেননি। তাই আজ আমরা সেদিনের স্বাদেশিকতাকে ভিন্নভাবে বিশ্লেষণ করি, ঠিক যেন ধরতে পারি না। রামমোহন, বিদ্যাসাগর, দেবেন্দ্রনাথ সকলেই স্বদেশের প্রতি আগ্রহশীল ছিলেন ; দেশের ঐতিহ্য সম্বন্ধে নিজে সচেতন হয়ে দেশবাসীকে সচেতন করতে চেয়েছেন ; দেশের কল্যাণ ও মঙ্গল চেয়েছেন। বঙ্কিমচন্দ্রও দেশের মঙ্গলের জন্য চিন্তা করেছেন আর তাঁর প্রকাশক্ষমতা প্রবল তাই আরও তীব্রভাবে সেই চিন্তাকে ব্যক্ত করেছেন।

আমাদের দেশের বোধহয় সমস্ত রকম নতুন চিন্তার উৎস রামমোহন রায়। তিনি নানা সংস্কার সাধনের মধ্য দিয়ে আমাদের আত্মসচেতন করতে চেষ্টা করেন। সতীদাহ ইত্যাদি অমানবিক সংস্কার দূর করে তিনি নূতন যুগের মানবিকতার বাণী ঘোষণা করেন। দেশের শিক্ষার জন্য তাঁর চেষ্টার অন্ত ছিল না। কেবল পশ্চিমের শিক্ষাকেই তিনি আহ্বান করেননি, নিজের দেশের প্রাচীন শাস্ত্র আলোচনা করে নিজ ঐতিহ্যের প্রতি তিনি দেশবাসীকে আকর্ষণ করেছেন। রামমোহনের এই চেষ্টা ব্যর্থ হয়নি। তাঁর পরবর্তীকালে দেশের শিক্ষিত সমাজের বিদেশের প্রতি ঐকান্তিক ভক্তি টলেছিল, নিজেদের সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠেছিল। রামগোপাল ঘোষ ও হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের প্রতিবাদমূলক বক্তৃতা লেখায় তার প্রমাণ পাওয়া যায়। সাহিত্যে দেশপ্রীতির প্রথম আভাস পাওয়া গিয়েছিল ঈশ্বরগুপ্তের রচনায়। ঈশ্বরগুপ্ত শিক্ষিত বাঙ্গালীকে নিজ ধর্মে ও সংস্কারে ফিরিয়ে আনতে চেয়েছিলেন। দেশপ্রেমের গভীরভাব দিতে না পারলেও বাঙ্গালীর বাঙ্গালীয়ানা ফিরিয়ে আনতে চেষ্টা করেছিলেন।

দেবেন্দ্রনাথের 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকা প্রথম থেকেই দেশের শিক্ষা সংস্কৃতি ও ধর্ম নিয়ে আলোচনা করে দেশপ্রেমের পরিচয় দিয়েছে। এই পত্রিকার মাধ্যমে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অক্ষয়কুমার দত্ত, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও রাজনারায়ণ বসু প্রভৃতি চিন্তাশীল স্বদেশপ্রেমিক লেখক নানাভাবে দেশের উন্নতি সাধনের চেষ্টা করেছিলেন।

সিপাহি বিদ্রোহ হয় ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে। বাঙ্গালী সিপাহি না থাকায় বাঙ্গালীর সঙ্গে এ বিদ্রোহের ঠিক যোগ ছিল না। তাছাড়া শিক্ষিত বাঙ্গালী সমাজ সংস্কার-বিমুখ এই বিদ্রোহে খুসি হয়নি, বরং আপত্তিই জানিয়েছিল। তবে একথা ঠিক, এই বিদ্রোহ থেকে জাতীয় জাগরণের ভাব প্রবল হয়। ঝান্সীর রাণী লক্ষ্মীবাইয়ের বীরত্ব দেখে ইংরেজরাও আশ্চর্য হয়।

টডের 'রাজস্থান কাহিনী' স্বাদেশিকতার আগ্রহ আরও বাড়ায়। এর থেকে কাহিনীর তথ্য অংশ গ্রহণ করে মাইকেল মধুসূদন দত্ত 'কৃষ্ণকুমারী' নাটক লেখেন। (১৮৬০)

নীলকরদের অত্যাচারের অকপট চিত্র দিয়ে দীনবন্ধু মিত্র 'নীলদর্পণ' নাটক লেখেন। এই বইখানাতে প্রথম বিদেশী অত্যাচারীদের মুখোশ খুলে দেওয়া হয়। লেখকের নাম বইয়ে ছিল না। সম্ভবতঃ মাইকেল মধুসূদন দত্ত বইটির ইংরাজী অনুবাদ করেন এবং পাদরি জেম্স লং নিজের নামে প্রকাশ করেন। নীলকররা আদালতে নালিশ করে। বিচারে ইংরেজ বিচারক জেম্স লং এর হাজার টাকা জরিমানা ও একমাসের কারাদণ্ড দেন। কালিপ্রসন্ন সিংহ হাজার টাকা দিয়ে দেন। তবে এই বই এমন আন্দোলনের সৃষ্টি করেছিল যে আরও অনেকে সেদিন নাকি টাকা নিয়ে আদালতে উপস্থিত ছিলেন।

ঈশ্বরগুপ্তের আর একজন শিষ্য রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় টডের রাজস্থান কাহিনী থেকে চিতোরের পতনের কাহিনী নিয়ে 'পদ্মিনী উপাখ্যান'নামে একটি আখ্যায়িকা কাব্য রচনা করেন (১৮৫৮)। রঙ্গলালের দ্বিতীয় কাব্য 'কর্মদেবী'রও 'শূরসুন্দরী'র কাহিনীও রাজস্থান কাহিনী থেকে নেওয়া।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত 'মেঘনাদবধ' কাব্যে (১৮৬১) নতুন অমিত্রাক্ষর ছন্দই দিলেন না, তিনি রামায়ণের কাহিনীকে নতুন যুগের উপযোগী করে রচনা করলেন। মাইকেলের কাব্যে ভারতীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে নতুন স্বদেশপ্রীতির কথা প্রকাশ পেয়েছে।

এই সময়ে আমাদের সাহিত্যে স্বাদেশিকতার প্রকাশ নানাভাবেই লক্ষ্য

করা যায়। জাতীয়তার প্রথম প্রকাশ লক্ষ্য করা যায় দেশের অতীত ইতিহাসের মধ্যে দেশপ্রেমের অনুসন্ধানে, শিক্ষিত লোকেদের অবিমিশ্র শ্রদ্ধার বদলে শাসকদের দোষ ত্রুটি লক্ষ্য করায় ও হিন্দুমেলার মধ্য দিয়ে' অখণ্ড ভারতের অনুভূতিতে।

সাহিত্যে উপন্যাস এসেছে অনেক পরে, একেবারে আধুনিককালে। মানুষের মন জীবন সম্বন্ধে সচেতন হলে উপন্যাস আসে। বাংলা উপন্যাস যে সময়ে আসে সে সময়ে সমাজে বৈচিত্র্যের অভাব ছিল। সামাজিক উপন্যাসের প্রধান উপকরণ নরনারীর প্রেম। সে সময় বাল্যবিবাহ প্রচলিত ছিল, বিধবা বিবাহ প্রচলিত ছিল না এবং অনাত্মীয় পুরুষের সঙ্গে নারীর মিশবার নিয়ম ছিল না। ফলে বিবাহিতা নারীর পারিবারিক রূপ ভিন্ন অন্য রূপ ফোটাবার ছিল না। পাতিব্রত্যের চাপে নারীর বিবাহিত জীবনের দ্বন্দ্বও তেমনভাবে ফোটা সম্ভব ছিল না। তাই দেখা যায় এই সময় বৈচিত্র্য আনবার জন্য ঐতিহাসিক পটভূমিই বেশী নির্বাচন করা হত। কয়েকটি সামাজিক ও পারিবারিক উপন্যাস (নক্সাজাতীয়) প্রকাশ হয়েছিল। তাছাড়া এই সময় শিক্ষিত বাঙ্গালীরা নতুন ভাবাধারায় অনুপ্রাণিত হন। মানবিকতা, স্বাতন্ত্র্যবোধ, জাতীয়তাবোধ ও স্বাজাত্যগর্ব সাহিত্যে নতুন জোয়ার আনে। দৈনন্দিন জীবনের মধ্যে এই নতুন উপলব্ধিকে সঞ্চারিত করা সম্ভব ছিল না। তার একটি কারণ সমাজ ব্যবস্থা ও অন্য একটি কারণ রাজনৈতিক অবস্থা। তাই ইতিহাসের ম্যাগ্নিফাইং গ্লাসে এই যুগের লেখকরা প্রাচীন ভারতের বীরত্ব, জাতীয়তাবোধ ও প্রেমানুভূতিকে দেখিয়েছেন। পরাধীন জাতির চরিত্র বিকাশের জন্য ও ঐতিহ্যবোধের জন্য এর প্রয়োজনীয়তাও সে সময়ে ছিল।

বাংলা উপন্যাস ইংরাজী আদর্শে সৃষ্টি হয়েছে। আর বিকাশের মধ্যেও খানিকটা ইংরাজী সাহিত্যের প্রভাব আছে। নবজাগরণ পর্বে ইংরাজী সাহিত্যে যে রোমান্টিকতা ও ঐতিহাসিক রহস্যপ্রিয়তা দেখা যায়, বাঙলা দেশেও তার প্রভাব পড়ে।

বঙ্কিমচন্দ্রের আগে বাংলা উপন্যাসের সূচনাপর্বে ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনার ক্ষীণ প্রচেষ্টা দেখা গিয়েছিল ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের ঐতিহাসিক উপন্যাসে এবং গোপীমোহন ঘোষের 'বিজয়-বল্লভ' এ। ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের উপন্যাস দুটির নাম 'সফল স্বপ্ন' ও 'অঙ্গুরী বিনিময়'।

ভূদেব মুখোপাধ্যায় ঐতিহাসিক উপন্যাসের মূল কথা ধরেছিলেন ঐতিহ্যবোধ

ও ইতিহাসের জ্ঞান থেকে। ইতিহাসের সত্যতারক্ষা ও পরিবেশ সৃষ্টির দিকে তাঁর সমান দৃষ্টি ছিল। কিন্তু তিনি স্বভাবতঃই ছিলেন প্রবন্ধকার। তাই যুক্তিনিষ্ঠ তথ্য ও তত্ত্ববহুলতা তাঁর উপন্যাসে আছে, পরিমিতিবোধ ও পাণ্ডিত্য আছে কিন্তু ঔপন্যাসিকের সহৃদয় সরসতা তাতে নাই। তাই তত্ত্বের দিক থেকে খাঁটি ঐতিহাসিক উপন্যাস হলেও মাধুর্যের অভাবে সমাদর পায়নি। 'বিজয়-বল্লভ' নেহাৎ রূপকথাধর্মী রচনা সুতরাং 'দুর্গেশনন্দিনীই' প্রথম সার্থক বাংলা উপন্যাস এবং সার্থক ইতিহাস আশ্রিত কাহিনীর প্রথম প্রকাশ। বঙ্কিমচন্দ্র 'দুর্গেশনন্দিনী'র পর তিনখানি ইতিহাস আশ্রিত কাহিনী নিয়ে লেখেন। দুটি সামাজিক উপন্যাসের পর আবার ঐতিহাসিক পটভূমি তাঁর উপন্যাসের জন্য বেছে নেন। 'রাজসিংহ' ও পরে 'আনন্দমঠ', 'দেবীচৌধুরাণী' ও 'সীতারাম' বঙ্কিমচন্দ্রের ঐতিহাসিক উপন্যাসেব শেষ সম্ভার। ঐতিহাসিক উপন্যাসের নানা বিচার বিশ্লেষণ অনুযায়ী বঙ্কিমচন্দ্রের সব কটি ইতিহাসআশ্রিত বইকে ঐতিহাসিক উপন্যাস বলা যায় না। তিনি এইজন্য তাঁর উপন্যাসগুলির মধ্যে একমাত্র 'রাজসিংহ'কে ঐতিহাসিক উপন্যাস আখ্যা দিয়েছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রায় সমসাময়িক রমেশচন্দ্র দত্ত। চারখানি ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখেছিলেন। 'বঙ্গবিজেতা', 'মাধবীকঙ্কণ', 'মহারাষ্ট্র জীবন প্রভাত' ও'রাজপুত জীবন-সন্ধ্যা'। ঐতিহাসিক উপন্যাসকাররূপে বঙ্কিমচন্দ্র এবং রমেশচন্দ্রের তুলনামূলক আলোচনায় একটি কথা মনে রাখা দরকার; বঙ্কিমচন্দ্র প্রথমতঃ সাহিত্যিক পরে ঐতিহাসিক এবং রমেশচন্দ্র প্রথমতঃ ঐতিহাসিক পরে সাহিত্যিক।

বঙ্কিমচন্দ্র জাতীয়তাবোধের ধারক ও বাহকরূপে এই নতুন অনুভবের যুগে দেখা দিয়েছিলেন। তাঁর ইতিহাস আশ্রিত উপন্যাসে ভারতের নানা গৌরব-কথা ও আদর্শবাদ এবং সামাজিক উপন্যাসে শিল্পের সঙ্গে মিলে মিশে রয়েছে তাঁর উচ্চ আদর্শ। বঙ্কিম দেশের মঙ্গল করবার আগ্রহ বাদ দিয়ে কেবল নিজের মনের আনন্দে কিছু লেখেননি। নানাভাবে তিনি জাতীয় জাগরণে সহায়তা করেছেন।

১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গদর্শন প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকায় নানা বিষয়ের আলোচনা করেন। ইতিহাস, ভাষাতত্ত্ব, সাহিত্য সমালোচনা, সমাজতত্ত্ব তো ছিলই এমনকি রাজনৈতিক আলোচনাও বাদ যায়নি। 'সাম্য' প্রবন্ধ তার সাক্ষ্য বহন করছে।

" 'আনন্দমঠে'র 'বন্দেমাতরম্' সঙ্গীতে যাহার পূর্ণ পরিণতি, 'মৃণালিনী'তে

যাহার সূত্রপাত, 'কমলাকান্তে' সেই মাতৃমন্ত্রের প্রথম সার্থক প্রকাশ। বাঙালী-জাতির পরাধীনতার সুগভীর ধিক্কার এখানেই বঙ্কিমচন্দ্রের মনে নিদারুণ তীব্রতায় ফুটিয়া উঠিয়াছে। মাতৃপূজার মন্ত্র শিখাইয়া বঙ্কিমচন্দ্র সর্ব্বপ্রথম আমাদের জাতীয়তাবোধ জাগ্রত করিয়া আমাদিগকে সচেতন করিয়াছেন এই 'কমলাকান্তে'। আধুনিক বাঙালীর রাষ্ট্রীয় সাধনার ইতিহাসে প্রকৃতপক্ষে কমলাকান্ত হইতেই আমাদের যাত্রা সুরু।" (সাহিত্য সাধক চরিতমালা—২২০ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়-৬০ পৃঃ। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ।)

বঙ্কিমচন্দ্রের সমস্ত উপন্যাসে অল্পবিস্তর দেশের মঙ্গলাকাঙ্খা ব্যক্ত হলেও স্পষ্ট হয়েছে 'মৃণালিনী', 'চন্দ্রশেখর' ও 'রাজসিংহ'তে কিন্তু পরিণতি লাভ করেছে 'আনন্দমঠে'।

'আনন্দমঠ' আমাদের স্বদেশী আন্দোলনে যে ভূমিকা গ্রহণ করে, তাকে বলা যায় প্রথম পরিচ্ছন্ন স্বদেশী শিক্ষার সোপান। অধ্যাপক বিশীর ভাষায় 'আনন্দমঠ' জাতীয় জাগরণের "বর্ণপরিচয়"। রুশো, ভলটেয়ারের সাহিত্য যেমন ফরাসী বিপ্লবের জন্ম দিয়েছিল, টমাস পেনের 'common sense' ও 'crisis' পেয়ে যেমন আমেরিকার ঔপনিবেশিকরা জেগে উঠেছিলেন—আমাদের মনে রাখা উচিত, বঙ্কিমের 'কমলাকান্তর দপ্তর' ও 'আনন্দমঠ'ও সেই ভূমিকা নিয়েছিল।

"আনন্দমঠ ও গীতাগুলি আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন বাংলা গ্রন্থ।

ভারতীয় রাজনীতির উপরে আনন্দমঠের প্রভাব অপরিসীম। নব্যভারতে লিখিত আর কোন গ্রন্থ সর্বভারতীয় রাজনীতি ও জীবনবাদের উপরে এমন প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছে বলে মনে হয়না।" (বঙ্কিম সরণী—প্রমথ নাথ বিশী—দেশ ৩৩ বর্ষ ৩৭ সংখ্যা—১৩৭৩ সাল—১২৪১ পৃঃ)

'কমলাকান্তর' 'দুর্গোৎসবে' বঙ্কিমচন্দ্র যা বলেছেন 'আনন্দমঠে' যেন তা আরও জোর দিয়ে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

'আনন্দমঠের' স্বাজাত্যবোধের বিষয়ে নানা বিতর্ক প্রচলিত। অনেকে মনে করেন আমাদের দেশের সন্ত্রাসবাদীরা এই উপন্যাস থেকে আদর্শ পেয়েছিলেন। কিন্তু লক্ষ্য করলেই দেখা যায় বঙ্কিমচন্দ্র বুঝেছিলেন দেশের সেবার জন্য একাগ্রতা, ত্যাগ ও জ্ঞানের প্রয়োজন আছে। কেবল উত্তেজনায় কখনও মহৎ ও স্থায়ী ফল পাওয়া যায় না। তাই 'আনন্দমঠের' ভূমিকায়

বলেছেন যে "সমাজ বিপ্লব অনেক সময়েই আত্মপীড়ণমাত্র, বিদ্রোহীরা আত্মঘাতী।" তিনি অত্যাচারী শাসকদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের কথা 'আনন্দমঠ' ও 'দেবীচৌধুরাণীতে' বলেছেন কিন্তু অন্তরের সমর্থন না থাকায় তাকে মেনে নেননি। 'আনন্দমঠে' দেখা যায় মহাপুরুষ সত্যানন্দকে তাঁর কর্মক্ষেত্র থেকে সরিয়ে নিচ্ছেন। অত্যাচারের বিরুদ্ধে সাময়িক বিদ্রোহ হতে পারে কিন্তু তার ফল শুভ নয়। তিনি সমাজ অনুমোদিত কাজ ও সহজ সমাজ ব্যবস্থায় সমর্থন জানিয়েছেন। তাই মহাপুরুষকে (চিকিৎসক) দিয়ে সত্যানন্দের ঐ উত্তেজনাকে নিয়ন্ত্রণ করিয়েছেন।

'আনন্দমঠে' সন্তানদলের সর্বত্যাগী ব্রত অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে বঙ্কিম আমাদের দেশের প্রতি ঐকান্তিক নিষ্ঠার শিক্ষা দিয়েছেন। নারী বর্জনের জন্য তাঁকে আজ হয়তো দোষ দেওয়া যায় কিন্তু তখন বাইরের কাজের উপযোগী মেয়ে তিনি দেখেননি। তাই শান্তিকে সৃষ্টি করে তিনি দেখাতে চেয়েছেন আমাদের স্বদেশী আন্দোলনের জন্য যেমন ত্যাগী সন্তানদল চাই, তেমনি শান্তির মত আত্মসুখ বিসর্জন করবার মত ক্ষমতাধারী নারীও পাশে থাকা চাই। কল্যাণীব মত উচ্চ আদর্শের জন্য প্রাণ ত্যাগে প্রস্তুত. এরকম নারীও জাতীয় আন্দোলনের সময় দরকার।

বঙ্কিমের 'আনন্দমঠ' ও স্বাদেশিকতা সম্বন্ধে আর এক অভিযোগ তিনি কেবল হিন্দুদের জন্য দেশের কথা বলেছেন, হিন্দু মুসলমানের কথা বলেননি। একথা সত্য নয়। তিনি মুসলমান শাসকের অত্যাচারের কথা বলেছেন সাধারণভাবে ; মুসলিম বিদ্বেষ তাঁর সাহিত্যে, বিশেষ করে 'আনন্দমঠে' প্রকাশ পায়নি।

"ধর্ম্ম প্রচারকদের রচনায় যে ধরনের বিদ্বেষ পরিদৃষ্ট হয়, বঙ্কিম-সাহিত্যে তাহা আছে কিনা তাহা বিশেষভাবে বিবেচনা করিয়া দেখিতে হইবে। একটু লক্ষ্য করিলেই দেখা যাইবে যে সমগ্র বঙ্কিম-সাহিত্যে সে-ধরণের কোন বিদ্বেষপূর্ণ ভাবধারা নাই। কেহ কি দেখাইতে পারিবেন যে, বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার সমগ্র গ্রন্থে কোথাও ইস্লাম ধর্ম্মকে আক্রমণ করিয়াছেন? ইসলামের শিক্ষা, সভ্যতা, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও ধর্মগ্রন্থ—এসকলকে কি তিনি কোথাও আক্রমণ করিয়াছেন? হজরত মহম্মদের প্রতি কি তিনি কোথাও অশ্রদ্ধার ভাব দেখাইয়াছেন? ইস্লামের রীতিনীতি, সৌন্দর্য্য প্রভৃতির উপর তিনি ব্যঙ্গোক্তি করিয়াছেন? তাহা যদি না করিয়া থাকেন, তবে তাঁহাকে ইস্লাম বিদ্বেষী

অথবা মুসলমানের শত্রু মনে করিবার কোন কারণই থাকিতে পারে না। তিনি যদি কাহাকেও আক্রমণ করিয়া থাকেন তবে তাহারা এক এক জন ব্যক্তি। ভারতে মুসলমান নৃপতিগণের কয়েকজন, তাঁহাদের শাসন পদ্ধতির কয়েকটি নীতি, সেনা-বিভাগের কয়েকজন কর্মচারী, অথবা নবাব বাদসাহদের কুমার-কুমারী ইহারাই তাঁহার আক্রমণের বিষয়। ইহাদিগকে লইয়া কি সমস্ত ইসলামের কাঠামো রচিত যে, ইহাদের সম্বন্ধে বিরুদ্ধ মন্তব্য প্রকাশ করিলেই লেখককে ইস্লাম-বিরোধী বলিতে হইবে?" (বঙ্কিমচন্দ্র ও মুসলমান সমাজ— রেজাউল করিম, এম, এ, বি. এল, ২য় সংস্করণ ১১-১২ পৃঃ, ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং।)

বঙ্কিমচন্দ্রের সম্বন্ধে সবচেয়ে বড় অভিযোগ তিনি স্বাদেশিকতার কথা বলেছেন কিন্তু স্বাধীনতা চাননি। ইংরেজ রাজত্ব কায়েম হ'ক তাই চেয়েছেন। এখানেও তাঁর প্রতি অন্যায় দোষারোপ করা হয়েছে। তিনি ইংরেজের শাসন চিরকালের জন্য কায়েম হ'ক এটা চাননি। দেশের লোককে প্রস্তুত হতে বলেছেন। মানবিক সমুন্নতি ভিন্ন দেশের সুশাসন ও সুব্যবস্থা সম্ভব নয়। তাই প্রাচীন ভারতবর্ষের রীতিনীতি ও আধুনিক ইংরাজ শাসিত ভারতের কথা বিবিধ প্রবন্ধের মধ্যে আলোচনা করে দেখিয়েছেন। তখনকার উৎসাহী রাজনীতিকারদের তিনি বলতে চেয়েছেন, ইংরেজ তাড়াবার তাড়া না দেখিয়ে আগে নিজেদের গড়া দরকার। তাই দেশপ্রেমের কথা আছে, মাতৃমন্ত্র বন্দেমাতরম্ আছে, কিন্তু তাঁর লেখায় ইংরেজ বিদ্বেষ নাই। 'আনন্দমঠে' তিনি ভক্তি দিতে বলেছেন। 'দেবীচৌধুরাণী'তে গীতার নিষ্কাম ধর্মের আদর্শ দেখিয়ে আমাদের সমাজে সেরকম নিষ্কাম কর্মী সৃষ্টির আকাঙ্ক্ষা পোষণ করেছেন। 'সীতারামে' দেখিয়েছেন, ক্ষমতাবলে রাজ্য স্থাপন করেও নিষ্কাম সাধনার শিক্ষা না থাকায় সীতারামের রাজ্য কিভাবে ধ্বংস হয়ে গেল। তাই নিজেদের সংগঠন করে তবে স্বাধীন হতে হয়।

ইংরেজ রাজত্বের আগে দেশে অরাজকতা চলছিল—সে সময়ে ঠগী, বর্গী, চোরডাকাতরা প্রাধান্য পেয়েছিল, শিক্ষা সংস্কৃতিরও চরম দুরবস্থা হয়েছিল। ইংরেজ স্থায়ীভাবে শাসনভার নিয়ে দেশে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনে। তাছাড়া ইংরেজের কাছ থেকেই সাম্যতত্ত্ব, রাজনীতি, স্বাজাত্যবোধ ও ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদ এদেশে এসেছে। রুশো, ভলটেয়ার, বেন্থাম, মিল, কোম্‌ত প্রভৃতি মণীষীরা ও এডমণ্ড বার্ক এর মত ভারত হিতৈষীরা তখনকার ভারতের তথা বাংলার

আদর্শ ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র স্পষ্টভাষায় ইংরেজের সংগুণের আলোচনা করে ও তাদের শাসনের প্রশংসা করে অখ্যাতি পেয়েছেন ঠিকই, কিন্তু তখনকার রাজনৈতিক আন্দোলনের দিকে তাকালে দেখা যায়, ইংরেজের প্রতি তখনও গভীর বিশ্বাস ছিল। দোষ ত্রুটি দেখে সমালোচনা করা, নিজেদের অভাব অভিযোগ ও অধিকারের সীমা বাড়াবার জন্য আবেদন নিবেদন করলেও— 'ইংরেজ ভারত ছাড়, আজই আমরা স্বাধীনতা চাই' একথা কেউই বলেননি। উনবিংশ শতাব্দীর আন্দোলনের মধ্যেই ছিল সসঙ্কোচ পদক্ষেপ। আজ আমরা নিজেদের শাসনব্যবস্থার ত্রুটি নিয়ে সমালোচনা করি কিন্তু তার উচ্ছেদ চাইনা; চাই কিছু কিছু পরিবর্ত্তন। তেমনি তখনকার ইংরেজ শাসনও বিধি নির্দ্দিষ্ট এই ভেবে, ভারতীয়রাও তাদের উচ্ছেদ চাননি। বঙ্কিম রাজ সরকারে কাজ করতেন বলেই এই অস্পষ্টতা একথা সত্য নয়। ইংরেজ শাসকের অধীনে কাজ করার গ্লানির কথা ব্যক্তিগত কথার সময়ে অনেকবারই বলেছেন বলে জানা যায়।

'বন্দেমাতরম্' গানটি 'আনন্দমঠের' আগের রচনা। কমলাকান্তর দুর্গোৎসবে যে মাতৃমূর্ত্তি দেখতে পাওয়া যায় 'বন্দেমাতরম্' গানেও সেই দেশমাতৃকার গৌরবোজ্জ্বল মূর্ত্তি। দেশের তৎকালীন লোকের স্বাজাত্যবোধের অভাব তিনি অনুভব করেছিলেন।

"বন্দেমাতরম্ গানটি 'আনন্দমঠের' বহু আগে রচিত। শোনা যায় বঙ্গদর্শনের পাতায় ফাঁক থাকলে তিনি তাড়াতাড়ি কিছু লিখে দিতেন। একবার গানটি লিখে রাখার পর বঙ্গদর্শনের একটি পাতা ভরাবার জন্য 'পণ্ডিত মহাশয়' কিছু লেখা চান এবং ঐ গানটি দেখতে পেয়ে মন্তব্য করেন 'উহা মন্দ নয়'ত—ঐটা দিন না কেন?' সম্পাদক বঙ্কিমচন্দ্র বিরক্ত হইয়া কাগজখানি টেবিলের দেরাজের ভিতর রাখিয়া বলিলেন, 'উহা ভাল কি মন্দ, এখন তুমি বুঝিতে পারিবে না, কিছুকাল পরে বুঝিবে—আমি তখন জীবিত না থাকিবারই সম্ভব, তুমি থাকিতে পার।" (বঙ্কিমচন্দ্রের বাল্যকথা—শ্রীপূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিম প্রসঙ্গ, সুরেশচন্দ্র সমাজপতি সঙ্কলিত, ৫৩ পৃঃ, মুখার্জি বোস কোং।)

তিনি দেশের লোকের প্রস্তুতির জন্য আনন্দমঠ লিখেছিলেন। সর্বমোহ-মায়া ও বন্ধন ত্যাগ করে পরিপূর্ণ হৃদয় মন নিয়ে মাতৃসেবায় লাগার উপযোগী সন্তানদল চেয়েছেন, বিদ্রোহ চাননি। এতে ইংরেজ বিদ্বেষ বা বিতাড়নের কথা নাই তবে জাগরণের মন্ত্র আছে। বাংলার গভর্ণর রোনল্ডশে তার

Heart of Aryavarta গ্রন্থে 'আনন্দমঠ'কে "A parable of patriotism" বলেছেন। 'ত্রয়ী'তে তিনি সংগঠনমূলক স্বদেশচিন্তার পরিচয় দিয়েছেন। কমলাকান্ত ও বিভিন্ন প্রবন্ধে জাতীয়তা সম্বন্ধে যা বলেছেন এখানে তারই রসরূপ পাওয়া যায়।

ডঃ সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত বলেছেন—

"বঙ্কিমচন্দ্র নিছক রাষ্ট্রনীতিক আন্দোলনকে তুচ্ছ করিয়াছেন এবং 'লোকরহস্য' গ্রন্থে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের অসারতা লইয়া ব্যঙ্গ করিয়াছেন। তিনি চাহিয়াছেন ধর্ম আচরণের স্বাধীনতা এবং আপামর সাধারণের আর্থিক স্বচ্ছলতা। এই শেষোক্ত ক্ষেত্রে এ দেশে তিনি বর্তমানকালের সর্বাপেক্ষা প্রগতিশীল আন্দোলনের প্রধান অগ্রদূত। তিনি দেশবাৎসল্যের উদ্গাতা, জন্মভূমি যে জননীর মত গরীয়সী এইকথা তিনিই সর্বাপেক্ষা উদাত্তকণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার দেশবাৎসল্য ভাবুকের স্বপ্ন নহে, অভিজাতের প্রাধান্যলাভ নহে, জনসাধারণের কল্যাণকে তিনি স্বদেশপ্রীতির মূলমন্ত্র করিয়াছেন। তাই তিনি দেশপ্রীতি ও লোকপ্রীতির সামঞ্জস্য করিতে চাহিয়াছেন। বাঙলা ও ভারতবর্ষের মধ্যে যে নানা ধর্ম্ম ও নানা জাতির সম্মিলন হইয়াছে তাহাদের সমবেত আশা আকাঙ্ক্ষা, সুখ ও বেদনা তাঁহার সাহিত্যে ভাষা পাইয়াছে, তিনি দেশমাতাকে এমন মূর্ত্তিতে কল্পনা করিতে চাহিয়াছেন যেখানে তিনি শুধু হিন্দুর দেবী হইবেন না অথবা শুধু উচ্চ শিক্ষিতের স্বপ্নবিলাসের সামগ্রী হইবেন না; যে মাতাকে তিনি বন্দনা করিয়াছেন তিনি সার্ব্বজনীন, তিনি সকলের আরাধনার সামগ্রী, সকলের পক্ষে তিনি সুখদা ও বরদা এবং সকলের বাহুবল আহরণ করিয়াই তাঁহার বল সঞ্চিত হইবে। মাতার এই সার্ব্বজনীন মূর্ত্তি আঁকিতে পারিয়াছেন বলিয়াই তিনি আধুনিক স্বাদেশিকতার ঋষি; মাতাকে যে আমরা সমবেতকণ্ঠে, সম্মিলিতশক্তিতে বন্দনা করিতে শিখিয়াছি, শুধু তাহার ভাষা নহে, তাহার প্রেরণাও আসিয়াছে তাঁহার নিকট হইতে।" (ডঃ সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত—বঙ্কিমচন্দ্র—তৃতীয় সংস্করণ, ২২-২৩ পৃঃ। এম, সি, সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিঃ)

বঙ্কিমচন্দ্র দেশের সত্যিকার মঙ্গল চেয়েছেন। তাই রাজনৈতিক আন্দোলনকারীদের মত ক্ষণিক উত্তেজনা বা বিদ্রোহ সমর্থন করেননি, নিজে অনেক বিরুদ্ধ সমালোচনার পাত্র হয়েও ধীরে ধীরে জাতির প্রস্তুতি ও সংগঠন

চেয়েছিলেন। স্বদেশপ্রেমকে গভীরভাবে উপলব্ধির জন্য মানুষ গড়তে ইচ্ছে করেছিলেন। তাঁর দূরদর্শিতা তখনকার কালের অনেকেই বোঝেননি, চাকরী বাঁচিয়েছেন মনে করেছেন; কিন্তু তিনি যে জাগরণের মন্ত্র দিয়েছিলেন তা নিষ্ফল হয়নি। 'আনন্দমঠ' প্রকাশের তিন বছর পর ও 'দেবী চৌধুরাণী' প্রকাশের এক বছর পর আমাদের জাতীয় কংগ্রেস স্থাপিত হয় (১৮৮৫)। যদিও দুজন বিদেশীর সহায়তায়— মহামতি হিউম ও লর্ড ডাফরিন্ এই প্রতিষ্ঠান সৃষ্টিতে সাহায্য করেছিলেন—তবুও এটা যে দেশের লোকের জাতীয়তাবোধ ও আত্মসচেতনতার পরিচয় বহন করেছে এ সম্বন্ধে সন্দেহ নাই।

॥ বঙ্কিমচন্দ্রের 'ত্রয়ী' রচনার পরিবেশ ॥

"বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য-সাধনার যে মুদ্রিত ইতিহাস পাওয়া যায়, তাহা হইতে দেখা যায় যে তিনি ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দের ২৫শে ফেব্রুয়ারি তারিখে (বয়স ১৩ বৎসর ৮ মাস) লিখিতে সুরু করিয়া ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে (৫৫ বৎসর ৯ মাস) মৃত্যুর ঠিক একমাস পূর্ব্বে লেখার কাজে বিরত হন, অর্থাৎ বঙ্কিমচন্দ্র পুরা ৪২ বৎসর বাণীর সেবা করিয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য জীবন তাঁর ছাত্রজীবন হইতে আরম্ভ হইয়া সমগ্র কর্মজীবন অধিকার করিয়া শেষ জীবনের শেষ পর্যন্ত বিস্তৃত।" (সাহিত্য সাধক চরিতমালা-২২০— বঙ্কিম চট্টোপাধ্যায়—৩২ পৃঃ, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ।)

১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্কিমচন্দ্রের 'দুর্গেশনন্দিনী' প্রকাশিত হয়। তার আগে বাংলা সাহিত্যে উল্লেখযোগ্য ভাল উপন্যাস ছিল না।

"আমরা তৎপূর্ব্বে 'বিজয়-বসন্ত', 'কামিনীকুমার' প্রভৃতি কতিপয় সেকেলে কাদম্বরী ধরণের উপন্যাস, গার্হস্থ্য পুস্তক প্রচার সভার প্রকাশিত, 'হংসরূপী রাজপুত্র', 'চকমকির বাক্স', প্রভৃতি কয়েকটি ছোট গল্প এবং আরব্য উপন্যাস প্রভৃতি কয়েকখানি উপকথা গ্রন্থ আগ্রহের সহিত পড়িয়া আসিতেছিলাম। 'আলালের ঘরের দুলাল' তাহার মধ্যে একটু নূতন ভাব আনিয়াছিল। কিন্তু দুর্গেশনন্দিনীতে যাহা দেখিলাম অগ্রে কখনও দেখি নাই। এরূপ অদ্ভুত চিত্রণ শক্তি বাঙ্গলাতে কেহ অগ্রে দেখে নাই। দেখিয়া সকলে চমকিয়া উঠিল। কি বর্ণনার রীতি, কি ভাষার নবীনতা, সকল বিষয়ে বোধ হইল, যেন বঙ্কিমবাবু দেশের লোকের রুচি ও প্রবৃত্তির স্রোত পরিবর্ত্তিত করিবার জন্য প্রতিজ্ঞারূঢ় হইয়া লেখনী ধারণ করিয়াছেন।.......

বঙ্কিমবাবু স্বপ্রণীত গ্রন্থসকলে এক নূতন বাঙ্গালা গদ্য লিখিবার পদ্ধতি অবলম্বন করিলেন। তাহা একদিকে বিদ্যাসাগরী বা অক্ষয়ী ভাষা ও অপর-দিকে আলালী ভাষার মধ্যগা।" (রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ-সমাজ, শ্রীশিবনাথ শাস্ত্রী এম, এ, তৃতীয় সংস্করণ, ২৮৪ পৃঃ। এস, কে লাহিড়ী এণ্ড কোং।)

বঙ্কিমচন্দ্রের রচনাকে যদি তিনটি স্তরে ভাগ করা যায় তবে ১ম স্তরের ফসল দুর্গেশনন্দিনী (১৮৬৪) কপালকুণ্ডলা (১৮৬৬) ও মৃনালিনী (১৮৬৯)। ২য় স্তরের প্রথম উপন্যাস বিষবৃক্ষ (১৮৭৩)। ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্কিমচন্দ্রের সম্পাদনায় বঙ্গদর্শন পত্রিকা প্রকাশিত হয়। ইন্দিরা উপন্যাস ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে বার হয়। যুগলাঙ্গুরীয় ১৮৭৪, লোকরহস্য ১৮৭৪, বিজ্ঞানরহস্য ১৮৭৫, চন্দ্রশেখর উপন্যাস ১৮৭৫ ও কমলাকান্তর দপ্তর ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। বিবিধ সমালোচনা ১৮৭৬, রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহাদুরের জীবনী ১৮৭৭ রজনী উপন্যাস ১৮৭৭, উপকথা ১৮৭৭, কবিতা পুস্তক ১৮৭৮, কৃষ্ণকান্তের উইল ১৮৭৮, প্রবন্ধ পুস্তক—১৮৮৯, রাজসিংহ, ক্ষুদ্র কথা—১৮৮২। দ্বিতীয় স্তরের শেষ উপন্যাস রাজসিংহ। তৃতীয় স্তরে তিনখানি উপন্যাস আনন্দমঠ ১৮৮২, দেবী চৌধুরাণী ১৮৮৪ ও সীতারাম ১৮৮৭। এছাড়া এই সময়ে লেখেন মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত ১৮৮৪, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপন্যাস ১৮৮৬, রাধারাণী ১৮৮৬, ধর্ম্মতত্ত্ব প্রথমভাগ, অনুশীলন ১৮৮৮, বিবিধ প্রবন্ধ দ্বিতীয় ভাগ ১৮৯২ ও সহজ ইংরাজী শিক্ষা, শ্রীমদ্ভাগবদগীতা ইত্যাদি।

বঙ্কিমচন্দ্রের তৃতীয় পর্বের উপন্যাসের সম্পর্কে সমালোচকদের আলোচনার শেষ নেই। প্রথম পর্বের রোমান্টিক উপন্যাসে সমস্যার চেয়ে নিছক সৌন্দর্যই প্রাধান্য পেয়েছে। দ্বিতীয় পর্বে সামাজিক সমস্যা ও সৌন্দর্যবোধ থেকে লেখকের মনের পরিণত চিন্তা ও শিল্প প্রতিভার পরিচয় মেলে। তৃতীয় পর্বে কিন্তু দেশের রাষ্ট্রীয় পরিস্থিতি, সামাজিক ও ধর্মীয় পরিবেশ সম্বন্ধে চিন্তাকুল লেখক তাঁর বক্তব্যকে সৌন্দর্যের চেয়ে একটু বেশী প্রাধান্য দিয়েছেন। তাঁর লেখনী ধারণ অনেকখানি উদ্দেশ্য প্রণোদিত। অতএব 'ত্রয়ী' রচনার কাল সম্পর্কে আলোচনার প্রয়োজন আছে। এই বই তিনখানি ১৮৮২ থেকে ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে রচিত। সেইজন্য ১৮৮২ থেকে ১৮৮৭ পর্যন্ত আমাদের আলোচনার কাল।

আমরা পুর্ববর্ত্তী অধ্যায়ে আলোচনা করে দেখেছি দেশের মধ্যে একটা বিরাট পবিবর্ত্তনের ঢেউ এসেছিল। প্রথম যুগের ইংরাজীনবীশরা হিন্দুধর্মে আস্থাহীন। রামমোহনের নতুন উপাসনা পদ্ধতির প্রবর্ত্তনে দেশের মধ্যে প্রবল আলোড়ন দেখা দেয়। রামমোহন রায়ের বিদেশ গমন ও দেহ ত্যাগের ফলে নিরাকার একেশ্বরবাদ উপাসনার প্রচার সাময়িক ভাবে বন্ধ হয়ে যায়। ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে আবার দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের চেষ্টায় ব্রাহ্মসমাজের পুনরুত্থান। ১৮৬১তে

কেশবচন্দ্র সেন ব্রাহ্ম উপাসনায় যোগ দিলে দেশের যুবক সম্প্রদায় তাঁর দ্বারা অত্যন্ত প্রভাবিত হন। আর সেই সঙ্গে ব্রাহ্ম সমাজের চরম উন্নতি হয়। ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ব্যবস্থাপনার সমাজ থেকে কেশবচন্দ্র সেন সরে গিয়ে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করেন। ১৮৬৬-১৮৭০ উন্নতিশীল ব্রাহ্মদের উন্নতিকাল। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর হিন্দুধর্মের লোক বলেই নিজেকে মনে করতেন। তবে হিন্দুবিবাহের সাকারোপাসনা ও হোম বাদ দেওয়া হত। ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে নানা জাতীয় লোকের মধ্যে বিবাহ হতে আরম্ভ করায় দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পদ্ধতির পরিবর্ত্তন করে ১৮৬৬ থেকে নতুন ব্রাহ্মদল নতুন বিবাহ পদ্ধতির প্রবর্ত্তন করেন। কয়েক বছব পরে ব্রাহ্মদের বিয়ের জন্য কেশবচন্দ্র সেন আইন করার চেষ্টা কবেন। তাতে সারা দেশে একটা আলোডনের সৃষ্টি হয়। ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি এই আইনটিকে নামহীন রেখেই বিধিবদ্ধ করতে চান। ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে তিন আইন নামে আইনটি বিধিবদ্ধ হয়। ১৪ বৎসর মেয়েদের নিম্নতম বিবাহেব বয়সের সীমা নির্দ্দিষ্ট হয়। আদি ব্রাহ্মসমাজ ও হিন্দু সমাজ এই আইনের বিরুদ্ধে বিরক্তি প্রকাশ করেন।

"১৮৭১ সালে ১৩নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট ভবনে তদানীন্তন ট্রেনিং একাডেমির গৃহে উহা প্রদত্ত হইযছিল। নবগোপাল মিত্রের জাতীয় সভা ঐ বক্তৃতা দেওয়াইবার বিষয়ে প্রধান উদ্যোগী ছিল, এবং ভক্তিভাজন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে ব্রাহ্মবিবাহ আইনের আন্দোলন উপস্থিত হওয়াতে, এবং কেশববাবুর দলস্থ ব্রাহ্মগণ তদুপলক্ষে তাঁহারা নিজে হিন্দুধর্ম্ম বিশ্বাসী নহেন বলিয়া পরিচয় দেওয়াতে, আদি সমাজের সহিত তাঁহাদের বিবাদ উপস্থিত হয়। রাজনারায়ণর্ণ বাবুর বক্তৃতা সেই বিবাদের প্রতিধ্বনি মাত্র। কিন্তু ঐ বক্তৃতা এত চিন্তাপূর্ণ, সুযুক্তিসঙ্গত ও জাতীয়ভাবপূর্ণ হইয়াছিল যে বক্তৃতা হইবামাত্র চারিদিকে ধন্য ধন্য রব উঠিয়া গেল।" (রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ—শ্রীশিবনাথ শাস্ত্রী এম, এ, তৃতীয় সংস্করণ—৩২২ পৃঃ। এস কে. লাহিড়ী এণ্ড কোং।)

দয়ানন্দ সরস্বতী কেশবচন্দ্রের জীবিতকালেই ব্রাহ্মসমাজের বিরুদ্ধে একটি বিশুদ্ধ ভারতীয় সমাজ গড়ে তোলেন। এই আর্যসমাজও বর্ণবিভেদ অস্বীকার করে, স্ত্রীপুরুষের সমান অধিকার প্রচার করে।

এই সময়ে রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবও ক্রমে ক্রমে প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

"১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ের কাহিনীর সূত্রটি গ্রহণ করিতেছি। ঐ

সময়ে তিনি তাঁহার ধর্ম সংক্রান্ত অভিজ্ঞতার মণ্ডলটি সম্পূর্ণ করিয়াছেন এবং তাঁহার নিজের কথায়, আহরণ করিয়াছেন জ্ঞানবৃক্ষের তিনটি ফল—করুণা, ভক্তি, ত্যাগ।

ঐ সময় বাংলার বিখ্যাত ব্যক্তিদের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ ঘটায় তাঁহাদের জ্ঞানের স্বল্পতা এবং ভারতীয় আত্মার কী বিরাট বুভুক্ষু শূন্যতা তাঁহার নিজের সম্মুখে রহিয়াছে তাহার সম্পর্কে তিনি সচেতন হইলেন।" (রামকৃষ্ণ জীবন. রোমাঁ রোঁলা, অনুবাদ—ঋষি দাস। ১০ পৃঃ, তৃতীয় সংস্করণ, ওরিয়েণ্ট বুক কোং।)

১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে কুচবিহারের নাবালক রাজার সঙ্গে কেশবচন্দ্র সেনের মেয়ের বিয়ে হয়। এতে ব্রাহ্মদলের মধ্যে আন্দোলন হয়। আর একবার বিচ্ছেদ আসে। নতুন দলের নাম হয় 'সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ'। কেশবচন্দ্র নিজের দলের নাম রাখেন 'নববিধান'। ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে কেশবচন্দ্র সেনের মৃত্যু হয়। বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে কেশবচন্দ্র সেনের সৌহার্দ ছিল।

১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে শশধর তর্কচূড়ামণি হিন্দুধর্মাচরণের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিতে থাকেন। বঙ্কিমচন্দ্র একদিন এই বক্তৃতা শুনে আর শুনতে যাননি। তাঁর এরকম ধর্ম ব্যাখ্যা ভাল লাগেনি।

"সমাজ মানসে যে বিভ্রান্তি দেখা দিয়াছে তাহা বিদূরণের জন্য এবং ইহাকে একটা স্থিতিশীল ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার সমন্বয়ের আদর্শ লইয়া অগ্রসর হন। ১৮৮০—৮১ সাল হইতে তিনি ধর্মতত্ত্ব ও হিন্দু-ধর্মের বৈশিষ্ট্য লইয়া গভীরভাবে আলোচনা করিতে আরম্ভ করেন, যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষের সহিত তাঁহার এই সময় পজিটিভিসম্ সম্পর্কে আলোচনা হইত, এবং তাহার সমন্বয়ের পরিপ্রেক্ষিতে যে হিন্দুধর্ম গ্রাহ্য তাহার স্বরূপ বিশ্লেষণ করিয়া তিনি ঘোষ মহাশয়কে কয়েকটি পত্র লেখেন। ১৮৮২ সালের নভেম্বর জেনারেল এসেম্ব্লিজ ইনষ্টিটিউশনের অধ্যক্ষ হেষ্টিসাহেবের সহিত হিন্দুধর্মের মূল তত্ত্ব লইয়া তাঁহার বাদানুবাদ হয়। সে সময়কার ষ্টেটস্‌ম্যান পত্রিকায় প্রকাশিত এই সব পত্রে বঙ্কিমচন্দ্রের সমন্বয় ও সংস্কারধর্মী মনোভাবই অভিব্যক্ত হইয়াছে। ইহারও দুই বৎসর পরে হিন্দুধর্ম সম্পর্কে ব্রাহ্মসমাজের সহিত তাঁহার বিতর্ক হয়। এই সময়ে প্রকাশিত তাঁহার প্রবন্ধ ও উপন্যাসের মাধ্যমে তিনি তাঁহার পাশ্চাত্য যুক্তিবাদের সহিত সংশোধিত আকারে সমন্বিত হিন্দুধর্মকে প্রতিষ্ঠিত করিতে প্রবৃত্ত হন।" (বঙ্কিম-মানস, অরবিন্দ

পোদ্দার, ১ম সংস্করণ—ইণ্ডিয়ানা লিমিটেড।)

সংক্ষেপে 'আনন্দমঠ', 'দেবীচৌধুরাণী' ও 'সীতারাম' সৃষ্টির আগের ও সমসাময়িক কালের সামাজিক পটভূমি আলোচনা করা গেল। এবার লেখকের ব্যক্তিগত জীবনের কথা আসে।

বঙ্কিমচন্দ্রের পিতা যাদবচন্দ্রের ও ভ্রাতা সঞ্জীবচন্দ্রের তত্ত্বধান ও পরিদর্শনে এবং তাঁর নিজের সম্পাদনায় বঙ্গদর্শন প্রকাশিত হত। 'রজনী' ও 'রাধারাণী' শেষ করে 'কৃষ্ণকান্তের উইল' খানিকটা ছাপার পর ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দের মার্চের শেষে বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গদর্শন বন্ধ করে দেন। বঙ্কিমচন্দ্রের ভ্রাতাদের সঙ্গে সেই সময়ে অসদ্ভাবের কথা শোনা যায়। তবে বঙ্গদর্শন বন্ধ করার কারণ সেটা নাও হতে পারে।

১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে 'বিবিধ সমালোচনা' নামে কয়েকটি সমালোচনা একত্রে প্রকাশিত হয়। এই সমালোচনাগুলি আগে বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হয়। এই সময়েই তিনি The Bane of life নাম দিয়ে বিষবৃক্ষের অনুবাদ করেন। বোধহয় লেডী এলিয়টকে এই অনুবাদই উপহার দিয়েছিলেন।

নবীনচন্দ্র সেনের সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রেব হৃদ্যতা ছিল। তাঁর সঙ্গে পুনরায় বঙ্গদর্শন প্রকাশের কথা হয়। বঙ্কিমচন্দ্র লেখাপড়া করে বঙ্গদর্শন সঞ্জীবচন্দ্রকে দেন।

:৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দের বঙ্গদর্শনে অসমাপ্ত 'কৃষ্ণকান্তের উইল' সমাপ্ত হয়।

১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্কিমচন্দ্রের বন্ধু সাহিত্যিক দীনবন্ধু মিত্রের মৃত্যু হয়। ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্কিমচন্দ্রের লেখা জীবনীসহ দীনবন্ধু মিত্রের গ্রন্থাবলী প্রকাশিত হয়।

ভ্রাতৃবিরোধ ক্রমশঃ বেড়ে ওঠায় বঙ্কিমচন্দ্র ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম দিকে কাঁটালপাড়ার বাস উঠিয়ে চুঁচুড়ায় একটি বাড়ীভাড়া করে থাকেন। এই সময় —রজনী (১৮৭৭), উপকথা ('ইন্দিরা,' 'যুগলাঙ্গুরীয়', ও 'রাধারাণী' একত্রে—১৮৭৭), কবিতাপুস্তক (১৮৭৮), 'কৃষ্ণকান্তের উইল' (১৮৭৮), প্রবন্ধপুস্তক (১৮৭৯), সাম্য (১৮৭৯) প্রকাশিত হয়।

"চুচুড়ায় বঙ্কিমচন্দ্রের জোড়াঘাটের বাড়ীতে কলিকাতা হইতে হেমবাবু, যোগেন্দ্রবাবু প্রভৃতি অনেকে যাতায়াত করিতেন, ভূদেববাবুর সহিত এই সময়ে তাঁহার খুবই দেখা-শোনা হইত। অধ্যাপক গোপালচন্দ্র গুপ্ত, পণ্ডিত রামগতি স্তায়রত্ন ও বঙ্কিমচন্দ্র প্রভৃতি ভূদেবের গৃহে সমবেত হইয়া সাহিত্য চর্চা করিতেন।

১৮৮০ সালের ১৫ই জুলাই তারিখে চুঁচুড়া হইতে বঙ্কিমচন্দ্র নবীনচন্দ্র সেনকে যে পত্র লেখেন, তাহা হইতে জানা যায়, তিনি তৎকালে 'ভারতবর্ষের ইতিহাস' ও 'আনন্দমঠ' উপন্যাস রচনা করিতেছিলেন।" (সাহিত্য সাধক চরিতমালা-২২০-বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—১৬ পৃঃ, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ।)

১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ডিভিসন্যাল কমিশনারের পার্সন্যাল আসিস্ট্যান্টরূপে হাওড়ায় বদলি হন। এই সময় তাঁর পিতৃবিয়োগ হয় এবং একটি বিচারের রায় নিয়ে ম্যাজিস্ট্রেট বাক্‌ল্যাণ্ডের সঙ্গে তাঁর বিরোধ হয়।

১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বরে বেঙ্গল গভর্ণমেণ্টের অস্থায়ী সেক্রেটারী হিসাবে কলকাতায় আসেন। ১৮৮২ ২৬শে জানুয়ারী তিনি ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর হিসাবে অস্থায়ীভাবে আলিপুরে বদলি হন। মাঝে মে মাসে কিছুদিন বারাসতে ছিলেন। ১৮৮২ র ১৭ই মে থেকে ৭ই আগষ্ট পর্যন্ত আবার আলিপুরে থেকে ৮ই আগষ্ট জাজপুর (কটকে) বদলি হন।

এই সময়ে রাজসিংহ (১৮৮২) পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়।

"১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে জেনারেল অ্যাসেম্ব্লিজ ইনষ্টিটিউশনের অধ্যক্ষ পাদরি হেষ্টির সহিত হিন্দুধর্মের মূলতত্ত্ব লইয়া 'ষ্টেটস্‌ম্যান' পত্রিকায় তাঁহার বাদানুবাদ হয়।

১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে 'আনন্দমঠ' পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়।" (সাহিত্য সাধক চরিতমালা-২২০, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ৯৭-৯৮ পৃঃ। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ।)

১৮৮৩ খ্রীঃ ১৪ই ফেব্রুয়ারী হাওড়ায় বদলি হন। এখানে ম্যাজিস্ট্রেট ওয়েষ্টমেকট্ সাহেবের সঙ্গে বিবাদ বাধে। সৌভাগ্যক্রমে সাহেব বদলি হয়ে যান। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের জুন পর্য্যন্ত বঙ্কিমচন্দ্র হাওড়ায় ছিলেন। 'মুচিরামগুড়ের জীবনচরিত' (২৮শে ফেব্রুয়ারী ১৮৮৪) ও 'দেবীচৌধুরাণী' (২০শে মে ১৮৮৪) পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়।

'দেবীচৌধুরাণী' বঙ্গদর্শনে শেষ হবার আগেই বন্ধ হয়ে যায়। সঞ্জীবচন্দ্রের সম্পাদনায় নিয়মিত বঙ্গদর্শন বার হ'ত না। তারপর আবার চন্দ্রনাথ বসুর উৎসাহে শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের সম্পাদনায় বউবাজার ষ্ট্রীটে বরাট প্রেসের অঘোরনাথ বরাটের দ্বারা প্রকাশিত হয়। ১৮৮৩ র অক্টোবরে ১২৯০ কার্ত্তিকে আবার প্রকাশিত হয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের আদেশে মাঘ মাসে একেবারে বন্ধ হয়ে যায়।

১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে বঙ্কিমচন্দ্রের জামাতা রাখালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে সামনে রেখে বঙ্কিমচন্দ্র 'প্রচার' নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। এর ১৫ দিন আগে অক্ষয়চন্দ্র সরকারের সম্পাদনায় 'নবজীবন' পত্রিকার প্রকাশ আরম্ভ হয়।

" 'প্রচারে' বঙ্কিমচন্দ্রের শেষ উপন্যাস 'সীতারাম' প্রকাশিত হইতে থাকে, 'ধর্মতত্ত্ব'—অনুশীলনের প্রবন্ধগুলি 'নবজীবনে' বাহির হয়। এই দুই পত্রিকার সাহায্যে বঙ্কিমচন্দ্র ধর্ম,সমাজ ও সাহিত্য সম্বন্ধে তাঁহাব পরিণত বয়সের মতামত প্রচার করিতে থাকেন। 'প্রচার' ও 'নবজীবনে'র প্রথম বৎসরেই বঙ্কিমচন্দ্রের সহিত তত্ত্ববোধিনী সভার যে বিতর্ক উপস্থিত হয়, তাহাতে সে সময় সাহিত্য-সমাজে বিশেষ আলোড়ন হইয়াছিল। এই তর্কের ফলে বঙ্কিমের মতামতগুলি আরও স্পষ্ট হইয়া উঠে। তত্ত্ববোধিনীব আড়ালে থাকিয়া যাঁহারা বঙ্কিমচন্দ্রের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজনারায়ণ বসু, কৈলাশ চন্দ্র সিংহ ও রবীন্দ্রনাথের নাম উল্লেখযোগ্য। চন্দ্রনাথ বসু এই যুদ্ধে বঙ্কিমচন্দ্রেব পক্ষে ছিলেন।" (সাহিত্য সাধক চরিতমালা-২২০, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়-৯৯ পৃঃ, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ।)

১৮৮৫ খ্রীঃ ১লা জুলাই থেকে ১৮৮৮ র ১৬ই এপ্রিল আলিপুরের ভারপ্রাপ্ত ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট হওয়া পর্যন্ত তিন বৎসর কাল বঙ্কিমচন্দ্র ঝিনিদহ (যশোহর), ভদ্রক (কটক), হাওড়া ও মেদিনীপুব ঘোরেন। এই ৩২ মাসের মধ্যে ১৩ মাস তিনি অসুস্থ হয়ে ছুটিতে ছিলেন। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্কিমচন্দ্র কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেটের সভ্য হন।

এই সময়ে 'প্রচাবে' কৃষ্ণচরিত্র' ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ হতে থাকে। পরে ১৮৮৬ খ্রীঃ ১২ই আগষ্ট বই হয়ে বার হয়। ঈশ্বরগুপ্তের কবিতা সংগ্রহ ১ম ভাগ, তাঁর লেখা জীবনচরিত ও কবিতা বিষয়ক প্রবন্ধ সম্বলিত হয়ে প্রকাশিত হয়।

১৮৮৫ খ্রীঃ সেপ্টেম্বর মাসে 'কমলাকান্তের দপ্তরের' দ্বিতীয় পরিবর্ত্তিত সংস্করণ 'কমলাকান্ত' নামে প্রকাশিত হয়। ১৮৮৭ খ্রীঃ 'সীতারাম' ও 'বিবিধ প্রবন্ধ, প্রথমভাগ' পুস্তকাকারে বার হয়।

'আনন্দমঠ', 'দেবীচৌধুরাণী' ও 'সীতারাম' রচনাকালের এই হল বঙ্কিম-মানস ও পরিবেশের সংক্ষেপ আলোচনা। 'ত্রয়ী' সৃষ্টিতে পরিবেশের প্রভাব যে গুরুত্বপূর্ণ একথা অনস্বীকার্য।

॥ ৭ ॥

॥ বঙ্কিমের "ত্রয়ী"র বিশ্লেষণ ॥

ক

—আনন্দমঠ—

মহৎ লেখক মাত্রেরই একটা আদর্শ থাকে। বঙ্কিমচন্দ্র যখন 'আনন্দমঠ' লেখেন তাঁর মনেও একটা আদর্শ ছিল। তিনি তাঁর মনের সুচিন্তিত অভিমত এই উপন্যাসের মধ্যে দিতে চেয়েছেন। এখন দেখতে হবে তাঁর এই আদর্শবাদ এখানে কতখানি সার্থকভাবে ফুটেছে আর উপন্যাসের সাহিত্যরস তাতে বজায় আছে কিনা।

সাধারণতঃ দেখা যায় অল্প বয়সে গল্প বলার ঝোঁকটা বেশী থাকে। তত্ত্ব বা আদর্শ প্রচ্ছন্নভাবে থাকলেও সেটার প্রকাশ স্পষ্ট বা পরিণত নয়। কিন্তু বয়সের সঙ্গে সঙ্গে লেখায় চিন্তা স্পষ্ট ও সুসংবদ্ধভাবে প্রকাশ পায়। বঙ্কিমচন্দ্রের লেখায়ও আমরা এরকম একটা ভাব লক্ষ্য করি।

প্রথম জীবনের 'দুর্গেশনন্দিনী', 'কপালকুণ্ডলা' ও 'মৃণালিনী' রচনার মধ্যে সৌন্দর্য সৃষ্টি ভিন্ন অন্য উদ্দেশ্য পাওয়া যায় না। 'মৃণালিনী' রচনা থেকে তাঁর মধ্যে দেশপ্রেমের আকাঙ্ক্ষা লক্ষ্য করা যায়। 'রাজসিংহ' লিখে তাঁর এই আকাঙ্ক্ষা যতদিন না তৃপ্ত হয় ততদিন এই আকাঙ্ক্ষার আভাস 'মৃণালিনীর' পরবর্ত্তী সমস্ত উপন্যাসেই পাওয়া যায়।

অধ্যাপক প্রমথনাথ বিশী বলেন বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর প্রবন্ধের মধ্যে যে সব যুক্তি নিয়ে আলোচনা করেছেন, উপন্যাসে তাকে গল্পের মধ্যে দিয়ে সরসভাবে উপস্থিত করেছেন। 'আনন্দমঠ' সম্বন্ধে তিনি তাঁর 'বঙ্কিম সরণী' গ্রন্থে বলেছেন—"আনন্দমঠে লেখকের ঝোঁকটা কিছু প্রবল সমাজ ও রাজনীতির উপরে ;" (বঙ্কিম সরণী—প্রমথনাথ বিশী-দেশ-৩৪বর্ষ, সংখ্যা ৩, ৩রা অগ্রহায়ণ —২৬১ পৃঃ।)

'অনন্দমঠ' রচনার মধ্যে তাঁর একটা উদ্দেশ্য বিশেষভাবে প্রকাশিত হয়েছে। আমাদের দেশে পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রথম এসে একটা তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। তাতে স্বদেশের সমস্ত শিক্ষা-দীক্ষা আচার আচরণের প্রতি বিতৃষ্ণা এবং পাশ্চাত্যের সমস্ত কিছুর প্রতিই একটা প্রবল আকর্ষণ লক্ষ্য করা যায়। পশ্চিম আমাদের নতুন শিক্ষার আলো দেখিয়েছে ঠিকই তবুও নিজের

দেশের সমস্ত কিছুকে অবজ্ঞা করা সুস্থ চিন্তার লক্ষণ নয়। বঙ্কিমচন্দ্রও তখনকার কালের রীতি অনুযায়ী প্রথমে ইংরাজী ভাষায় সাহিত্য সৃষ্টি করেন। কিন্তু তিনি একবারই এই ভুল করেছেন। তারপরই মাতৃভাষার দৈন্য ঘুঁচিয়ে তাকে ঐশ্বর্য্যমণ্ডিত করে তুলতে আত্মনিয়োগ করেন। আত্মসম্পদ সম্বন্ধে উদাসীন জাতিকে তিনি দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করে ও সচেতন করে তুলতে চেয়েছেন। আমাদের ভারতীয় সাহিত্যে অন্যান্য অনেক সম্পদ থাকলেও— জাতীয়তার কথা, দেশপ্রেমের কথা ছিল না। ইংরেজের কাছে আমরা স্বাজাত্যবোধ শিক্ষা করেছি। আত্মবিস্মৃতির পরের ঘটনাই আত্মসচেতনতা। তাই দেখা যায় বঙ্কিমচন্দ্র পরদেশের গুণাবলিতে আকৃষ্ট হয়ে, তাদের মনযোগ দিয়ে লক্ষ্য করেছেন। নিজের দেশের অপূর্ণতা ও ত্রুটি কোথায় তাও বুঝতে পেরে প্রতিকারের ব্যবস্থা নিয়েছেন। 'আনন্দমঠে' তাঁর মনের এই সঙ্কল্প কাহিনীর মধ্যে দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে।

বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন অনেকখানি বুদ্ধিবাদী লেখক। অর্থাৎ তাঁর লেখায় মন্ময়তার চেয়ে তন্ময়তা বা subjective এর চেয়ে objective এর প্রাধান্য। যে সময়ে তিনি লেখনী ধারণ করেন সে সময়ে দেশের মধ্যে সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয় ও শিক্ষাগত যে সব ত্রুটি ছিল, তিনি মনে করেন তার সংশোধনের জন্য তাঁর চেষ্টা করা দরকার। তাই তিনি প্রথম দুই একটি বইয়ে সহজভাবে গল্প বললেও পরিণত বয়সে নিজের আদর্শকে কাহিনীর মধ্যে রূপায়িত করেছেন। 'আনন্দমঠ' হচ্ছে তাঁর এরকম মনোভাবের ফসল।

"নরনারীর আদিম আকর্ষণ বঙ্কিম উপন্যাসের মূল প্রেরণা।" (বঙ্কিম সরণী-প্রমথনাথ বিশী—দেশ, ৩৪ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা—১৩৭৩ সাল, ৩রা অগ্রহায়ণ —২৬১ পৃঃ।)

'আনন্দমঠ' গ্রন্থে এর ব্যতিক্রম নেই। এখানেও মানবমনের প্রেম নিয়ে আলোচনা আছে। স্বাজাত্যবোধ ও প্রেমভাবে দুই-ই সমভাবে বর্ণিত। একদিকে মহেন্দ্র, কল্যাণী ও জীবানন্দ, শান্তির দাম্পত্য প্রণয়, অন্যদিকে ভবানন্দর অবৈধ আকর্ষণ 'আনন্দমঠে' স্থান পেয়েছে।

মহেন্দ্র দেশ বন্দনা ও সন্তানধর্মের আদর্শের কথা শুনে অত্যন্ত আগ্রহ অনুভব করে। কিন্তু স্ত্রী কন্যা ত্যাগ করে কঠোর ব্রহ্মচর্যের মধ্যে দেশের কাজ করতে হবে শুনে তার সন্তানধর্মের প্রতি আগ্রহ কমে যায়। পরে অনেক চিন্তার পর স্থির করে স্ত্রীকন্যার একটা ব্যবস্থা করে সে দেশের কাজে জীবন

উৎসর্গ করবে। তার স্ত্রী ও কন্যা মৃত জেনে সে সন্তান ধর্ম গ্রহণ করে। অর্থাৎ তার দেশপ্রেম ও গার্হস্থ্য জীবনের মধ্যে দ্বিতীয়টি যে বেশী আকর্ষণীয় একথা বুঝতে অসুবিধা হয় না।

জীবানন্দ নিজে শান্তিকে বিয়ে করেছিল তবুও দেশের ডাকে সুখের দাম্পত্য জীবন ছেড়ে দেশের কাজে এগিয়ে আসে। একবার মুহূর্তের মোহে ব্রতভঙ্গ করবার ইচ্ছা হলেও প্রায়শ্চিত্তের জন্য সে প্রস্তুত ছিল। শান্তি কল্যাণীর মত স্বামীর অদর্শনে ব্যাকুল ছিল না। স্বামার সঙ্গে সাক্ষাতের আগে ও ব্রতভঙ্গ হবার পর স্বামীর সঙ্গে একত্রে কঠোরভাবে সন্তানধর্ম পালন করে গিয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্র দেখাতে চেয়েছেন গার্হস্থ্য ধর্মে অত্যন্ত অনুরাগ থাকলে কোন বড় কাজ হতে চায় না। শান্তি ও জীবানন্দের মত সুশিক্ষিত ত্যাগ-ধর্ম অনুসরণকারী হলে দম্পতির পক্ষে বড় কাজ করা সম্ভব।

'আনন্দমঠ' উপন্যাসখানির একটি ঐতিহাসিক কাহিনী আছে। ইতিহাসে সন্ন্যাস বিদ্রোহের কথা জানা যায়। তবে তারা কোন বৃহৎ আদর্শের জন্য বিদ্রোহ করেনি—করেছিল নিজেদের স্বার্থের জন্য। ডঃ যদুনাথ সরকারের লেখার উল্লেখ করে ডঃ অরবিন্দ পোদ্দার তাঁর 'বঙ্কিম-মানস' গ্রন্থে বলেন, ঐ সন্ন্যাসী সম্প্রদায় কাশী, ভোজপুর, এলাহাবাদ জেলার লোক, বেশীরভাগ নিরক্ষর ও শৈব। তারা আসলে লুঠেরা ছিল। মাতৃভূমির উদ্ধার, দেশপ্রেম, দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন সেই সন্ন্যাসীদের স্বপ্নেরও অগোচর ছিল। বঙ্কিমচন্দ্র নিজ প্রতিভাবলে এই ঘটনাটুকুকে অবলম্বন করে অপরূপ রমণীয় কাহিনীর মধ্য দিয়ে 'আনন্দমঠে' উচ্চ আদর্শ তুলে ধরেছেন। তাঁর মনে ভারতীয় সনাতন ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাপূর্ণ আগ্রহ ও সন্ন্যাসী ফকিরদের প্রতি শ্রদ্ধা-ভক্তি আর দেশের তৎকালীন স্বদেশ বিমুখতা এই গ্রন্থ রচনার কারণ। সন্ন্যাসী বিদ্রোহ যা হয়েছিল তা উল্লেখযোগ্য নয়, যা হতে পারতো, যা হলে ভারতীয় সমাজের বীরত্ব প্রকাশ পেত, বঙ্কিম তাই কল্পনা করেছেন। আসল সন্ন্যাসীরা শৈব হলেও বঙ্কিম তাঁর নতুন কৃষ্ণতত্ত্বর প্রচার ও ব্যাখ্যার জন্য সন্তানদের বৈষ্ণব করেছেন। যদিও তখন 'কৃষ্ণচরিত্র' লেখা হয়নি কিন্তু ১২৮১ বঙ্গাব্দের চৈত্রমাসে বঙ্কিমচন্দ্র, অক্ষয়চন্দ্র সরকার সম্পাদিত 'প্রাচীন কাব্য সংগ্রহের' সমালোচনা উপলক্ষে কৃষ্ণচরিত্রের অনুসন্ধান করেন, যার ফলে কৃষ্ণচরিত্রের আদর্শ তাঁর মনে স্থায়ী আসন পায়। 'আনন্দমঠ' রচনার সময় এই আদর্শ প্রচ্ছন্নভাবে কাজ করেছে শিক্ষা ভিন্ন কোন মহৎ কার্যই সম্ভব নয় বলে সন্তান সম্প্রদায়কে সুশিক্ষিত

করেছেন। যে আদর্শ তিনি দিতে চেয়েছিলেন তা সার্থক হয়েছিল বলা যায়, কারণ তিনি দেশের লোককে নিজের ঘরের দিকে ফিরতে যে আহ্বান 'আনন্দমঠে' জানিয়েছিলেন তা সফল হয়েছিল। 'আনন্দমঠ' স্বদেশী আন্দোলনেব প্রাণরস যুগিয়েছে, সন্তানদের মতই একদল ত্যাগী নিষ্কাম যুবক স্বদেশ উদ্ধারকে ব্রতর মত গ্রহণ করেছিলেন। যে স্বদেশপ্রেম ও ত্যাগ তিনি দেশের লোকের কাছে উদ্দেশ্যমূলকভাবে তুলে ধরতে চেয়েছিলেন তা সম্পূর্ণ সার্থক হয়েছে বলা চলে।

উপন্যাস নীতিকথা নয়, তাই আদর্শ থাকলেই তাকে সার্থক উপন্যাস বলে না। উপন্যাসের সার্থকতা প্রয়োজনীয় ছাড়াও অপ্রয়োজনের আনন্দ পাওয়া গেলে। 'আনন্দমঠে' আমবা এই চিবকালের কথাও পাই—মহেন্দ্র ও কল্যাণীর পবিত্র প্রেম, শান্তি ও জীবানন্দর অনির্ব্বচনীয় প্রেম ও ভবানন্দব রূপাকাঙ্ক্ষা। আদর্শই কেবল স্থান পায়নি, চিরকালের মানবমনেব আশা আনন্দ, ব্যথা বেদনার কথাও পাওয়া যায়, তাই 'আনন্দমঠ'কে সাথক উপন্যাস বলতে বাধা নেই।

বঙ্কিমচন্দ্র যে বাংলা সাহিত্যে প্রথম উপন্যাস আনেন তাই নয়, বাংলা সাহিত্যে উপন্যাসেব যতরকম আঙ্গিক প্রচলিত, সব কটিবই পথ প্রদর্শক বঙ্কিমচন্দ্র। আনন্দমঠ' অবশ্য প্রচলিত বিবৃতিমূলক ধারায়ই বচিত।

বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষার সুসংবদ্ধতা, ছন্দ, গাম্ভীর্য, ওজস্বীতা, মাধুর্য ও কাব্যগুণ আছে একথা বলা বাহুল্য। 'আনন্দমঠে' ভাষার এই সমৃদ্ধি সর্বত্রই লক্ষ্য করা যায়। বিশেষ করে প্রাকৃতিক বর্ণনা ও রমণীব রূপ বর্ণনায় লেখকের নৈপুণ্য লক্ষণীয়।

বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভা অনেকখানি বিশ্লেষণী গুণসম্পন্ন তাই চরিত্র সৃষ্টিতে তাঁর অসাধারণ দক্ষতা লক্ষ্য করা যায়। মনে হয় প্রতিটি চরিত্র সৃষ্টির পিছনে সুচিন্তিত পরিকল্পনা আছে। সর্বোপরি তাঁর মনে দেশের সামনে আদর্শ তুলে ধরবার আকাঙ্ক্ষা সর্বদাই ছিল। তাই তাঁব সৃষ্ট চরিত্রে আমবা নানা রকম উল্লেখযোগ্য গুণ দেখতে পাই।

স্বামী সত্যানন্দ, জীবানন্দ, মহেন্দ্র সকলেই আদর্শ পুরুষ। জীবানন্দ ও ভবানন্দর মধ্যে দুর্বলতা দেখিয়ে, আদর্শের পুতুল না কবে মাটির কাছের মানুষ করেছেন। নিজের স্ত্রীর প্রতি জীবানন্দর আকর্ষণ ও ব্রতচ্যুতি তাকে স্বাভাবিক রক্তমাংসের মানুষ করেছে। ভবানন্দর দুর্বলতাও তাকে মানুষের কাছে

এনেছে। নারী চরিত্রের মধ্যে কল্যাণী একেবারে বাঙ্গালী ঘরের আদর্শ বধূ। স্বামী ও কন্যাই তার প্রাণ। তবুও স্বপ্নে পাওয়া আদর্শের জন্য জীবন দিতে তার আপত্তি ছিল না। স্বামীর সৎকাজে সাহায্য করার ইচ্ছা ছিল কিন্তু বিচ্ছেদ সহ্য করতে চায়নি। শান্তিকে লেখক একেবারে মনের মত আদর্শ দিয়ে গড়েছেন। শারীরিক শক্তি, শিক্ষা ও মানসিক পরিণতি দেখে মনে হয় 'দেবীচৌধুরাণী'র আগের প্রস্তুতি পর্ব। বাঙ্গালী ঘরের বধূর মত যেন ঠিক নয়। অধ্যাপক বিশীর মতে এই চরিত্রে ভারতের অন্য প্রদেশের ছায়া পড়েছে। তিনি বলেছেন শান্তি একাধারে বঙ্গবধূ আবার ভারতীয়, তাই তার মধ্যে এরকম শক্তির পরিচয় দিয়েছেন। তৎকালের প্রায় সমস্ত লেখকের লেখায় সেক্সপীয়ারের প্রভাব প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষভাবে পড়তে দেখা যায়। বঙ্কিমচন্দ্র প্রতিভাধর লেখক ছিলেন তাই তাঁর স্বকীয়তা কোন সময়েই ম্লান হয়নি, তবে সামান্য একটু প্রভাব লক্ষ্য করা যায় শান্তির পুরুষবেশ ধারণ ইত্যাদি ছোট ছোট বিষয়ে। গৌরীদেবী চরিত্র দুই একটি আঁচড়েই স্পষ্ট ও হাস্যরসাত্মক। নিমাইমণিও সামান্য সময়ে মাধুর্যে আমাদের মন কেড়ে নেয়। নিপুণ বলিষ্ঠ শিল্পীর গুণ এই যে ছোট ছোট চরিত্রও পরিস্ফুট ও ব্যক্তিত্বে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই উপন্যাসে তা প্রমাণিত হয়েছে।

বঙ্কিমচন্দ্রের নির্মল হাস্যরস এই উপন্যাসের সর্বত্র ছড়িয়ে আছে। এরকম তত্ত্বমূলক উপন্যাসে হাস্যরসের প্রয়োগ বইটির গুরুত্ব না কমিয়ে বরং বাড়িয়ে দিয়েছে, তত্ত্বের বোঝাবিশেষ না হয়ে সহজ ও সাবলীল হয়েছে এর গতি।

ঐতিহাসিক ঘটনার সঙ্গে মিল রেখে কালোপযোগী আবহাওয়া সৃষ্টিও 'আনন্দমঠে'র বিশেষত্ব। ছিয়াত্তর সালে বাংলাদেশের মুসলমান শাসনের জন্য দেশের লোক জর্জরিত। তখনকার লোকের মনে হয়েছিল ইংরেজ শাসন দেশে শান্তি আনবে। বঙ্কিমের সময়ের লোকেও মনে করতে পারেনি, ইংরেজ অকল্যাণ করছে। তখনকার রাজনৈতিক মতই অনেকখানি স্ব-বিরোধী। তাঁরা ইংরেজের শিক্ষা, সংস্কৃতি ও মানবিকতা দেখে মনে করেছিলেন তারা দেশের উন্নতি আনবে। দেশের লোকের মনে জাতীয় তাবোধের দরকার সেকথাও তাঁরা ভেবেছেন, তবে ইংরেজকে একেবারে বিতাড়নের কথা তাঁরা ভাবেননি। আজকের দিনে এ রকম স্বাজাত্যবোধ—আশ্চর্য বোধ হলেও, তখনকার ভাবনা এরকমই ছিল; আর 'আনন্দমঠে'ও আমরা ইংরেজের প্রতি আহ্বানের খবরই

পাচ্ছি। অনেক বঙ্কিমের সরকারী চাকুরীকে দায়ী করেছেন। কিন্তু সেটা বোধ হয় ঠিক নয়। তখনকার স্বদেশী আন্দোলনই সহঅবস্থান নীতির সমর্থক ছিল।

কাহিনী বিন্যাসে বঙ্কিমের পরিকল্পনা লক্ষণীয়। প্রতিটি পরিচ্ছেদ সুসংবদ্ধভাবে গঠিত এবং নানা ঘটনায় পরিপূর্ণ। উপন্যাসের মধ্যে নাটকীয় গুণ লক্ষ্য করা যায়। পরবর্ত্তী ঘটনার বীজ তার আগের পরিচ্ছেদে সুকৌশলে বপন করার রীতি 'আনন্দমঠে'ও পাওয়া যায়।

বঙ্কিমচন্দ্র প্রথম জীবনে বেন্থাম ও মিলের মতবাদে অনেকখানি প্রভাবিত হয়েছিলেন। কিন্তু ক্রমশঃ মহাভারত, গীতা ও কৃষ্ণচরিত্র সম্বন্ধে তাঁর আগ্রহ দেখা যায়। 'আনন্দমঠ', 'দেবীচৌধুরাণী' ও 'সীতারাম', রচনার সময় বঙ্কিম প্রাচীন ভারতীয় আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। 'আনন্দমঠে' তাই অতীতের চরিত্রগঠন, ব্রহ্মচর্য ও বীরত্ব স্থান পেয়েছে। কৃষ্ণচরিত্রের নতুন ব্যাখ্যা দিয়েছেন। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী বলেছেন' আনন্দমঠ' লিখে বঙ্কিম আমাদের ঘরে ফিরতে বলেছেন। আমাদের প্রাচীন ঐতিহ্য, আমাদের দর্শনতত্ত্ব, ধর্ম ও শিক্ষাপদ্ধতি চর্চ্চা করে তিনি এই উপন্যাসের মাধ্যমে প্রকাশ করতে চেয়েছেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের প্রায় সব উপন্যাসেই সন্ন্যাসী আছে। 'আনন্দমঠে' তো সন্ন্যাসী বিদ্রোহের ঘটনাই বিবৃত। সত্যানন্দ ঠাকুরের গুরু, মহাপুরুষের আদেশে নির্দেশে অনেক ঘটনা নিয়ন্ত্রিতও হয়েছে।

'আনন্দমঠ' নামকরণের সার্থকতা আছে। সত্যানন্দর মঠের নাম 'আনন্দমঠ'। এই উপন্যাসখানির মূল আদর্শ, নরনারীর চিরকালের প্রেমকে তুচ্ছ না করে, ক্ষণকালের জন্য হলেও, সে জীবন থেকে সরিয়ে 'আনন্দমঠে' মিলিত করা। অর্থাৎ দেশের দুর্দিনে গার্হস্থ জীবনের সুখের চেয়ে দেশের স্বার্থ বড় করতে হবে। সু-শাসনের ব্যবস্থা হলে জনসাধারণ আবার নিজেদের স্বাভাবিক জীবনযাত্রায় আসতে পারে। 'আনন্দমঠ' যে আনন্দের ভোজে গৃহস্থদের ডেকেছিল তা রোজকার জীবনের উর্দ্ধে। আনন্দ সুখের চেয়ে বড়, আরও উঁচুদরের। এই 'আনন্দমঠে' সেদিনের সন্তানদল যে ত্যাগের মন্ত্র পেয়েছিল, তাতে বোধহয় অপার্থিব আনন্দের সন্ধানই ছিল; তাই সুখভোগ ও জীবন তুচ্ছ হয়ে গিয়েছিল আর সেই জন্যেই এই উপন্যাসের নামকরণ সার্থক হয়েছে বলা যায়।

'আনন্দমঠ' উপন্যাস সম্বন্ধে প্রসিদ্ধ সমালোচক মোহিতলাল মজুমদার বলেছেন –

"আনন্দমঠের কাব্যবস্তু হইয়াছে দেশপ্রেম ; সেই দেশপ্রেমের এমন কবিত্বময় বিগ্রহসৃষ্টি বোধ হয় জগৎ সাহিত্যে বিরল ; অতএব কাব্যের দিক দিয়াও এই উপন্যাস বঙ্কিমচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ উপন্যাসগুলির অন্যতম ; ইহাকে কেবল একটা বিশেষ cult বা ধর্মমন্ত্রের প্রচারমূলক উপন্যাস বলিয়া পৃথক করিলে চলিবে না। এই উপন্যাসে কবিকল্পনা ও ভাবানুভূতির যে প্রগাঢ়তা আছে, তাহা বঙ্কিমচন্দ্রের প্রৌঢ় কবিশক্তির নিদর্শন। কবির প্রাণ ও মন যেন একটা মহাসঙ্গীতের আবেগে আপনাকে সম্পূর্ণ হারাইয়া ফেলিয়াছে—আবেগ বা inspiration এর এমন সঙ্গীতময় ঐক্যতান, প্রাকৃতিক পরিবেশ ও ঘটনার রোমান্স, পাত্রপাত্রীর চরিত্র চিত্রণে বাস্তব ও কল্পনার এমন সুসঙ্গতি এবং সকলের ভিতর দিয়া সেই এক মহাভাবের অনুরণন—একাধারে উপন্যাস ও গীতিকাব্য, নাটক ও কাহিনীর এমন রাসায়নিক রসমিশ্রণ আর কোন কাব্যে হয় নাই—জীবনের বাস্তবকে আরও গভীর করিয়া দেখা ও তাহার সেই রহস্যকে সীমাহীন করিয়া তোলার কথা স্বতন্ত্র। আমি এই উপন্যাস সম্বন্ধে পূর্বে অন্যত্র যাহা বলিয়াছি তাহার কিঞ্চিৎ এখানে উদ্ধৃত করিব—উপন্যাস হিসাবে 'আনন্দমঠ' সম্বন্ধে উহার অধিক বলিবার অবকাশ এখানে নাই।—

সকল বড় কাব্যের লক্ষণই এই যে, তাহাতে জীবনের একটা জটিল ও গভীর অভিজ্ঞতা কোন একটা বিশিষ্ট ভাবকল্পনার ঐক্যসূত্রে সুসম্বদ্ধ আকার ধারণ করে। 'আনন্দমঠে' দেশপ্রেমের কল্পনাসূত্রে কবি-বঙ্কিম তাঁহার আজীবন সঞ্চিত গভীর ও জটিল অভিজ্ঞতাকে একটি রসরূপ দান করিয়াছেন। দেশপ্রেমকেই পুরুষের একটা মহৎ ধর্মরূপে স্থাপন করিয়া, তিনি সেই এক সমস্যাকে—বাস্তব ও আদর্শের বিরোধকে—দেহ আত্মার দ্বন্দ্বকে—আরও সবল ও স্বচ্ছ দৃষ্টিতে দেখিয়া লইতে চাহিয়াছেন, যেন দেশপ্রেমের তাড়িত শক্তি উৎপাদন করিয়া তাহার রাসায়নিক ক্রিয়ার সাহায্যে মানুষের দেহ-মন-প্রাণকে তরঙ্গিত ও মথিত করিয়া, তিনি মনুষ্যত্বের মূল উপাদানগুলি পরীক্ষা করিয়াছেন। দেশপ্রেমরূপ একটা ভাবাবেগমূলক ধর্মের সংঘাতে মানুষের সামাজিক, নৈতিক, আধ্যাত্মিক যত কিছু সংস্কারকে বিধ্বস্ত, উৎক্ষিপ্ত করিয়া তিনি তাঁহার শক্তি ও অশক্তির সীমা নিরীক্ষণ করিয়াছেন। এই ক্ষুদ্র কাব্যখানির ঘনীভূত একাগ্র কল্পনায়—যৌন প্রবৃত্তি বা রূপমোহ, দাম্পত্যপ্রেম,

সামাজিক ও পারিবারিক সংস্কার, সংসার ত্যাগ বা সন্ন্যাসের আদর্শ, যুগধর্ম ও সনাতন শাশ্বত পন্থা এসকলই একটি ভাবসত্যের আশ্রয়ে সুসাহিত্য হইতে পারিয়াছে। এই গ্রন্থের আদি হইতে শেষ পর্য্যন্ত যে একটি নৈশ-গম্ভীর অরণ্যচ্ছায়া পরিব্যাপ্ত হইয়া আছে, তাহাতে যে একটি atmosphere বা মনোভূমির সৃষ্টি হইয়াছে, এবং সেজন্য চরিত্র ও ঘটনাগুলির মধ্যে যে ভাবগত সামঞ্জস্য ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহাও শ্রেষ্ঠ কবিশক্তির নিদর্শন। এই জন্য 'আনন্দমঠ' কেবল দেশপ্রেমের উদ্দেশ্যমূলক একখানি দ্বিতীয়শ্রেণীর কাব্য নয়, উহা বঙ্কিমচন্দ্রের পরিণত লেখনীর একখানি উৎকৃষ্ট রসরচনা। "(শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় স্মৃতি-কথা—বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস—মোহিতলাল মজুমদার—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৫৫) ১৭০ পৃঃ।"

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় যে বঙ্কিমচন্দ্র নিজে 'আনন্দমঠ' সম্বন্ধে খুব উচ্চ মনোভাব প্রকাশ করেননি। তিনি কেবল শিল্পী ছিলেন না, সেই সঙ্গে সমালোচকও ছিলেন, তাই তাঁর মতের মূল্য আরও বেশী।

"কৌতূহল পরবশ হইয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম যে তাঁহার কোন উপন্যাস সর্বোৎকৃষ্ট? তিনি বলিয়াছিলেন কৃষ্ণকান্তের উইল, বিষবৃক্ষ এবং নতুন সংস্করণ রাজসিংহ। 'আনন্দমঠের' উল্লেখ না শুনিয়া আমি বিস্মিত হইয়াছিলাম।......

আমি তাঁহাকে নিবেদন করিয়াছিলাম যে, as a patriotic work 'আনন্দমঠ' অতুলনীয়। তিনি বলিলেন, "ও sense এ খুব ভাল বটে, কিন্তু উহাতে art কম।" (বন্দেমাতরম্—শ্রীললিতচন্দ্র মিত্র—বঙ্কিম-প্রসঙ্গ—সুরেশচন্দ্র সমাজপতি সঙ্কলিত—২৮৯ পৃঃ, মুখার্জি বোস কোং।)

"দেবীচৌধুরাণী"

খ

'দেবীচৌধুরাণী' উপন্যাসের বিশ্লেষণ করতে গিয়ে আমরা তার তত্ত্ব নিয়ে এত ব্যস্ত হই যে উপন্যাসটির গল্পরস সম্বন্ধে উদাসীন হয়ে পড়ি। কিন্তু একটু লক্ষ্য করলেই বোঝা যায় তত্ত্ব সম্বন্ধে কোন ধারণা যাঁদের নেই তাঁরাও কিরকম আগ্রহ সহকারে এই উপন্যাসটিকে গ্রহণ করেছেন; অর্থাৎ তত্ত্ব থাকা সত্ত্বেও এটি মনোরঞ্জনের ক্ষমতা ধরে।

ঘটনার বৈচিত্র্যে, নানাধরনের নরনারীর আনাগোনায়, নাটকীয় গুণসম্পন্ন হওয়ায় ও সুসংবদ্ধ গল্প থাকায় 'দেবীচৌধুরাণী' বাংলার ঘরে ঘরে সমাদর পেয়েছিল।

বঙ্কিমচন্দ্রের লেখার একটা প্রধান গুণ, জমাট বাঁধা কাহিনী, দ্রুত গতি এবং লক্ষ্যের দিকে ঋজুগতি। 'দেবীচৌধুরাণী'তে আমরা এই সবকটি গুণই একসঙ্গে পাই। উপন্যাস এমন এক শিল্প যেখানে কাহিনীর শৈথিল্য অপরাধ নয়। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে কিন্তু নাটকের মত সুসংবদ্ধতা ও ঋজুগতি পাওয়া যায়। লেখকের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি থেকে সামান্য জিনিসও ঢাকা থাকেনি। প্রফুল্লর স্বামীর প্রতি ঐকান্তিকতা দেখাবার জন্য অনেক কথা বলেননি কিন্তু ভবানী ঠাকুরের সব কথা মেনেও একাদশীতে মাছ খাওয়ার মধ্যে তার পরের কাজের যেন ইঙ্গিত রেখে গিয়েছেন। এই সব ছোট ছোট আঁচড়েই শিল্পীর নিপুণতা ধরা পড়ে।

"এদিক ওদিক দুদিক বাঁচিয়ে সঙ্কট থেকে সঙ্কটের উপর দিয়ে কাহিনীকে চালনা করায় বঙ্কিমচন্দ্রের অসামান্য ক্ষমতা।

যে অনির্ব্বচনীয় গুণকে কবিত্ব বলে সেগুণে বঙ্কিমচন্দ্র মহাজন। তিনি গদ্যে কবি, উপন্যাসে নাট্যকার এবং দর্শন, ইতিহাস ও সমাজতত্ত্বে সাহিত্যিক, আর সর্বত্রই তিনি বঙ্কিমচন্দ্র।" (বঙ্কিম-সরণী, প্রমথনাথ বিশী, দেশ ৩৩বর্ষ, ৪১ সংখ্যা ১৩৭৩ বঙ্গাব্দ, ২৮শে শ্রাবণ, ১৪২ পৃঃ।)

প্রাকৃতিক বর্ণনায়, বিশেষতঃ নদীর বর্ণনায়, তাঁর শিল্পবোধ ও কবিত্ব লক্ষ্য করার মত। তাঁর বর্ণনার গুণে লেখা পড়তে পড়তে সমস্ত চিত্রটি চোখের সামনে জেগে ওঠে। এই বর্ণাঢ্য চিত্র ও এমন কাব্যময় ভাষাই তাঁকে কালজয়ী ঔপন্যাসিকের সম্মান দিয়েছে। তাঁর বর্ণনার গুণেই আমরা যখন 'দেবীচৌধুরাণী'

বা বঙ্কিম রচিত অন্য যে কোন উপন্যাস পড়ি, নিজেদের সহজেই সেইকালে ও সেই পরিবেশে নিয়ে যেতে পারি। আর সেই জন্যই তিনি বাঙ্গলার সর্বপ্রথম ঔপন্যাসিক হয়েও আজও সমান বরণীয়।

'দেবীচৌধুরাণী' উপন্যাসের চরিত্রগুলিতে নানা বৈচিত্র্য। একটি চরিত্রও অস্বাভাবিক নয়। ছোট ছোট চরিত্রগুলিও তাদের স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য দেখিয়েছে। প্রফুল্ল চরিত্র সম্বন্ধে সমালোচকরা অনেকেই তত্ত্বের জন্য ত্রুটি ধরেছেন। প্রথম শ্রেণীর নিপুণ শিল্পী বলেই বঙ্কিমচন্দ্র প্রফুল্ল চরিত্রকে মহিমান্বিত করতে পেরেছেন বলে মনে হয়। নতুবা সাধারণ লোকের হাতে তত্ত্বের ভারে প্রফুল্ল একেবারে ভেঙ্গে পড়তো। বঙ্কিমের প্রফুল্লকে দেখে মনে হয় সে যেন তার চরিত্রের সমুন্নতির জন্য আমাদের ঘরের মেয়ে ও বধূ হিসাবে বড় বেশী খাপছাড়া; আবার স্বামী ও সংসারের জন্য তার আকুতি দেখে তাকে সম্পূর্ণ নারী বলে ভাবতেও অসুবিধা হয় না। তত্ত্বের ভারে নারীত্বের কোমলতা নষ্ট হয়নি।

"প্রফুল্ল চরিত্র কল্যাণী ও শান্তির সমাবেশে গঠিত আগে বলেছি। কল্যাণীর নীরব ধৈর্য্য, শান্তির নেতৃত্ব শক্তি, কল্যাণীর নমনীয়তা, শান্তির সক্রিয় সপ্রতিভতা এক যোগে প্রফুল্লর মধ্যে লক্ষণীয়। প্রফুল্লর রাণীগিরি লোকচালনা, সাগরের বাপের বাড়ী গিয়ে দাসীকে চোপরাও হারামজাদী বলে তিরস্কার, কল্যাণীকে দিয়ে এসব হ'ত মনে হয় না, আবার ব্রজেশ্বরের স্মরণমাত্রে অশ্রুবিগলিত মুখে ও বজরার পাটাতনের উপর লুটিয়ে পড়ে ক্রন্দন এ শান্তিতে সম্ভব নয়। পাঁচ বৎসরের কর্মশিক্ষায় কল্যাণী কতকপরিমাণে 'গেছোমেয়ে', পাঁচ পাঁচ দশ বৎসরের ধর্ম ও কর্মশিক্ষায় ধর্মে ও কর্মে অধিকার তার হয়েছিল সত্য, ধর্ম আসিয়া কর্মকে ধরিয়াছে, কিন্তু ভক্তির কি হল? কিছুই হয়নি, কেননা ভক্তি শিক্ষায় তার প্রয়োজন ছিল না, স্বামী তার একমাত্র ভক্তির পাত্র। নিশি বলে 'ঈশ্বরই পরম স্বামী, স্ত্রীলোকের পতিই দেবতা, শ্রীকৃষ্ণ সকলের দেবতা। দুটো দেবতা কেন ভাই।'

এ তত্ত্ব বোঝে না প্রফুল্ল। কোনকালে বুঝবে বলে মনে হয় না। বরঞ্চ প্রফুল্লর কথায় নিশি বুঝতে পারে যে, ঈশ্বরভক্তির প্রথম সোপান পতিভক্তি। তবে প্রফুল্লর পক্ষে প্রথম ও শেষ সেই প্রথম রাত্রে ব্রজেশ্বরের সঙ্গে সাক্ষাতের পরে এবিষয়ে তার এতটুকু পরিবর্তন হয়েছে মনে হয় না। এদিক থেকে বিচার করলে ভবানী ঠাকুরের শিক্ষা তার উপরে সফল হয়নি বলতে হবে। লোহাতে

কাটারি তৈরি করলে লোহার প্রকৃতির পরিবর্তন হয় না। শান্তি, প্রফুল্ল ও শ্রী চরিত্র যদি কিছু প্রমাণ করে তবে সে এই কথা যে নারীর কর্ম-সন্ন্যাস নাই জ্ঞানসন্ন্যাস নাই, আছে একমাত্র ভক্তির পথ খোলা, সে ভক্তি পতিভক্তি। বঙ্কিমসরণী, প্রমথনাথ বিশী-দেশ-৩৩ বর্ষ, ৪১ সংখ্যা, ১৩৭৩ বঙ্গাব্দ, ২৮শে শ্রাবণ-১৪৪-১৪৫ পৃঃ।)

'আনন্দমঠে' চরিত্রের বৈচিত্র্য তুলনামূলকভাবে 'দেবীচৌধুরাণী'র চেয়ে কম। 'দেবীচৌধুরাণী'তে পুরুষ ও নারী উভয় চরিত্রেই নানা বৈচিত্র্য। একমাত্র দিবা ও নিশি চরিত্রে খানিকটা সাদৃশ্য আছে। এখানেই একটু যান্ত্রিকতার আভাস আছে। এই সন্ন্যাসিনী দুটি দেবীরাণীর চেয়ে অনেক বেশী তত্ত্বভারগ্রস্ত। নতুবা ফুলমণি থেকে ব্রহ্মঠাকুরাণী বিশেষত্ব ও স্বাভাবিকতা বজায় রেখেছে।

"নাটকীয় গতিতে, কবিত্বে, নরনারীর চরিত্রের বৈচিত্র্য ও গঠন কৌশলে 'দেবীচৌধুরাণী' উপন্যাস দেবীরাণীর বজরাখানার মতই শক্ত, সুন্দর, ক্ষিপ্রগামী ও ঝঞ্ঝাসহ। বিশেষত এমন শক্ত যে, অনুশীলনতত্ত্বের দুরন্তকালবৈশাখীর ঝাপটাতেও কাবু করতে পারেনি, বরঞ্চ তাকেই সহায় করে নিয়ে দুস্তর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে গিয়েছে।" (বঙ্কিম সরণী-প্রমথনাথ বিশী। দেশ ৩৩ বর্ষ, ৪১ সংখ্যা, ১৩৭৩ বঙ্গাব্দ, ১৪৫-১৪৬ পৃঃ।)

স্বভাবতঃই প্রশ্ন ওঠে অনুশীলনতত্ত্বটা কি, যার জন্য 'দেবীচৌধুরাণী' উপন্যাসখানিকে বার বার সমালোচকের শরাঘাতে জর্জরিত হতে হয়েছে।

"অনুশীলনতত্ত্বের উপরে 'দেবীচৌধুরাণী' কাহিনীর প্রতিষ্ঠা। অনেকের ধারণা অনুশীলনতত্ত্ব না বুঝলে 'দেবীচৌধুরাণী' কাহিনী বোঝা সম্ভব নয়। আমরা একথা বিশ্বাস করি না বলেই তত্ত্ব সম্বন্ধে বিশদ ব্যাখ্যায় বিরত করিনি, আর কাহিনীটাকে বোঝাতে চেষ্টা করেছি তার কাব্যসৌন্দর্যের উৎকর্ষ দিয়ে। তৎসত্ত্বেও অনুশীলন সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক, তবে তাতে উপন্যাসের গুণ উজ্জ্বলতর হয়ে উঠবে এমন আশা নাই।.... ....

....

অনুশীলনতত্ত্বের দুটিভাগ। প্রথম ভাগ চর্চা। শরীরিক, জ্ঞানার্জনী, কার্যকারিণ এবং চিত্তরঞ্জিনী 'এই চতুর্বিধ বৃত্তিগুলির উপযুক্ত স্ফূর্তি, পরিণতি ও ও সামঞ্জস্যই মনুষ্যত্ব'। 'দ্বিতীয়ভাগে তার প্রয়োগ। আগে প্রথমভাগের আলোচনা। মনুষ্যত্বের ও মনুষ্যত্বলাভের পন্থাস্বরূপ এই অনুশীলন-তত্ত্ব আমাদের

দেশে সম্পূর্ণ নূতন, কোন শাস্ত্রে বা সাহিত্যে এর পূর্বাভাষ বা সমর্থন নাই। এই অনুশীলন-তত্ত্বের নিকটতম অনুরূপ পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার কালচার; অনুশীলন শব্দটা যেন তার অনুবাদ। অনুশীলন গ্রন্থ যখন প্রথম প্রকাশিত হয়, সে বৎসর ম্যাথু আরর্ণল্ডের মৃত্যু ঘটে। অবশ্যই তিনি ম্যাথু আর্ণল্ডের ও গোটের কালচার-তত্ত্ব সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন। এখন পাশ্চাত্ত্য এই দুই চিন্তাবীরের কাছে প্রথম প্রেরণাটা গ্রহণ করলেও বঙ্কিমচন্দ্রের অনুশীলনের ভিত্তি অনেক ব্যাপক ও গভীর; বস্তুত তাঁর কাছে জীবন ও মনুষ্যত্ব ও অনুশীলন সমার্থক। গ্যেটে ও ম্যাথু আর্ণল্ডের কালচার মনের একটা মেজাজ বা অবস্থা বিশেষ। বলা বাহুল্য বঙ্কিমচন্দ্রের অনুশীলন তার চেয়ে অনেক বেশী পরিব্যাপ্ত। এই তত্ত্বটির জন্য পাশ্চাত্ত্য চিন্তাবীরদের কাছে ঋণী হলেও তার যথার্থ উত্তমর্ণ ভগবদ্‌গীতা। পাশ্চাত্ত্য চিন্তা স্বকীয় চিন্তা ও গীতার দিগ্‌দর্শন এই তিনে মিলিয়ে অনুশীলনের চর্চা ভাগ।... ....

.. ...দ্বিতীয় ভাগে প্রয়োগ। সংক্ষেপে বলা চলে যে, গীতোক্ত নিষ্কাম কর্ম প্রয়োগ ভাগ। নিষ্কাম কর্মের আদর্শ এদেশে চিরকাল আছে। তবে বঙ্কিমচন্দ্রের নেতৃত্ব কোথায়? নূতনত্ব রাজনীতির ক্ষেত্রে প্রয়োগ। নিষ্কাম কর্ম ব্যক্তিগত আদর্শরূপে ছিল, তাকে সমষ্টিগতরূপে প্রয়োগের পরিকল্পনা বঙ্কিম-চন্দ্রের প্রতিভাসঞ্জাত।........ ......আনন্দমঠ ও দেবীচৌধুরাণীতে বিলাতি Patriotism-এর নূতন ব্যাখ্যা ও নূতন প্রয়োগের চেষ্টা। বঙ্কিমচন্দ্র জানতেন, Patriotism কতকগু'ল মহৎ গুণ ও মহৎ দোষের সমষ্টি। দোষ নিষ্কাশিত করে অমিশ্র গুণের প্রতিষ্ঠা করতে পারলে অব্যর্থ নূতন অস্ত্র পাবে মানুষ, এই হয়েছিল তাঁর ধারণা। বিলাতী Patriotism-এর উপরে গীতোক্ত নিষ্কাম কর্মের আরোপ করতে পারলে এ হেন অসম্ভব সম্ভব হবে বলে তাঁর বিশ্বাস হয়েছিল। মঠ ও দেবীতে এই প্রয়াস।" (বঙ্কিম সরণী—প্রমথনাথ বিশী-দেশ—৩৩ বর্ষ ৪১ সংখ্যা ১৩৭০—১৪৭ পৃঃ।)

'দেবীচৌধুরাণী' নামকরণ সার্থক হয়েছে কিনা এবার বিচার করা যাক। এই উপন্যাসের নায়িকা প্রফুল্ল। তার জীবনের একটা প্রধান অংশ দেবীচৌধুরাণীরূপে নিষ্কাম রাজত্ব পরিচালনা। গ্রন্থকার যে তত্ত্বটি এই উপন্যাসের মধ্যে দিয়ে প্রচার করতে চেয়েছেন তা প্রফুল্ল থেকে দেবীচৌধুরাণীতে উত্তরণের মধ্যে। দেবীচৌধুরাণী আবার প্রফুল্ল হয়ে বা নতুন বৌ হয়ে সাধারণে নেমে এসেছে তাই আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় প্রফুল্ল নামটি দেবীচৌধুরাণীর চেয়ে

বেশী সার্থক হত। কিন্তু একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যায় দেবীচৌধুরাণী হবার জন্য প্রফুল্ল যে সাধনা করেছে, আপাতদৃষ্টিতে তা সফল না হলেও প্রফুল্লর পরবর্তীজীবনে নিষ্কাম সংসার জীবন যাপনে, রাণীর মত দক্ষতার সঙ্গে বৈষয়িক ব্যবস্থাপনায় ও রাণীর মত সংসারের সকলকে স্নেহে প্রেমে প্রতিপালনে তার শিক্ষা ও সাধনা সার্থক হয়েছে। তাই 'দেবীচৌধুরাণী' নাম অনুপযুক্ত হয়নি বরং সার্থক হয়েছে বলা যায়।

'দেবীচৌধুরাণী' সম্বন্ধে ত্রুটির উল্লেখ করেছিলেন সমালোচক মোহিতলাল মজুমদার—

"এই উপন্যাসখানিকে বঙ্কিমচন্দ্রের কবি মানসের স্বেচ্ছাপরাজয় বলা যাইতে পারে। গল্প রচনার সেই যাদু শক্তি ইহাতেও আছে—বঙ্কিমী কাব্যরসও ইহার কোন কোন অংশে উচ্ছ্বসিয়া উঠিয়াছে. কিন্তু সেই কবিশক্তিকে একরূপ জোর করিয়া তিনি এই উপন্যাসে শাস্ত্রোপদেশের ভার বহিতে নিযুক্ত করিয়াছেন।...............

মহাশক্তির অংশ যে নারী তাহাকেই গৃহ সংসারে ক্ষুদ্র জগতের জগদ্ধাত্রী ও অন্নপূর্ণা তো বটেই—অধিকন্তু, তাহাকে অনুশীলনের দ্বারা গীতাধর্মের শরীরী বিগ্রহরূপে গড়িয়া লইয়াছেন। তাহাতেই একটা বড় সমস্যার সমাধান হইয়া গেল। মানুষের জীবন, সৃষ্টির রহস্য ধ্যান, নিয়তির কঠিন শৃঙ্খল, পুরুষ ও প্রকৃতির সেই চিরন্তন দ্বন্দ্ব-এই বিপুল বিশাল কালপ্রবাহে নর-নারীর নিরুপায় দিশাহীন সন্তরণ, এসকলই দেবীচৌধুরাণীতে আসিয়া লয়প্রাপ্ত হইল। জীবন ও জীবনের কাব্য ঐ একটি তত্ত্বের সীমায় তাহাদের অসীমতা পরিহার করিল। এই দেবীচৌধুরাণীতে বঙ্কিমচন্দ্র সেই একবার মাত্র তত্ত্বের খাতিরে তাঁহার কবিশক্তির অবমাননা করিয়াছেন।

তথাপি ইহাতেও দুটি বিষয় লক্ষ্য করিবার আছে ; প্রথম, এই উপন্যাসেও একটি চমৎকার গল্প সৃষ্টি হইয়াছে, ঐ ধর্মতত্ত্বের খোলসটি খুলিয়া লইলে, গল্পটির কোন দোষ আর থাকিবে না,..

......দ্বিতীয়তঃ, নিজ কবিধর্মকে পীড়িত করিয়া এই যে তত্ত্ব প্রতিষ্ঠার উৎসাহ, ইহাতে একটা একরোখা জবরদস্তিরভাব আছে যেন জোর করিয়া একটা কিছুকে আশ্রয় করিতে হইবে, নহিলে মঙ্গল নাই—এবং মঙ্গল চাই-ই।"
(শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় স্মৃতিকথা-বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস-মোহিতলাল মজুমদার। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫৫)

'দেবীচৌধুরাণী' উপন্যাসটির ঐতিহাসিকতা নিয়ে অনেক সমালোচনা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে আমরা লেখক ও সমালোচক হিসাবে বঙ্কিমচন্দ্রের মতের উল্লেখ করতে পারি।

'দেবীচৌধুরাণী' প্রকাশের সময় বঙ্কিমচন্দ্র নিজেই আমাদের জানাইয়াছেন— 'ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনা আমার উদ্দেশ্য ছিল না, সুতরাং ঐতিহাসিকতার ভান করি নাই।······দেবীচৌধুরাণীরও ঐরূপ [অর্থাৎ 'আনন্দমঠের' মত] একটু ঐতিহাসিক মূল আছে।······ 'দেবীচৌধুরাণী' গ্রন্থের সঙ্গে ঐতিহাসিক দেবীচৌধুরাণীর সম্বন্ধ বড় অল্প। দেবীচৌধুরাণী, ভবানীপাঠক, গুডল্যাড সাহেব, লেফটেনান্ট ব্রেনান্, এই নামগুলি ঐতিহাসিক। ······দেবীচৌধুরাণীকে ঐতিহাসিক উপন্যাস বিবেচনা না করিলে বড় বাধিত হইব।' (দেবীচৌধুরাণী—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত—যদুনাথ সরকারের ঐতিহাসিক ভূমিকা বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, চতুর্থ সংস্করণ।)

ঐতিহাসিক উপন্যাস না হলেও, দুই একটি ঐতিহাসিক নাম নিযে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় অবস্থার যে চিত্র বঙ্কিমচন্দ্র 'দেবীচৌধুরাণী'তে এঁকেছেন তা ঠিক কল্পনা নয়; খানিকটা ইতিহাস সম্মত। বিখ্যাত ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকার বলেছেন—"দেবীচৌধুরাণীর জন্য কাল ও স্থান, এদুইটিই বিদ্রোহের সম্পূর্ণ উপযোগী করিয়া বাছিয়া লওয়া হইয়াছে।" (দেবীচৌধুরাণী—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত, যদুনাথ সরকারের ঐতিহাসিক ভূমিকা, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, চতুর্থ সংস্করণ।)

ঐ ভূমিকারই এক জায়গায় যদুনাথ সরকার বলেছেন, 'দেবীচৌধুরাণী'তে তথ্যের অভাব থাকলেও সাহিত্যিক মূল্য কম নয়। সমগ্র 'দেবীচৌধুরাণী' বিশ্লেষণ করে আমরাও এই সিদ্ধান্তে আসতে পেরেছি যে তত্ত্ব থাকা সত্ত্বেও এবং ঐতিহাসিক কয়টি নাম ভিন্ন বিশেষ ঐতিহাসিক তথ্য না থাকলেও 'দেবীচৌধুরাণী' উপন্যাস হিসাবে সার্থক।

গ

॥ "সীতারাম" ॥

'সীতারাম' এই পর্বের শেষ উপন্যাস। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের সমস্ত গুণ এই উপন্যাসের মধ্যে পাওয়া যায়। প্রথম থেকে শেষ পর্য্যন্ত সুসংবদ্ধ ঘটনা ও অপ্রতিহত গতি। এই উপন্যাসে নাটকীয় গুণের অভাব নেই। তবে রমা ও জয়ন্তীর বিচার দৃশ্য পর পর দুবার একটু একঘেয়ে বলে মনে হয়। অবশ্য অন্যভাবে এই বিষয় দুটির নিস্পত্তি সম্ভব ছিল বলা যায় না।

বর্ণনায় চিত্রধর্মিতা লক্ষ্য করার মত। গঙ্গারামের বিচার দৃশ্যে শ্রীর বীরত্ব না দেখেও দেখার মত মনে হয়। বর্ণনার গুণে সেদিনের মুসলমান শাসকদের শাসনের নামে স্বেচ্ছাচার পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। 'সীতারামকে' ঠিক ঐতিহাসিক উপন্যাস বলা যায় না, কারণ সমস্ত ঘটনায় ঐতিহাসিকতা নেই। তবে সীতারাম নামে একজন বীর হিন্দু রাজ্যস্থাপনের চেষ্টা করেছিলেন একথা সত্য। বঙ্কিমচন্দ্র কালানুযায়ী পরিবেশ সৃষ্টিতে অদ্বিতীয় ছিলেন, এসম্বন্ধে সন্দেহ নেই। 'সীতারাম' উপন্যাসের কাল ও পরিবেশ সৃষ্টিতে তাঁর পূর্ব সুনাম অক্ষুন্ন আছে।

'সীতারাম' উপন্যাসখানি তত্ত্বপ্রচারের বাহন একথা অস্বীকার করবার উপায় নেই। মোহিতলাল মজুমদার 'সীতারাম' উপন্যাস প্রসঙ্গে বলেছেন— 'দেবীচৌধুরাণীর' মত 'সীতারামে' ও বঙ্কিমচন্দ্র বড় ঘটা করিয়া গীতার ধর্মতত্ত্ব আমদানী করিয়াছেন, কিন্তু সে যেন সেই ধর্মতত্ত্বকেই ব্যঙ্গ করিবার জন্য। 'প্রফুল্লে' যাহার এমন সাধনা ও সিদ্ধির গৌরব ঘোষণা হইয়াছে, 'শ্রী'তে তাহার নিরতিশয় ব্যর্থতাই তিনি অকুণ্ঠ চিত্তে স্বীকার ও প্রমাণ করিয়াছেন।

"সবচেয়ে আশ্চর্য হইতে হয় এই জন্য যে 'আনন্দমঠে' তিনি যে বৃহত্তর লোক-কল্যাণের জন্য বা বড় একটা কিছুর জন্য আত্মোৎসর্গকেই পুরুষের পরমার্থ বলিয়া নিশ্চয় করিয়াছিলেন, এবং 'দেবীচৌধুরাণীতে' যে ধর্মতত্ত্বকে তিনি দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় সাধন যোগ্য বলিয়া সকল উৎকণ্ঠা নিবারণ করিতে চাহিয়াছিলেন, 'সীতারামে' সেই সকলের নিষ্ফলতা প্রদর্শন করিয়া, সেই জীবন

জিজ্ঞাসার পরিসমাপ্তি করিয়াছেন। 'প্রতাপ', 'চন্দ্রশেখর', 'গোবিন্দলাল', 'অমরনাথ', ভবানন্দ'-এসকলের পরে ঐ 'সীতারাম'; সে যেন একটা বিরাট অট্টহাস্য—হায় পুরুষ হায় তাহার ভাগ্য।" (শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় স্মৃতিকথা, বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস, মোহিতলাল মজুমদার—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৫৫ '৬৩-৬৪ পৃঃ।)

আমরা অবশ্য তাঁর মত মনে করিনা যে 'সীতারাম' বঙ্কিমচন্দ্রের ব্যর্থ সৃষ্টি। 'সীতারামের' গল্পরস, তার চরিত্রসৃষ্টি, কোনটাই নিন্দনীয় নয়। যে কথা তিনি বোঝাতে চেয়েছেন তা বোঝাতে পেরেছেন। 'দেবীচৌধুরাণী' উপন্যাসে ভবানী ঠাকুর যখন প্রফুল্লকে দেবীরূপে নির্বাচন করেন তখন মন্তব্য করেছিলেন "পুরুষ হইলেই ভাল হইত, কিন্তু প্রফুল্লর মত নানাগুণযুক্ত পুরুষ পাওয়া যায় নাই। বিশেষ এত ধন কোন পুরুষের নাই।" ("দেবীচৌধুরাণী")

"দেবীতে ভবানীঠাকুরের শিক্ষা সফল হয়নি। এবারে সীতারামে নানাগুণযুক্ত ও বহু ধন সম্পন্ন পুরুষ বঙ্কিমচন্দ্র পেয়েছেন। তবে এক্ষেত্রে ব্যর্থতার কারণ কি? অবশ্য ভবানী ঠাকুরের আদর্শ অনুসারে সে অনুশীলিত নয়, (সেরকম অনুশীলনও যে ফলপ্রদ হয় না তার দৃষ্টান্ত প্রফুল্ল), তবে নানা গুণযুক্ত যে তাতে সন্দেহ নাই। বীরত্ব, বিচক্ষণতা, আশ্রিতজনবাৎসল্য, রাজনৈতিক বুদ্ধি প্রভৃতি রাজোচিত গুণের ফলে বহুপ্রতিকূলতার মধ্যে বিরাট রাজ্য প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হয়েছিল। তবু শেষ পর্য্যন্ত সব নিষ্ফল হল কেন? আগেই তার বিস্তারিত উল্লেখ করেছি। আদ্যাশক্তির প্রেরণায় যে রাজ্য স্থাপন সম্ভব হয়েছিল, তারই প্রতিকূলতায় বা অপপ্রেরণায় ভেঙে পড়লো সে রাজত্ব, ভেঙে পড়লো বিরাট মনুষ্য সীতারাম। আর কোন কারণ আছে বলে মনে হয় না।'' (বঙ্কিম সরণী, প্রমথনাথ বিশী-দেশ ৩৩ বর্ষ, ৪৩ সংখ্যা, ১৩৭৩বঃ ১০ই ভাদ্র-৩৬৯ পৃঃ।)

এখন দেখতে হবে 'সীতারাম' কেন ব্যর্থ হলেন। এখানেও সেই রমণীর প্রতি আকাঙ্ক্ষা।

এখানেও বঙ্কিমচন্দ্র সেই নরনারীর আদিম কথাই ভিন্নভাবে উপস্থিত করেছেন। আর এই জন্যই সীতারাম চরিত্রে এমন উন্নতভাব থাকা সত্ত্বেও ব্যর্থ হয়েছে। রমণীর প্রেম, তার সুন্দর প্রয়োগ, পুরুষের কর্মে প্রেরণা যোগায়, তাকে উৎসাহিত করে, উন্নত হতে সাহায্য করে। অপরপক্ষে ব্যর্থ প্রেম কর্মহীনতা ও অবণতির কারণ হয়। নারীর মন জয় করার আগ্রহে, তার

নীরব উৎসাহে যে প্রেরণা যোগায়, তাতে পুরুষ বোধ হয় স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল জয় করে আনতে পারে। রমণী-চক্ষে হীন হবার ভয়ে অন্যায় কাজ করতে ভয় পায়। নারী পুরুষকে অনেকখানি নিয়ন্ত্রিত করে। এইই মহামায়ার মায়া। শক্তিধর পুরুষ অবলা নারীর কাছে এইভাবে পরাজিত হয়। রমণীর মোহে পড়ে অন্যায় কাজও করে। এখানে সীতারাম শ্রীর জন্য সমস্ত সময় নষ্ট করেছে। তার পরিণাম বোঝেনি। শ্রীর অন্তর্ধানের পর জয়ন্তীর প্রতি জুলুমে তার ব্যর্থ প্রেমের আক্রোশ প্রকাশ পেয়েছে। আরও পরে, অন্য নারী নির্য্যাতনের মধ্যেও এক ধরণের বিকৃত মনস্তত্ত্ব লক্ষ্য করা যায়।

এই শেষ পর্বের তিনখানি উপন্যাসই বিবৃতিমূলক ধারায় রচিত। নামকরণের দিক থেকে তিনটি উপন্যাস তিনটি ধারার অনুসরণ করেছে। প্রথমটিতে উপন্যাসের যে 'আনন্দমঠে' আহ্বান জানিয়েছেন সেই মঠের নামে উপন্যাসের নাম। দ্বিতীয় উপন্যাসখানিতে নায়িকার জীবনের এক নাটকীয় অধ্যায়ের সঙ্গে যুক্ত নাম থেকে উপন্যাসের নাম। আর শেষ উপন্যাসখানি নায়কের নাম অনুযায়ী। সীতারাম উন্নত চরিত্রের পুরুষ আর তার এই পতনে আমাদের মন ব্যথায় ভরে ওঠে। তার উত্থান পতনের কাহিনী এই উপন্যাসের বিষয়; সেইজন্য নামকরণ সম্পূর্ণ সার্থক। বঙ্কিমচন্দ্র যে আদর্শ দিতে চেয়েছিলেন তা সম্পূর্ণ সার্থক হয়নি, উন্নত চরিত্রের নায়ক সীতারামের সম্পূর্ণ পতন হয়েছে একথা ঠিক, কিন্তু উপন্যাসখানিকে ব্যর্থ বলা যায় না। ভাষা, আঙ্গিক, গল্পরস ও চরিত্র সৃষ্টিতে এ উপন্যাস অসার্থক নয়। অদৃষ্টের পরিহাসে গ্রীক নাটকের নায়কের মত সীতারামও খানিকটা অসহায় বলে পাঠক পাঠিকার সহানুভূতি পায়—তার অপরাধ ব্যথা দিলেও ক্রোধ আনে না।

॥ ৮ ॥

॥ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের পরিবার,—সামাজিকতা ও ধর্মমত ॥

পরিপূর্ণ জিনিসটির সৌন্দর্যে সকলেই অভিভূত হন। কিন্তু সবার অলক্ষ্যে তার প্রস্তুতি পর্বের দৈর্ঘ্যের কথা সব সময়ে মনে থাকে না। যে ছোট ফুলটি সৌন্দর্যে গন্ধে আজ আমাদের হৃদয় হরণ করছে, তার ফুটে ওঠার আয়োজন লোক চক্ষুর আড়ালে কতদিন ধরে চলেছে। অতএব বিরাট মহীরূহ সৃষ্টির পিছনে যে সুদীর্ঘকাল প্রস্তুতি দরকার হয়েছে একথা বোধহয় অনস্বীকার্য। রবি-রশ্মির ছটায় বিশ্ব-জগৎ আজ স্তম্ভিত। তাই সহজেই বোঝা যায় সুদীর্ঘ কাল ধরে তাঁর পূর্বপুরুষেরা ধীরে ধীরে এই বিরাট জ্যোতিষ্কের উপযোগী পরিবেশ গড়ে তুলেছিলেন।

ভারতের, তথা বাংলা দেশের, প্রথম জাগরণ পর্ব থেকেই দেখা যায় ঠাকুর পরিবার কলকাতায় সুপ্রতিষ্ঠিত। ইংরেজেরা যখন গোবিন্দপুরে ফোর্ট-উইলিয়াম নির্মাণ করে, তখন জয়রাম ঠাকুর নামে একজন দেশী ব্রাহ্মণের উল্লেখ পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পিতামহ দ্বারকানাথ ঠাকুর এই জয়রাম ঠাকুরের বংশজাত।

১৭৯৪ খ্রীষ্টাব্দে দ্বারকানাথ ঠাকুরের জন্ম হয়। ইনি বাল্যকালে সেরবোরন নামে একজন ফিরিঙ্গির কাছে শিক্ষা পান। তাছাড়া আরবী ও পারসী ভাষা শেখেন। ফার্গুসন নামে এক সাহেবের কাছে আইন শিক্ষা করেন। শিক্ষা শেষে তিনি নীল ও রেশম রপ্তানীর কাজ করেন। নিমকের এজেন্ট প্লাউডন সাহেবের দেওয়ানী পদে প্রভূত অর্থলাভের পর "কার টেগোর এণ্ড কোম্পানী" নামে এক কোম্পানী করে, স্বাধীন ব্যবসা করতে থাকেন। এছাড়া তিনি ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের প্রধান নির্ব্বাহ-কর্তাও ছিলেন। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী লিখেছেন—"১৮২৬ সালে দ্বারকানাথ ঠাকুর সহরের সম্ভ্রান্ত ধনীদের মধ্যে একজন অগ্রগণ্য ব্যক্তি এবং রামমোহন রায়ের দক্ষিণ হস্তস্বরূপ ছিলেন।" (রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ—শ্রীশিবনাথ শাস্ত্রী এম, এ, ৩য় পরিচ্ছেদ—৬৬ পৃঃ—নিউ এজ পাবলিশর্স, নিউ এজ সংস্করণ—ভাদ্র, ১৩৬২।)

দ্বারকানাথ ঠাকুর যেমন উপার্জনক্ষম তেমনি দানশীল ছিলেন। তিনি ছিলেন দেশের মধ্যে নামকরা ধনী ও বিলাসী ব্যক্তি। কিন্তু ঠাকুর বংশের

বিশেষ অন্যান্য গুণও তাঁর মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। তিনি দেশের শিক্ষা, ধর্ম ও রাজনীতিতে প্রত্যক্ষভাবে অংশ গ্রহণ করতেন। ১৮৩৩-১৮৪৬ খ্রীঃ, মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত দ্বারকানাথ ঠাকুর হিন্দুকলেজের ম্যানেজিং কমিটি বা অধ্যক্ষ-সভার সদস্য ছিলেন। মেডিক্যাল কলেজের স্থাপন বিষয়ে উৎসাহীদের মধ্যে তিনিও একজন। নিজে সঙ্গে করে খরচ দিয়ে বিদেশ থেকে শিক্ষা দিয়ে ছাত্র নিয়ে আসেন। ল্যাণ্ডহোল্ডারস্ এসোসিয়েসন ইত্যাদি দেশের সামাজিক কাজেও উৎসাহ ছিল।

দ্বারকানাথ ঠাকুরের তিন পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। তিনি ১৭৩৯ শকের ৩রা জৈষ্ঠ্য বুধবার ইংরাজী ১৮১৭ সালে জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে জন্মগ্রহণ করেন।

দেবেন্দ্রনাথের জন্মের আগে থেকে ধীরে ধীরে তাঁর পিতা দ্বারকানাথ ঠাকুরের অবস্থা ভাল হতে থাকে এবং তিনি বাল্যকাল থেকেই পিতার প্রভূত ধনসম্পদ ও সামাজিক প্রতিষ্ঠা দেখেছেন। তাঁদের বাড়ীতে হিন্দুর পুজা পার্বণ ইত্যাদি নিষ্ঠা ও আড়ম্বরের সঙ্গে পালিত হত। দ্বারকানাথ ঠাকুর নিজে অত্যন্ত বিলাসী হলেও গৃহের পরিবেশ সহজ রেখেছিলেন।

পিতার ব্যবস্থায় অল্পবয়সে দেবেন্দ্রনাথ গৃহে ইংরাজী, বাংলা, সংস্কৃত, পারসী —এই চার ভাষা শিক্ষা করেন। পরে আর একটু বড় হলে ঐ পড়ার সঙ্গে ব্যায়াম ও সঙ্গীতাদিও শিখতে হয়। দ্বারকানাথের বিলাসের মধ্যে কেবল ধনাড়ম্বর ছিল না, সৌন্দর্যপ্রিয়তাও ছিল। সঙ্গীত, চিত্র প্রভৃতি সুকুমার শিল্পের তিনি রসগ্রাহী ছিলেন। দেবেন্দ্রনাথ বোধহয় তাঁর কাছ থেকেই এই সৌন্দর্যবোধ ও শিল্পরসবোধ পেয়েছিলেন।

হিন্দুকলেজ স্থাপনে দ্বারকানাথ একজন প্রধান উদ্যোগী হলেও দেবেন্দ্রনাথকে তিনি তাঁর বন্ধু রামমোহন রায়ের এংলো-হিন্দুস্কুল বা হিন্দু স্কুলেই ভর্ত্তী করেছিলেন। এই স্কুলে রামমোহনের ছেলে রমাপ্রসাদ তাঁর সহপাঠী ছিলেন। দেবেন্দ্রনাথ কৃতি ছাত্র হিসাবে পুরস্কার পেতেন। পরবর্ত্তীকালে প্রতিষ্ঠিত্ কয়েকজনও তাঁর সহপাঠী ছিলেন।

১৮২৬ খ্রীঃ মে মাস থেকে হিন্দু কলেজের ছাত্ররা ডিরোজিওর কাছে শিক্ষা পেতে থাকেন। এই সময় হিন্দুকলেজের ছাত্রদের মধ্যে এক নতুন চিন্তাধারা লক্ষ্য করা যায়; হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতি দেশের উন্নতির অন্তরায় বলে তাঁদের মনে হতে থাকে। এই নতুন ইয়ং বেঙ্গল দল প্রগতিবাদী, বুদ্ধিমান, প্রতিভাধর হয়েও

স্বদেশের সংস্কৃতিতে আস্থাহীন হওয়ায় তাঁদের দ্বারা দেশের স্থায়ী উন্নতি, তাঁদের প্রতিভা ও ত্যাগ অনুযায়ী হতে পারেনি।

বোধহয় চৌদ্দবৎসর বয়সে দেবেন্দ্রনাথ হিন্দু কলেজে ভর্ত্তী হন। তিনি কিছুকাল এই কলেজে অধ্যয়ন করেছিলেন। কোন্ তারিখে তিনি হিন্দুকলেজে প্রবেশ করেন, কতদিন এখানে অধ্যয়ন করেন—এসব বিষয়ে তাঁর আত্মজীবনীতে কোন উল্লেখ নেই। প্রেসিডেন্সী কলেজ রেজিষ্টারে হিন্দুকলেজ ও প্রেসিডেন্সী কলেজের বিখ্যাত ছাত্রদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ আছে। দেবেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে ঐ রেজিষ্টারে আছে যে তিনি ডিরোজিওর পদত্যাগের অল্প পরেই কলেজে ভর্ত্তী হন।

তৎকালীন নব্য যুবকদের মত দেবেন্দ্রনাথ ইউরোপীয় শিক্ষাকেই একমাত্র গ্রহণযোগ্য বলে ভাবতে পারেননি। কারণ দ্বারকানাথ সৌখীন হলেও দেশীয় রীতিনীতি, শিক্ষা-দীক্ষা ছেড়ে বিদেশের অন্ধ অনুকরণ পছন্দ করতেন না আর ছেলেকেও সেরকম শিক্ষা দেননি। রামমোহন রায়ের স্কুলের শিক্ষাও তাঁর নিজ দেশীয় সংস্কৃতির প্রতি আগ্রহ জাগায়।—"বস্তুতঃ রামমোহন রায়ের স্কুলের শিক্ষার বৈশিষ্ট্য ছিল স্ব দেশ, স্ব-ধর্ম ও স্ব- সংস্কৃতির সংস্কার ও উন্নতিসাধন, কখনও বিলোপসাধন নহে। দেবেন্দ্রনাথ কৈশোরে এই শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন এবং ছাত্রাবস্থাতেই উক্ত আদর্শে সঙ্ঘবদ্ধভাবে কার্য আরম্ভ করিয়া দিয়াছিলেন।" (সাহিত্য সাধক চরিতমালা-৩য় খণ্ড, সংখ্যা ৪৫—যোগেশ চন্দ্র বাগল—১ম সংস্করণ-বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, ৮ পৃঃ) এছাড়া বাল্যকালে তিনি পিতামহীর কাছে মানুষ হন। দিদিমার ধর্ম-নিষ্ঠার ও একাগ্রতার ছবি তাঁর চোখের সামনে দিনরাত্রি জাজ্বল্যমান ছিল। সেই শুদ্ধাচারী নিষ্ঠাবতী মহিলার চরিত্র তাঁর চরিত্রের উপর যে কতখানি প্রভাব বিস্তার করেছিল তা তখন ঠিক ধরা না গেলেও পরবর্ত্তীকালের জীবনে খুবই ধরা পড়ে। বাল্যকালে রামমোহন রায়ের স্কুলে শিক্ষা লাভ করায় তিনি রাজাকে অনেকখানি কাছের থেকে দেখেছিলেন। সেই মহান চরিত্রের প্রভাবও তাঁর চরিত্র গঠনে অনেকখানি সাহায্য করে।

১৮৩১ বা ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে চৌদ্দ কি পনের বৎসর বয়সে ছয় বৎসরের সারদা সুন্দরী দেবীর সঙ্গে দেবেন্দ্রনাথের বিবাহ হয়। কিছুকাল পরেই তিনি কলেজ ছেড়ে দেন ও বিলাসে গা ভাসান। তবে এই বিলাসের মধ্যেও তাঁর জন্মগত রুচিবোধ ও সৌন্দর্যবোধের পরিচয় পাওয়া যায়। প্রিন্স দ্বারকানাথের পুত্র

বলে কেবল অর্থব্যয় ও আড়ম্বরই তাঁর উদ্দেশ্য ছিল না, রুচির সুস্থতা ছিল পুরোমাত্রায়।

দেবেন্দ্রনাথের আঠার বৎসর বয়সের সময় তাঁর পিতামহীর লোকান্তর হয়। তৎকালের নিয়ম অনুযায়ী তাঁর পিতামহীর শেষ সময় উপস্থিত বুঝতে পেরে তাঁকে গঙ্গাতীরে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে তিনি তিন দিন জীবিত ছিলেন। দিদিমা মারা যাবার পূর্বরাত্রে দেবেন্দ্রনাথ একলা গঙ্গাতীরে বসেছিলেন—এমন সময় তাঁর মনে হঠাৎ কিরকম একটা পরিবর্তন অনুভব করলেন। এক অপার্থিব আনন্দে তাঁর হৃদয় পূর্ণ হয়ে উঠলো, সাংসারিক ভোগ বিলাসিতা যেন অপ্রয়োজনীয় বলে মনে হল। পিতামহীর মৃত্যুর সময়ে তিনি দেখলেন হরিনাম করতে করতে উপরের দিকে অনামিকা রেখে তিনি প্রাণত্যাগ করলেন। দেবেন্দ্রনাথ তাঁর আত্মজীবনীতে বলেছেন—"তাহা দেখিয়া আমার বোধ হইল মরিবার সময় ঊর্দ্ধে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া আমাকে দেখাইয়া গেলেন 'ঐ ঈশ্বর ও পরকাল', দিদিমা যেমন আমার ইহকালের বন্ধু ছিলেন, তেমনি পরকালেরও বন্ধু।" (মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্বরচিত জীবনচরিত, শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী সম্পাদিত—২য় পরিচ্ছেদ—৪২ পৃঃ, তৃতীয়সংস্করণ, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়।)

পিতামহীর শ্রাদ্ধ ইত্যাদি কাজে কয়েকদিন ব্যস্ত থাকার মধ্যেও দেবেন্দ্রনাথ তাঁর সেই অভূতপূর্ব আনন্দ আস্বাদনের কথা ভোলেননি। আবার সেই উপলব্ধির আশায় তিনি অস্থির হয়ে উঠলেন। তারপর নিজেই বুঝলেন যথার্থ জ্ঞান না হলে এ আকাঙ্ক্ষা মিটবে না—ভগবান তাঁর অস্তিত্ব সম্বন্ধে বোধ জাগিয়ে আকাঙ্ক্ষা তীব্র করে তুলতে চেয়েছেন। তাই দেবেন্দ্রনাথ তাঁর গভীরতত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করার জন্য জ্ঞান আহরণে মন দেন। প্রথমে সংস্কৃত মুগ্ধবোধ ইত্যাদি ভালভাবে আয়ত্ত করে ঈশ্বরের তত্ত্বকথা জানবার জন্য খুব ভাল করে আদি মহাভারত পড়েন। এই সময় তাঁর জ্ঞানস্পৃহা এমন প্রবল হয়ে ওঠে যে তিনি কেবল স্বদেশীয় ধর্মতত্ত্ব ও দর্শনের উপর নির্ভর করে না থেকে লক্, হিউম প্রভৃতি বহু পাশ্চাত্য মনীষীর দর্শনও পাঠ করেন। ইউরোপীয় দর্শন শাস্ত্র থেকে তিনি দুটি তত্ত্ব পেলেন। (১) প্রকৃতির অধীনতাই মানুষের সর্বস্ব এবং (২) বাহ্য ইন্দ্রিয় দ্বারা মনের মধ্যে যে অবভাস হয় তাই জ্ঞান। কিন্তু এতে তিনি তৃপ্তি পেলেন না। কারণ জ্ঞানের আলোকে তিনি ঈশ্বরকে আরও ভালভাবে জানতে চান।

এই তীব্র আকাঙ্ক্ষায় তিনি বিষাদে ডুবে থাকতেন। কিছুই তাঁর ভাল লাগতো না। বিষয় সম্পত্তি এমনকি আহার বিহারেও মন ছিল না। তাঁর আত্মজীবনীতে তিনি লিখেছেন—"এই বিষাদ অন্ধকারের মধ্যে ভাবিতে ভাবিতে বিদ্যুতের ন্যায় একটা আলোক চমকিত হইল। দেখিলাম বাহ্য ইন্দ্রিয় দ্বারা রূপ, রস, শব্দ, স্পর্শের যোগে বিষয় জ্ঞান জন্মে। কিন্তু এ জ্ঞানের সঙ্গে আমি যে জ্ঞাতা তাহাও জানিতে পারি। দর্শন স্পর্শণ আঘ্রাণ ও মননের সহিত বিষয়ীর বোধ হয়, শরীরের সহিত শরীরকে জানিতে পারি। আমি অনেক অনুসন্ধানে সর্বপ্রথম এই আলোটুকু পাই; যেন ঘোর অন্ধকারাবৃত স্থানে সূর্যকিরণের একটা রেখা আসিয়া পড়িল।" (আত্মজীবনী, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীসতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী সম্পাদিত—৪র্থ পরিচ্ছেদ, ৫১পৃঃ—বিশ্বভারতী গ্রন্থালয় ৩য় সংস্করণ) তাঁর তখনকার মানসিক অবস্থা বোঝাতে তাঁর কথায় প্রকাশ করাই ভাল।—

"বহুদিন পূর্বে আমি যে অনন্ত আকাশ হইতে অনন্তের পরিচয় পাইয়াছিলাম, একদিন ভাবিতে ভাবিতে তাহা আমার মনে পড়িয়া গেল। আবার আমি একাগ্র মনে অগণ্য গ্রহ নক্ষত্র খচিত এই অনন্ত আকাশের উপরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলাম এবং অনন্তদেবকে দেখিলাম। বুঝিলাম যে অনন্তদেবেরই এই মহিমা; তিনি অনন্ত-জ্ঞানস্বরূপ, যাঁহা হইতে আমরা পরিমিত-জ্ঞান ও তাহার আধার এই অবয়ব পাইয়াছি। তাঁহার কোন অবয়ব নাই; তিনি শরীর ও ইন্দ্রিয় রহিত। তিনি হাত দিয়া এ বিশ্ব গড়ান নাই; কেবল আপনার ইচ্ছার দ্বারা এই জগৎ রচনা করিয়াছেন। তিনি কালিঘাটের কালিও নহেন, তিনি আমাদের বাড়ীর শালগ্রামও নহেন। এইখানেই পৌত্তলিকতার মূলে কুঠারাঘাত পড়িল।" (আত্মজীবনী, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীসতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী সম্পাদিত, তৃতীয় সংস্করণ-৫৩ পৃঃ, বিশ্বভারতী।) দেবেন্দ্রনাথ বুঝতে পারলেন সৃষ্টি পরিবর্ত্তনশীল কিন্তু 'তিনি' অপরিবর্ত্তনীয়। তা না হলে সৃষ্টির সঙ্গে ভেদ থাকে না, দুজনে এক হয়ে যান। কিন্তু "তিনি নিত্য, অবিকৃত, অপরিবর্ত্তনীয় ও স্বতন্ত্র।" তাঁর এই উপলব্ধি আশ্চর্য বলে বোধ হয়। তাঁর জীবনীকারের ভাষায় "দেবেন্দ্রনাথ দার্শনিক না হইয়াও দর্শন শাস্ত্রের কোন মূল তত্ত্ব কেবলমাত্র নিজের জ্ঞানের সাহায্যেই কেমন করিয়া জানিতে পারিয়াছিলেন তাহা ভাবিলে অবাক হইতে হয়।" (মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর—অজিত কুমার চক্রবর্ত্তী—৩য় পরিচ্ছেদ-৫৭ পৃঃ, ইণ্ডিয়ান প্রেস, এলাহাবাদ।

নিজের মনের মধ্যে একটা বিশ্বাস জন্মানর পর থেকে তিনি তাঁর ভাবনার সঙ্গে অন্যেরও সমর্থন চাইতে থাকেন। ভাইদের নিয়ে প্রতিমা পুজার বিরুদ্ধে আলোচনা করেন। পিতার ভয়ে সন্ধ্যাবেলা ঠাকুর দালানে যেতেন কিন্তু প্রণাম করতেন না। ঈশ্বরের অনন্তরূপ সম্বন্ধে একটা সুপ্রতিষ্ঠিত মতের জন্য সংস্কৃত সাহিত্যে অনুসন্ধান করতে থাকেন। কিন্তু অনেক খুঁজেও নিজের আকাঙ্খিত বস্তু তাঁর হাতে না আসায় সংস্কৃত সাহিত্য পৌত্তলিকতার সাহিত্য বলে তাঁর ধারণা হয়। এ রকমভাবে যখন তিনি নিজের মতের অনুকূল মত পাবার জন্য ব্যাকুল, সেই সময় একদিন একটি সংস্কৃত ছেঁড়া পাতা বাতাসে তাঁর সামনে উড়ে আসে। তিনি নিজে তার মর্ম্ম উদ্ধার করতে না পেরে ব্রাহ্মসভার পণ্ডিত রামবিদ্যাবাগীশের কাছে যান এবং জানতে পারেন সেটি ঈশোপনিষদের পাতা। দেবেন্দ্রনাথ লিখেছেন "আমি মানুষের কাছে সায় পাইতে ব্যস্ত ছিলাম, এখন স্বর্গ হইতে দৈববণী আসিয়া আমার মর্মের মধ্যে সায় দিল,—আমার আকাঙ্খা চরিতার্থ হইল। আমি ঈশ্বরকে সর্বত্র দেখিতে চাই; উপনিষদে কি পাইলাম? পাইলাম যে "ঈশ্বর দ্বারা সমুদায় জগৎকে আচ্ছন্ন কর"। (আত্মজীবনী, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর—সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী সম্পাদিত, ৩য় সংস্করণ-৬০ পৃঃ, বিশ্বঃ।) উপনিষদের বাক্যের সঙ্গে তাঁর মনের কথা এক হয়ে গেল। তিনি একে একে 'ঈশ', 'কেন', 'কঠ', 'মুণ্ডক', 'মাণ্ডুক্য' উপনিষদ ও আরও ছয়খানি উপনিষদ পড়ে ফেলেন।

রীতিমত উপনিষদ আয়ত্ত করে সত্যের আলোকে মনের ভাব উজ্জল হয়ে উঠলে দেবেন্দ্রনাথ সেই সত্যধর্ম প্রচারেব জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠেন। দুর্গোৎসবের কৃষ্ণ চতুর্দ্দশীতে বাড়ীর পুকুর ধারে একটা ছোট ঘরে ভাই ও বন্ধুদের নিয়ে দেবেন্দ্রনাথ এক সভা স্থাপন করেন। সেই সভার নাম হয় 'তত্বরঞ্জিনী সভা'। সভার দ্বিতীয় অধিবেশনে রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশকে ডাকা হলে তিনি এই সভার নাম রাখেন 'তত্ত্ববোধিনী সভা'—(১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দ ১৭৬১ শক ২১ শে আশ্বিন)। এই সভার উদ্দেশ্য 'সমুদয় শাস্ত্রের নিগূঢ়তত্ত্ব এবং বেদান্ত প্রতিপাদ্য ব্রহ্মবিদ্যার প্রচার'।

১৮৩০ খ্রীঃ (১৭৫১ শক, ১১ই মাঘ) ব্রাহ্মসমাজ (ব্রাহ্ম সভাও বলা চলে) সৃষ্টির পর থেকেই রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ তার অধ্যক্ষ ছিলেন। রামমোহন রায় একেশ্বরবাদীদের একটা উপাসনা মন্দিরের মত দাঁড় করিয়েছিলেন। তাতে সর্বধর্মের লোক যোগ দিতে পারতেন। বেদান্ত প্রতিপাদ্য ধর্মকে একটা নতুন বিধির মত গ্রহণ করে একটা নতুন সম্প্রদায় গড়ে ওঠে, রামমোহন রায়

সেরকম ব্যবস্থা করেননি। বিদ্যাবাগীশের কিন্তু সেই ইচ্ছাই ছিল। সুদীর্ঘ চৌদ্দ বৎসর পর তাঁর ইচ্ছা পূর্ণ হয়। ১৮৪৩ খ্রীঃ ৭ই পৌষ দেবেন্দ্রনাথ আরও কুড়িজন লোকের সঙ্গে তাঁর কাছে বিধিমত ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেন।

১৮৩৩ খ্রীঃ রামমোহন রায় বৃষ্টলে পরলোক গমন করেন। রামমোহন রায়ের অবর্তমানেও রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ তাঁর প্রতিষ্ঠিত অনুষ্ঠানটি অত্যন্ত যত্নে বাঁচিয়ে রেখেছিলেন। দ্বারকানাথ ঠাকুর বরাবর মাসিক ৮০ টাকা করে ব্রাহ্ম-সমাজকে সাহায্য করতেন।

ব্রাহ্ম সমাজ ও তত্ত্ববোধিনীর একই উদ্দেশ্য (ব্রহ্মজ্ঞানের প্রচার) দেখে ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দ থেকে দেবেন্দ্রনাথ এ দুটির যোগসাধন করেন। তত্ত্ববোধিনীর পৃথক অধিবেশন ও বাৎসরিক উৎসবের পরিবর্তে ১১ই মাঘ ব্রাহ্ম সমাজের প্রতিষ্ঠা দিবসের উৎসব প্রচলিত করেন। ব্রাহ্ম সমাজের ভার নিয়ে তার ভিতর দিয়ে ধর্ম প্রচার করেই দেবেন্দ্রনাথ খুসি হতে পারলেন না। তাঁর নিজের পাওয়া সত্য উপলব্ধিকে সকলের মধ্যে প্রচার করার জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠেন। এইজন্য একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা বোধ করেন। ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা বার হয় এবং অক্ষয়কুমার দত্ত তার সম্পাদক নিযুক্ত হন।

অক্ষয়কুমার দত্ত একজন শক্তিশালী লেখক ছিলেন। বিজ্ঞান, ইতিহাস ও পুরাতত্ত্বের তথ্য ও তত্ত্ব প্রকাশ করে বাংলা গদ্য সাহিত্যকে সর্বপ্রকার ভাব প্রকাশের উপযোগী করে তোলেন।

এই তত্ত্ববোধিনীকে অবলম্বন করে তৎকালে বাংলা দেশে এক বিদ্বান গোষ্ঠীর সম্মিলন হয়েছিল। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায়, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, রাজনারায়ণ বসু, আনন্দচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ ও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর—সকলেই বাংলা সাহিত্যের প্রথম যুগে তার গঠনে ও গতিতে অনেকখানি সাহায্য করেছিলেন। দেবেন্দ্রনাথ, অক্ষয়কুমার ও ঈশ্বরচন্দ্রের সযত্ন প্রচেষ্টা বাংলা গদ্য সাহিত্যের যে কি পরিমাণ উন্নতি করে তা বলা যায় না। এঁদের তিন জনের মধ্যে অক্ষয়কুমারের রচনা যুক্তিপূর্ণ কিন্তু শুষ্ক। বিদ্যাসাগরের ভাষা সুমধুর হলেও সংস্কৃত বাহুল্য ছিল। দেবেন্দ্রনাথের ভাষার মধ্যে তখনকার তুলনায় সরল বর্ণনা ক্ষমতা ও মাধুর্য সব থেকে বেশী ছিল। বাংলাদেশের প্রগতি ও শিক্ষার ইতিহাসে তত্ত্ববোধিনীর নাম চিরকাল উজ্জ্বল হয়ে থাকবে। এতে ব্রহ্মজ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে নানা শিক্ষণীয় বিষয় ও

স্বদেশানুরাগের কথা আলোচনা করে জাতীয় জীবনের মান উন্নত করার চেষ্টা হয়েছিল।

১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দের 'তত্ত্ববোধিনী'তে তত্ত্ববোধিনী পাঠশালার খবর পাওয়া যায়। এদেশে ধর্ম শিক্ষার সঙ্গে অন্যান্য বিষয় শিক্ষা দেওয়ার জন্য দেবেন্দ্রনাথের অত্যন্ত আগ্রহ হয়। দেবেন্দ্রনাথ তত্ত্ববোধিনী সভাকে কেন্দ্র করে শিক্ষা বিস্তারের কাজ আরম্ভ করেন। তত্ত্ববোধিনী সভা স্থাপনের এক বৎসর পরে তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা স্থাপিত হয়। ইংরাজী শিক্ষার ফলে চাকুরী পাবার সুবিধা হবে ভেবে সাধারণ লোকের ইংরাজী স্কুলের দিকে ঝোঁক যায়। সরকার পরিচালিত সাধারণ বিদ্যালয়ে ইংরাজীর মাধ্যমেই ইউরোপীয় জ্ঞান বিজ্ঞান শিক্ষার ব্যবস্থা হয়। ধনীরাও ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপন করতে থাকেন। এর ফলে দেশের বাংলা পাঠশালা ও বাংলা শিক্ষার অবস্থা অত্যন্ত খারাপ হয়ে যায়। প্রসন্ন কুমার ঠাকুরের আগ্রহে হিন্দু কলেজ কর্তৃপক্ষ একটি আদর্শ বাংলা পাঠশালা স্থাপন করেন। বাংলার মাধ্যমে ইউরোপীয় ও ভারতীয় জ্ঞান বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়াই ছিল এই পাঠশালার মূল লক্ষ্য। দেবেন্দ্রনাথ এই পাঠশালার আদর্শে তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা প্রতিষ্ঠা করতে চান। তবে এই পাঠশালায় ভারতীয় সনাতন ধর্মের কথা আলোচিত হত। কারণ মিশনারিদের প্রচারের ফলে বিদ্যালয়ের ছাত্রদের খ্রীষ্ট ধর্ম গ্রহণ অনেকটা প্রথায় দাঁড়াচ্ছিল বলে, দেবেন্দ্রনাথ শঙ্কিত হয়ে উঠেছিলেন। তিনি রামমোহনের স্কুলের মত এখানেও ধর্মশিক্ষার ব্যবস্থা করেন। তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা কলকাতায় তিন বৎসর ছিল, পরে বংশবাটি বা বাঁশবেড়িয়া গ্রামে স্থানান্তরিত করা হয়। বাঁশবেড়িয়ায় তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা আরও কয়েক বৎসর ভালভাবেই চলেছিল। পরে দ্বারকানাথ ঠাকুরের মৃত্যুর পর কার ঠাকুর ও ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক কারবার বন্ধ করায় পাঠশালার প্রধান পৃষ্ঠপোষক দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর বিব্রত হয়ে পড়েন ও অর্থাভাবে পাঠশালা উঠে যায়। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আগ্রহে ও উৎসাহে বারাকপুর ও নদীয়ার সুখসাগরেও এই রকম বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

কলকাতায় হিন্দু হিতার্থী বিদ্যালয় স্থাপনের বিষয়েও দেবেন্দ্রনাথের উৎসাহ ছিল খুব বেশী। এটি কেবলমাত্র একটি বিদ্যালয়ই নয়, সে সময়ের আত্মরক্ষামূলক আন্দোলনের প্রতীকস্বরূপ। খ্রীষ্টান মিশনারিদের অবৈতনিক স্কুলে হিন্দু ছাত্রদের ভর্তী করার ফলে খ্রীষ্টান করা অনেক সহজ হয়। দেবেন্দ্রনাথ হিন্দু হিতার্থী বিদ্যালয় করে এই সমস্যার প্রতিকার করতে চেয়েছিলেন।

এই সময় তত্ত্ববোধিনী সভা, তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা, ব্রাহ্মসমাজ ও তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রভৃতির উন্নতি নিয়ে দেবেন্দ্রনাথ এত ব্যস্ত থাকেন যে দ্বারকানাথ ঠাকুর তাঁর সাংসারিক বিষয়ে চিন্তিত হন। তবে তখন দেবেন্দ্রনাথ ব্রহ্মানন্দের আস্বাদ পেয়েছিলেন, তাঁর আর বিষাদের ভাব ছিল না। ভগবানের দান ভোগ করা উচিত এরকম মনোভাব ছিল। তিনি কঠোর সন্ন্যাস ব্রতের পক্ষপাতি ছিলেন না।

১৭৬১ শকের ২৯শে ফাল্গুন (১১ই মার্চ্চ ১৮৪০ খ্রী:) দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জ্যেষ্ঠ পুত্র দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম হয়।*

*[এই জন্মতারিখ নিয়ে একটা গোলযোগ দেখা যাচ্ছে ; দেবেন্দ্রনাথের জীবনীকার অজিতকুমার চক্রবর্ত্তী তাঁর 'মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ' গ্রন্থে লিখেছেন—"১৮৩৮ সালে দেবেন্দ্রনাথের কন্যা হয় এবং জন্মের পরই মারা যায়। ১৮৩৯ সালে তত্ত্ববোধিনী সভা প্রতিষ্ঠিত হয়, আর সেই বছরই তাঁর প্রথম পুত্র দ্বিজেন্দ্রনাথের জন্ম হয়, ১৮৪১ সত্যেন্দ্রনাথ ও ১৮৪৩ সালে হেমেন্দ্রনাথ জন্ম গ্রহণ করেন"। কিন্তু ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত সাহিত্য সাধক চরিতমালায় আছে—"কলিকাতা জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম হয়। তিনি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জ্যেষ্ঠ পুত্র। তাঁর জন্ম তারিখ—২৯ ফাল্গুন ১৭৬১ শক (১১ই মার্চ্চ ১৮৪০)। এই তারিখ তাঁর জন্ম পত্রিকা হইতে গৃহীত।"সত্যেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে তিনি লিখেছেন—"কলিকাতা জোড়াসাঁকোর বিখ্যাত ঠাকুর পরিবারে ১ জুন ১৮৪২ (২০ জৈষ্ঠ্য ১৭৬৪ শক) সত্যেন্দ্রনাথের জন্ম হয়।" দেবেন্দ্রনাথের আত্মজীবনীতে আছে—"১৭৬৮ শকের শ্রাবণ মাসে ঘোর বর্ষাতেই গঙ্গাতে বেড়াইতে বাহির হইলাম। আমার ধর্মপত্নী সারদাদেবী কাঁদিতে কাঁদিতে আমার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন 'আমাকে ছাড়িয়া কোথায় যাইবে। যদি যাইতেই হয়, তবে, আমাকে সঙ্গে করিয়া লও।' আমি তাঁহাকে সঙ্গে লইলাম। তাঁহার জন্য একটা পিনিস ভাড়া করিলাম। তিনি দ্বিজেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ ও হেমেন্দ্রনাথকে লইয়া তাহাতে উঠিলেন—আমি রাজনারায়ণবাবুকে সঙ্গে লইয়া নিজের একটি সুপ্রশস্ত বোটে উঠিলাম। তখন দ্বিজেন্দ্রনাথের বয়স ৭ বৎসর, সত্যেন্দ্রনাথের ৫ বৎসর এবং হেমেন্দ্রনাথের তিন বৎসর।" (১০৯—১১০পৃঃ, ৩য় সংস্করণ) দেবেন্দ্রনাথের আত্মজীবনীর সঙ্গে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের তারিখের মিল হওয়ায় এটিকেই গ্রহণযোগ্য বলে মনে হল।]

১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দের ২রা জুন (২০শে জ্যৈষ্ঠ ১৭৬৪) দেবেন্দ্রনাথের দ্বিতীয় পুত্র সত্যেন্দ্রনাথের জন্ম হয়।

দেবেন্দ্রনাথের স্ত্রী সারদাদেবীর মানসিক অবস্থার কথা সহজেই কল্পনা করা যায়। তিনি হিন্দুঘরের মেয়ে, হিন্দু আচার অনুষ্ঠান তাঁর সহজাত সংস্কার। এদিকে বাল্যকাল থেকেই দেখছেন যে স্বামী ঠাকুর দেবতা মানেন না, ব্রহ্ম উপাসক। হিন্দুনারীর সংস্কার ত্যাগ করতে তাঁর বাধে আবার স্বামীর মতে মত মিলাতে না পেরেও ব্যাকুল হয়ে ওঠেন। দেবেন্দ্রনাথ মনে মনে যদিও স্ত্রীকে নিজের ধর্মমতে আনতে চেয়েছেন কিন্তু সেজন্য কোনদিন জোর করেননি। স্থিরভাবে তাঁর মতের পরিবর্ত্তনের জন্যে অপেক্ষা করেছিলেন। স্ত্রীর সঙ্কটময় অবস্থা তিনি অনুভব করতে পেরেছিলেন। তাঁর প্রতি দেবেন্দ্রনাথের স্নেহ বরাবরই অত্যন্ত গভীর ছিল।

১৭৬৮ শকে দেবেন্দ্রনাথ গঙ্গা বক্ষে স্ত্রী পুত্র ও বন্ধু রাজনারায়ণ বসু সহ ভ্রমণে বার হন। সেই সময় খবর আসে ইংল্যাণ্ডে দ্বারকানাথ ঠাকুরের মৃত্যু হয়। ইংল্যাণ্ড যাত্রার সময়ই পিতা তাঁর উপর ব্যবসা ও অন্যান্য বিষয়কর্মের ভার দিয়ে গিয়েছিলেন। প্রচণ্ড খরচের জন্য দ্বারকানাথ ঠাকুর অনেক ঋণ রেখে যান। দেবেন্দ্রনাথ স্থিরভাবে দীর্ঘদিন ধরে ধীরে ধীরে সেই ঋণজাল থেকে উদ্ধার পান। তাঁদের পূর্বের অবস্থার তুলনায় সাংসারিক অবস্থা অনেক খারাপ হয়ে যায়।

পিতার মৃত্যুর পর দেবেন্দ্রনাথ যে শ্রাদ্ধ ইত্যাদি করেন তাতে শালগ্রামশিলা বিহীন নতুন পদ্ধতি গ্রহণ করেন। এই নতুন প্রক্রিয়ায় কাজ করায় তাঁর ভাইদের সহযোগিতা পাননি এবং সমাজের অনেকেও আপত্তি করেন। কিন্তু দেবেন্দ্রনাথ নিজের মতে স্থির ছিলেন।

দেবেন্দ্রনাথের বরাবরই ভ্রমণের ঝোঁক ছিল। তিনি মাঝে মাঝেই পাহাড়ে পর্বতে নদীতে সমুদ্রে ঘুরে বেড়াতেন। তিনি মনুষ্য সমাজে তাঁর মহিমা ব্যাখ্যা করতেন আর ভ্রমণ করে তাঁর মহিমা অন্তরে অনুভব করে মানসিক শান্তি পেতেন। প্রথমবার সিমলা ভ্রমণ করে ফিরে এসে তিনি ব্রাহ্ম সমাজের কাজের জন্য দুটি যুবককে পেলেন। এঁদের মধ্যে একজন তাঁর দ্বিতীয় পুত্র সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং অন্যজন রামকমল সেনের পৌত্র কেশবচন্দ্র সেন। মাত্র আঠার বৎসর বয়সে সত্যেন্দ্রনাথ ব্রহ্মসঙ্গীত রচনা করেন এবং পিতার অনুমতি নিয়ে মাঘোৎসবের দিন ব্রাহ্ম সমাজে বক্তৃতা দেন। দেবেন্দ্রনাথ

কেশবচন্দ্র সেনের ব্রহ্মভক্তি ও সমাজের উন্নতির জন্য অক্লান্ত সেবাগুণ দেখে তাঁকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন। ব্রাহ্ম সমাজের সঙ্গে মেলামেশা করার জন্যে কেশবচন্দ্র সেনের বাড়ী থেকে তাঁর উপর খারাপ ব্যবহার করা হতে থাকে। তাঁর স্ত্রীকে জোর করে গুরুমন্ত্র দেবার বন্দোবস্ত হলে কেশবচন্দ্র স্ত্রীসহ গৃহত্যাগ করেন। সেই সময় দেবেন্দ্রনাথ সাদরে নিজ গৃহে তাঁদের আত্মীয়তুল্য সমাদরে স্থান দেন। সারদাদেবীও সর্বদা তাঁদের যত্নের প্রতি দৃষ্টি দিতেন। কেশবচন্দ্রের ধর্মভাব ও কর্মশক্তি দেখে দেবেন্দ্রনাথ তাঁর হাতে ব্রাহ্ম সমাজের দায়িত্ব দিয়ে 'ব্রহ্মানন্দ' বলে সম্বোধন করেন। সত্যেন্দ্রনাথ ও কেশবচন্দ্রকে নিয়ে তিনি সিংহলে ব্রাহ্মধর্ম প্রচারের জন্য গিয়েছিলেন।

ব্রাহ্মসমাজের সম্বন্ধে একটা মোটামুটি আলোচনা করলে দেখা যায় ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দে যোগ দিয়ে থেকে দেবেন্দ্রনাথ তাকে সমৃদ্ধির পথে নিতে থাকেন। কৃষ্ণনগর ও বর্দ্ধমানের রাজাদের আগ্রহে ঐ দুই জায়গায় তাঁর চেষ্টায় ব্রাহ্ম সমাজের প্রতিষ্ঠা হয়। ভারতের নানাস্থানে ভ্রমণ করেও তিনি ব্রাহ্মধর্ম প্রচারের চেষ্টা করেন।

কেশবচন্দ্র সেন ব্রাহ্মসমাজভুক্ত হবার পর থেকে ব্রাহ্মসমাজ উন্নতির উচ্চ শিখরে আরোহণ করে। তাঁর বাগ্মীতার গুণে ও তাঁর দলের বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ইত্যাদি কয়েকজন অতি উৎসাহী প্রচারকের চেষ্টায় বাংলা দেশের প্রায় সর্বত্র তো বটেই ভারতেরও সর্বত্র এই ধর্ম প্রচারিত হয়।

সুচিন্তিতভাবে কাজ করার এমন একটা পদ্ধতি দেবেন্দ্রনাথের ছিল যে সেই ধীর শান্ত পদক্ষেপকে অনেকেই রক্ষণশীলতা ও প্রগতি বিরোধিতা বলে ভুল করেছেন। বিধবা বিবাহ সম্বন্ধে ও জাতিভেদ ইত্যাদি কুপ্রথার বিরুদ্ধে তত্ত্ববোধিনীতে আলোচনা হয় এবং বলা বাহুল্য এই সব সংস্কার কার্যে তাঁর সম্মতি অবশ্যই ছিল। সর্বোপরি, পরম প্রগতিবাদী বিদ্যাসাগর ও অক্ষয় দত্ত তাঁর সুহৃদ ছিলেন। কেশববাবু সমাজে প্রবেশের কিছুদিন পরে, যখন উপবীত ত্যাগের প্রশ্ন আসে, তিনি নিজে তখনই তা ত্যাগ করেন। কিন্তু অন্যের বিষয়ে জোর করে নিজের মত চাপাতে তিনি ভালবাসতেন না। তাই আনন্দচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ ও অন্য কয়েকজন উপবীতধারীদের উপবীত ত্যাগে অসম্মতি জেনে তিনি জোর করেননি।

ব্রাহ্মবিবাহ বিধির মধ্যে পৌত্তলিকতার অংশটুকু বাদ দিয়েছিলেন কিন্তু অন্য মঙ্গলাচরণ ও স্ত্রীআচার বাদ দেবার পক্ষপাতী দেবেন্দ্রনাথ ছিলেন না।

আইনের দ্বারা বিবাহ বিধির পরিবর্ত্তনে তাঁর আপত্তি ছিল। তিনি চেয়েছিলেন ধীরে ধীরে সমাজের মধ্যে নব প্রবর্ত্তিত প্রথা প্রসারলাভ করুক। ক্রমে লোকের হৃদয়ে এই অপৌত্তলিক বিবাহ অনুষ্ঠান স্থান পাক। "হিন্দু সমাজের মধ্যে যাহাতে ব্রাহ্মধর্মের অনুষ্ঠান প্রবেশ করিতে পাবে, সেইদিকে দেবেন্দ্রনাথের দৃষ্টি ছিল বলিয়াই এই অনুষ্ঠানগুলিতে হিন্দুসমাজের প্রধান লোকদিগকে নিমন্ত্রণ করিতেন এবং অনুষ্ঠানে যথাসম্ভব হিন্দুরীতি ও আচারগুলি রক্ষা করিবার চেষ্টা করিতেন।" (মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর—অজিতকুমার চক্রবর্ত্তী, ১ম পরিচ্ছেদ, ৪৭৩ পৃঃ, ইণ্ডিয়ান প্রেস।)

কেশবচন্দ্র ছিলেন অতি উৎসাহী। তিনি ধীরে ধীরে উন্নতির পথে যেতে চাননি। তাঁর আগ্রহ ছিল অতি দ্রুত আমূল পরিবর্ত্তনের দিকে। তার জন্য যদি ব্যক্তিগত স্বাধীনতায় হাত দিতে হয় তাতেও তাঁর আপত্তি ছিল না। এইখানেই দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে কেশবচন্দ্রের মতের অমিল। রাতারাতি পবিবর্ত্তন বা জোর করায় আপত্তি থাকায় তাঁদের মধ্যে যে অসন্তোষ সৃষ্টি হয়, উপবীত ত্যাগের ব্যাপারে তা জোরালো হয়ে ওঠে। ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে কেশবচন্দ্র সেন 'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ' নাম দিয়ে তাঁর সমর্থক গোষ্ঠীসহ পৃথক হয়ে যান। দেবেন্দ্রনাথের সমাজের নাম তখন থেকে হয় 'আদি ব্রাহ্ম সমাজ'।

কেশবচন্দ্র সেন আদি ব্রাহ্মসমাজ থেকে সরে যাবার সময় 'মিরর' পত্রিকখানিও তাঁব হাতে যায়। তাই আদি ব্রাহ্মসমাজের পক্ষ থেকে "ন্যাশন্যাল পেপার" বার হয়—সম্পাদক নবগোপাল মিত্র।

"১৮৭৮ সালে কুচবিহারের নাবালক রাজার সহিত কেশবচন্দ্র সেন মহোদয়ের অপ্রাপ্ত বয়স্ক কন্যার বিবাহ উপলক্ষে ব্রাহ্মদিগের মধ্যে মতভেদ ঘটিয়া উন্নতিশীল ব্রাহ্মগণ দুইভাগে বিভক্ত হন, প্রগতিবাদীদল ১৮৭৮ সালের মে মাসে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ নামে একটি স্বতন্ত্র সমাজ গঠন করেন।" (রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ—শ্রীশিবনাথ শাস্ত্রী, এম. এ., দ্বাদশপরিঃ, ২৭৫পৃঃ, নিউ এজ সংস্কঃ।)

পূর্বোক্ত বিয়ের গোলযোগের পরে যখন 'ভারতবর্ষীয়' সমাজ ভাগ হয়ে যায় কেশবচন্দ্র নিজের বিভাগীয় দলের নাম দেন 'নববিধান'। এরপর থেকে কেশবচন্দ্র তাঁর ভগ্নদলের পুনর্গঠনের জন্য অমানুষিক পরিশ্রম করতে থাকেন এবং ১৮৮৪ খ্রীঃ ৮ই জানুয়ারী প্রাণত্যাগ করেন।

দেবেন্দ্রনাথ কেশবচন্দ্রের অকালমৃত্যুতে অত্যন্ত আঘাত পেয়েছিলেন।

মহর্ষি ও কেশববাবুর আত্মীয়তা সম্বন্ধে জার্মানীর সুপণ্ডিত মক্ষমুলর 'কসমোপলিশ' সংবাদপত্রে লিখেছিলেন—

"যদিও আমি তাঁহার (দ্বারকানাথ ঠাকুরের) পুত্র দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে কখন দেখি নাই কিন্তু আমি তাঁহার অনেক ভাল ভাল চিঠি পাইয়াছি এবং ভুরি ভুরি অকৃত্রিম সাধুকার্যের জন্য তাঁহার প্রতি গভীর অনুরাগ ও সহানুভূতি হৃদয়ে ধারণ করিয়াছি। তিনি কেশবচন্দ্র সেনের পৃষ্ঠপোষক বন্ধু ছিলেন। যদিও তিনি তাঁহার যুবক বন্ধুর সকল মত ও সংস্কারের অনুমোদন করিতে পারেন নাই, তাই বলিয়া তাঁহার এই প্রবল উদ্যমশীল ছাত্রের প্রতি স্বীয় স্নেহ ভালবাসার বিন্দুমাত্র খর্ব করেন নাই। কুচবিহারের রাজার সহিত স্বীয় কন্যার বিবাহ সূত্রে কেশবচন্দ্র সেন যখন সকল বন্ধু দ্বারা পরিত্যক্ত হইয়াছিলেন তখনও এই বৃদ্ধ তাঁহার প্রতি সমান ভালবাসা দেখাইয়াছিলেন এবং এক পুত্রের পিতার ন্যায় তিনি তাঁহার মৃত্যু শয্যায় ক্রন্দন করিয়াছিলেন।" (দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখিত আত্মচরিত—প্রিয়নাথ সেন শাস্ত্রী লিখিত পরিশিষ্ট—১১৫ পৃঃ) এই উক্তি থেকেই বোঝা যায় কি গভীর ও অকৃত্রিম স্নেহ ছিল তাঁর ব্রাহ্মদের প্রতি।

রায়পুরের সিংহ পরিবারের সঙ্গে দেবেন্দ্রনাথের বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল। শ্রীকণ্ঠ সিংহ তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। দুই বন্ধুর মধ্যে যাতায়াত ছিল। একবার রায়পুর থেকে ফিরবার সময় শান্তিনিকেতনের প্রসারিত প্রান্তরের যুগল সপ্তপর্ণচ্ছায়ায় দাঁড়িয়ে তাঁর সাধনার-উপযুক্ত স্থান বলে মনে হয়। চারিদিকের ধূ ধূ প্রান্তরের মধ্যের ঐ ছাতিম গাছটির ছায়া তাঁর বড় ভাল লাগে, তাই পরে সেখানে একটি আশ্রম করেন।

ট্রাষ্টডীডে মহর্ষি নিজেই একটি ধর্মমেলার অনুষ্ঠান করে সকল ধর্ম সম্প্রদায়ের সাধুপুরুষদের ধর্মালাপ করার কথা লিখেছিলেন। এই মেলায় কোন পৌত্তলিক আরাধনা, কুৎসিত আমোদ আহ্লাদ ও মদ্য মাংস বিক্রয় তিনি নিষেধ করেন। ট্রাষ্টডীডে একটি ভাল গ্রন্থাগার ও ব্রহ্মবিদ্যালয় স্থাপনের ইচ্ছাও মহর্ষি প্রকাশ করেন। তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শান্তিনিকেতন আশ্রমে একটি ব্রহ্মবিদ্যালয় খোলার ইচ্ছা প্রকাশ করেন ও দেবেন্দ্রনাথ অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে সম্মতি দেন। ১৯০১ খ্রীঃ তাঁর এই ইচ্ছাটি পূরণ হয়।

১৭৮৮ শকের চৈত্র সংক্রান্তিতে (১৮৬৭) নবগোপাল মিত্র, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রধানতঃ উদ্যোগী হয়ে হিন্দুমেলা নামে এক মেলার আয়োজন করেন। "দেশের সাহিত্য চর্চা, দেশের সঙ্গীত চর্চা, দেশী শিল্প

ব্যায়াম প্রভৃতির প্রদর্শনী, দেশীয় গুণীলোকদিগকে পুরস্কৃত করা সেই মেলার উদ্দেশ্য ছিল। মেলার উৎসাহদাতাদের মধ্যে দুর্গাচরণ লাহা, কৃষ্ণদাস পাল, পণ্ডিত জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন, পণ্ডিত ভারতচন্দ্র শিরোমণি, রাজা কমলকৃষ্ণ বাহাদুর প্রভৃতির নাম দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার পরের বছরে ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে বেলগাছিয়ার বাগানে মেলার দ্বিতীয় অধিবেশন হয়। সেইদিন সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের রচিত বিখ্যাত জাতীয় সঙ্গীত 'মিলে সব ভারতসন্তান' সেখানে গাওয়া হয়। এই হিন্দুমেলা বাংলার জাতীয় ইতিহাসের একটি প্রধান ঘটনা; কারণ স্বদেশ-প্রেমের সেই বোধ হয় প্রথম উদ্বোধন। স্বদেশী আন্দোলনের সেই উদ্যোগপর্ব্ব।" (মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর— অজিতকুমার চক্রবর্ত্তী, ৭ম পরিচ্ছেদ, পৃঃ ৪৭০, ইণ্ডিয়ান প্রেস, এলাহাবাদ।)

১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দ কেবল হিন্দুমেলার জন্যই প্রসিদ্ধ নয়। আরও একটি কারণে উল্লেখযোগ্য। সেই বৎসর দেবেন্দ্রনাথকে 'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের' সভ্যরা এক অভিনন্দন পত্র পাঠান। এই অভিনন্দন পত্রেই প্রথম তাঁকে 'মহর্ষি' সম্বোধন করা হয়। বোধ হয় এই সময় থেকেই ব্রাহ্মদের কাছে এবং এদেশে সর্বত্র তিনি মহর্ষি বলে সম্মানিত হয়ে আসছেন।

১৮৭৫ খ্রীঃ ২৭শে ফাল্গুন দেবেন্দ্রনাথের স্ত্রী সারদাদেবীর মৃত্যু হয়।

সারদা দেবী যতদিন পৌত্তলিক ধর্ম মানতেন, নিষ্ঠার সঙ্গে আচার আচরণ পালন করতেন। ক্রমে যখন ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেন প্রতিদিন উপাসনা করতেন। বহু সন্তানবতী ছিলেন বলে নিজে সন্তানদের সব সময় পালন করতে পারতেন না, তবে সর্বদাই তাঁদের সকলের খবর রাখতেন। রবীন্দ্রনাথের 'জীবনস্মৃতি' থেকে তাঁর মা'র আসরে স্থান পাবার কথা জেনে বোঝা যায়, কত সহজ সরল মানুষ ছিলেন তিনি। এরকম স্ত্রীর মৃত্যু যে তাঁর স্বামীর মনে কতখানি আঘাত হেনেছিল তা সহজেই বোঝা যায়। কিন্তু দেবেন্দ্রনাথের বাইরের আচরণে বিচলিত হবার লক্ষণ দেখা যায় না। রবীন্দ্রনাথ 'জীবনস্মৃতি'তে লিখেছেন দেবেন্দ্রনাথ স্ত্রীর মৃত্যুর পর তাঁকে শ্মশানে পাঠিয়ে উপাসনায় বসেন। পরবর্ত্তীকালে তাঁর জামাতা সারদা প্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় ও পুত্র হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মৃত্যু সংবাদ পেয়েও অত্যন্ত ধৈর্যের সঙ্গে তাকে মেনে নেন।

৬ই মাঘ ১৮২৫ শক—ইংরাজী ১৯শে জানুয়ারী ১৯০৫ সাল দ্বিপ্রহরে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর পরলোক গমন করেন। মৃত্যুর পূর্বে শেষ পর্যন্ত জ্ঞান ছিল এবং অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে ব্রহ্মমন্ত্র শুনতে শুনতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

সমগ্রভাবে মহর্ষির জীবনী আলোচনা করলে দেখা যায় যে তিনি ধ্যান ধারণা ধর্মসাধনা নিয়ে থেকেও একজন অত্যন্ত ন্যায়নিষ্ঠ জমিদার, বৃহৎ একান্নবর্ত্তী পরিবারের উপযুক্ত কর্ত্তা, স্নেহময় স্বামী, কর্ত্তব্যপরায়ণ পিতা ও সমাজের মধ্যমণি।

তাঁর জীবনীকার বলেছেন "যেমন জ্ঞান চর্চ্চায় তাঁহার উৎসাহও অনুরাগ, তেমনি ছেলেদের লেখাপড়া ভাল রকম হয় এদিকে তাঁহার পুরাপুরি উৎসাহ ও আগ্রহ ছিল। ছেলেদের সাহিত্যচর্চ্চায় তাঁহার উৎসাহ, সৎকাজে উৎসাহ, সকল শুভ সংকল্পে উৎসাহ। শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের কাছে শুনিয়াছি যে তাঁহাব 'তত্ত্ববিদ্যা' গ্রন্থ যখন বাহির হয়, তখন দেবেন্দ্রনাথ সে বইয়ের পাণ্ডুলিপি আগাগোডা সংশোধন করিয়া দিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন' "আমার প্রণীত পুরুবিক্রম, সরোজিনী ও অশ্রুমতী নাটক প্রকাশিত হইলে তাঁহাকে পাঠাইয়া দিয়াছিলাম। তিনি প্রত্যেকেরই সংক্ষিপ্ত সমালোচনা করিয়া আমাকে পত্র লেখেন, সেই পত্রগুলি সযত্নে রক্ষা করি নাই বলিয়া এখন দুঃখ হয়।" 'তাঁহাব কন্যারাও যাহা লিখিতেন তিনি তাহা মনযোগের সঙ্গে পড়িয়া তাহার মন্তব্য লিখিয়া জানাইতেন।" (মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর—অজিত কুমার চক্রবর্ত্তী—১ম পরিচ্ছেদ ৩য়, খণ্ড, ৫৫৯ পৃঃ, ইণ্ডিয়ান প্রেস এলাহাবাদ।) রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'জীবনস্মৃতিতে' বলেছেন যে পিতার কাছ থেকে তিনি তাঁর রচনার জন্য সহৃদয় উৎসাহ পেয়ে এসেছেন।

যদিও তিনি সর্বদা ধর্মসাধনা নিয়ে থাকতেন তবু পরিবারের প্রতিটি লোকের শিক্ষা সহবৎ সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন। তাঁর নিজের কাজ ছিল একেবারে নিখুঁত। জমিদারী সংক্রান্ত কাজ তিনি যেমন নিজে দপ্তরে বসে শিক্ষা করেছিলেন ভ্রাতুষ্পুত্র গণেন্দ্রনাথ ও পুত্র জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ইত্যাদি কনিষ্ঠদেরও তেমনি সুচারুরূপে কাজের শিক্ষা দিয়েছেন। তখনকার কালে স্ত্রীশিক্ষার তেমন প্রচলন ছিল না, দেবেন্দ্রনাথ কিন্তু নিজের কন্যাদের ভালভাবে শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা করেন; তাঁদের বেশভূষার প্রতিও তাঁর নজর ছিল। রবীন্দ্রনাথের স্কুলের শিক্ষা গ্রহণে আপত্তি দেখে তিনি তাঁর জন্য অন্য ব্যবস্থা করেন এবং কিছুদিন নিজের সঙ্গে রেখে হিমালয়ে নিয়ে গিয়ে তাঁর মনে জ্ঞানের আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে দেন।

নবজাগরণপর্বে সমাজের যেখানে যে আন্দোলন হয়েছে তার অধিকাংশই ঠাকুর বাড়ীকে কেন্দ্র করে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। অজিত কুমার চক্রবর্ত্তী

বলেছেন—"এই হিন্দুমেলার সঙ্গে সঙ্গে দেবেন্দ্রনাথের বাড়ীর এসময়কার আবহাওয়া সম্বন্ধেও দুএকটা কথা বলা দরকার। দ্বিজেন্দ্রনাথ, গণেন্দ্রনাথ, গুণেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ প্রভৃতি বাড়ীর বয়স্ক যুবাদের তখন সাহিত্য ও ললিত কলায় উৎসাহের সীমা ছিল না। পোষাক পরিচ্ছদে, কাব্যে সাহিত্যে, শিল্পে ও নাট্যে, স্বাদেশীকতায়, সকল বিষয়েই একটি পরিপূর্ণ দেশীয় আদর্শকে জাগাইয়া তুলিবার জন্য তখন তাঁহারা ব্যস্ত। ১৮৬৭ খ্রীঃ গণেন্দ্রনাথ রামনারায়ণ তর্করত্নকে দিয়া 'নব-নাটক' লিখাইয়া বাড়ীতে তাহার অভিনয় করিয়াছিলেন। সে সম্বন্ধে দেবেন্দ্রনাথ তাঁহাকে উৎসাহ জানাইয়া পত্র লিখিতেছেন।" (মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর—অজিত কুমার চক্রবর্ত্তী—৭ম পরিচ্ছেদ—৪৭০ পৃঃ, ইণ্ডিয়ান প্রেস।)

সামাজিক সমস্ত রকম কাজেই মহর্ষির উৎসাহ ছিল অপরিসীম। দেশের লোকের উন্নতির জন্য একত্রিত হওয়া দরকার বলে বিবেচিত হওয়ায় ১৮৫১ খ্রীঃ "বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন' স্থাপিত হয়। দেবেন্দ্রনাথ তার সম্পাদক ছিলেন। ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে বীটন সাহেবের চেষ্টায় বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। দেবেন্দ্রনাথ তৎকালীন নিন্দার ভয় না করে নিজের বাড়ীর মেয়েদের পড়তে পাঠান।

বৃদ্ধ বয়সে সামাজিক অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করবার ক্ষমতা যখন তাঁর ছিল না তখনও তিনি তাঁর অপরিমিত দান দিয়ে সাহায্য করেছেন। তাঁর জীবনীতে আছে—"পার্কষ্ট্রীটে তিনি যতকাল পর্যন্ত ছিলেন ততকাল নানা সম্প্রদায়ের লোক তাঁহার কাছে আসিয়াছে, গিয়াছে—সকলকেই তিনি যথাযোগ্য আদর অভ্যর্থনা ও আশীর্ব্বাদ করিয়াছেন। সকল শুভকাজে তাঁহার দান এসময়ে অবারিত ছিল। কন্‌গ্রেসের জন্য শ্রীযুক্ত ডব্লিউ সি. বাড়ুয্যে, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার কাছে কতবার গিয়াছেন, তিনি কন্‌গ্রেসের খরচের জন্য অকাতরে দান করিয়াছেন। রাজা মহারাজার দল তাঁহাকে প্রণাম করিতে আসিয়াছেন—ধনী দরিদ্র সকলের কাছেই তিনি তখন "মহর্ষি", তিনি ভক্তির পাত্র। দেশের লোকের কাছে তখন তিনি মহাসাধক বলিয়া পূজাই হইয়াছেন। কেহ অর্থী, কেহ প্রার্থী,—নানালোকে নানাভাবে তাঁহার কাছে আসিয়াছে কাহাকেও তিনি ফিরান নাই।" (মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর—অজিত কুমার চক্রবর্ত্তী—৩য় পরিচ্ছেদ, ৬২৮ পৃঃ, ইণ্ডিয়ান প্রেস, এলাহাবাদ।)

অনেক সময় দেখা যায় যাঁরা নিজের ধর্মমতে অত্যন্ত একনিষ্ঠ অন্যের ধর্মমতে

তাঁদের অসহিষ্ণুতা থাকে—অন্যের মতকে যথেষ্ট সম্মান দিতে পারেন না। কিন্তু মহর্ষি এবিষয়ে অত্যন্ত অসাধারণ ছিলেন। তিনি কখনও পরধর্ম সম্বন্ধে কটূক্তি করেননি। নিজে না মেনেও শ্রদ্ধা দেখিয়েছেন। ব্রাহ্মরা যখন ভাগ হয়ে গেলেন, তিনি অন্তরে অত্যন্ত আঘাত পেলেও কোনদিন তাঁদের প্রতি শত্রুভাব রাখেননি। যখনই তাঁরা তাঁর উপদেশ বা অন্য সাহায্য চেয়েছেন তিনি এগিয়ে এসেছেন। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের জমি কেনার পর শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁর কাছে অর্থ সাহায্য চান। দেবেন্দ্রনাথ তাঁকে যত্ন করে খাইয়ে ৭০০ টাকার একখানি চেক দিয়ে বলেন "This is my unconditional gift"। এরকম unconditional gift যে কতজনকে কতভাবে দিয়েছেন তা তাঁর ব্যক্তিগত দানের খাতা দেখলেই বোঝা যায়।

কাণ্ট, ফিক্তে, নিউম্যান, ভিকটর কুঁজ্যা প্রভৃতি দার্শনিকদের দর্শনতত্ত্ব ও স্বদেশীয় বেদ উপনিষদ ইত্যাদি রীতিমত অনুশীলন করে তিনি নিজের ধর্মমত সৃষ্টি করেছিলেন। রক্ষণশীল বলে বদনাম থাকলেও ঔদার্যের সঙ্গে বিচার করেই অন্যদেশের গ্রহণীয় দিকটিকে গ্রহণ করেছেন। সুফি হাফেজের সহজ ভক্তি তাঁকে আকর্ষণ করতো। পুত্র সত্যেন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ ও ভ্রাতুষ্পুত্র গণেন্দ্রনাথের ব্রহ্মসঙ্গীতের সঙ্গে হাফেজের বয়েৎও তাঁর সর্বদার সঙ্গী ছিল।

ব্রাহ্মদের বিবাহ, উপনয়ন, মৃতদেহ সৎকার ও শ্রাদ্ধাদি কি ভাবে নির্বাহ করলে পৌত্তলিকতা না মেনে প্রাচীন ভারতীয় রীতিতে করা যায় তিনি অনেক চিন্তা করে তা বার করেন এবং পরিবারের প্রতিটি কাজ তাঁর পরিকল্পনা অনুযায়ী অনুষ্ঠিত হয়। কোন কাজের ত্রুটি, কোন বিষয়ে অসঙ্গতি তাঁর ভাল লাগতো না। যে কোন উৎসবের আয়োজন করবার জন্যে তিনি দীর্ঘ দিন ধরে মনে মনে পরিকল্পনা তৈরী করেন।

সর্বোপরি, যে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ আধুনিক যুগের মূল-মন্ত্র তাও তাঁর চরিত্রের এক বিরাট বিশেষত্ব। তিনি জোর করে কোন কিছুই করতে চাননি, সে ধর্মের জন্যেই হ'ক বা অন্য বিষয়েই হ'ক। অতবড় পরিবারের কর্তা হয়েও তিনি কখনও নিজের পরিবার পরিজনদের প্রতি জোর করে কোন মত চাপাননি। তাঁর পুত্রদের সঙ্গে সবসময় তাঁর মতের মিল না হলেও তিনি কখনও তা নিয়ে বিরক্তি প্রকাশ করেননি। দ্বিজেন্দ্রনাথের মনে একসময় অদ্বৈতমতবাদ জাগে। দেবেন্দ্রনাথের যদিও এমতে একান্ত আপত্তি তবু পুত্রকে কিছুই

বলেননি। কারণ প্রত্যেক মানুষের স্বাধীন মতবাদের উপর তাঁর আস্থা ছিল। তিনি নিজে স্ত্রীস্বাধীনতার আন্দোলনে যোগ দেননি কিন্তু তিনি বেঁচে থাকতেই তাঁর মধ্যমপুত্র স্ত্রীকে নিয়ে লাটভবনে যান ও বোম্বাইয়ে কর্মস্থলে নিয়ে যান। তিনি প্রকাশ্যে আপত্তি করলে এটা সম্ভব হত না। প্রত্যেককে নিজের মতে চলতে দিয়েছেন বলেই তাঁর ছেলেদের মধ্যে পিতার আধ্যাত্মিকতার আদর্শ অজ্ঞাতসারে কাজ করেছে। অনেক সময় যেমন দেখা যায় ধার্মিকের পুত্ররা অধার্মিক হয়, তা এক্ষেত্রে হয়নি, তার একটি কারণ বোধ হয় তাঁরা নিজেদের পুত্রকে ধার্মিক করার চেষ্টা করেন। তাদের নিজেদের প্রবণতা অনুযায়ী গতি ঠিক করতে দেন না। মহর্ষি কিন্তু কোন ছেলেকে তাঁদের স্বকীয়তা থেকে একটুও নড়াতে চাননি।

ধর্মসাধনা ও সামাজিক নানা কাজে লিপ্ত থেকেও মহর্ষি একজন উঁচুদরের সাহিত্যশিল্পী ও দার্শনিক ছিলেন। তাঁর রচিত 'আত্মতত্ত্ব বিদ্যা', 'ব্রাহ্ম ধর্মের মত ও বিশ্বাস', 'ব্রাহ্ম ধর্মের ব্যাখ্যান', 'জ্ঞান ও ধর্মের উন্নতি' এবং স্বরচিত 'জীবন চরিত' বাংলা সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ—জ্ঞানের জন্যই শুধু নয়, মাধুর্যেও সমান উন্নত।

আধুনিক যুগভাব রামমোহন রায়ের মধ্যে দুটিভাবে ফুটে উঠেছিল—ব্রহ্মোপাসনা সকল সাধনার মূল বা কেন্দ্র স্বরূপ এবং জাতীয়ভাবে সার্বজনীন বা সার্বজনীনভাবে ভারতীয় হওয়া। তেমনি এই দুটি আদর্শের লক্ষণ দেবেন্দ্রনাথের মধ্যেও ফুটেছিল।

এই সব অসাধারণ গুণের জন্য তিনি মহর্ষি, আর তাঁর পুত্ররাও জগতের জ্ঞানী গুণী সভায় সমাদৃত। নবজাগরণপর্বে প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর তাঁর শিক্ষা সংস্কৃতি নেতৃত্ব ও দান দিয়ে সমাজ ও পরিবারের মধ্যে যে উন্নত ভাবধারা এনে দেন, দেবেন্দ্রনাথ তাঁর আধ্যাত্মিকতা ও স্থৈর্য দিয়ে তাকে আরও উন্নত পর্যায়ে তুলে ধরেন। আর এইখানেই তাঁর আধ্যাত্মিক জীবন, পারিবারিক জীবন ও সামাজিক জীবনের পরম সমন্বয় ও সার্থকতা।

॥ ৯ ॥

॥ দেবেন্দ্রনাথের সন্তানদের সামাজিক অবস্থা ও ধর্মমত ॥

॥ সন্তানদের উপর মহর্ষির প্রভাব ॥

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর বৃহৎ একান্নবর্তী পরিবারের উপযুক্ত অভিভাবক ছিলেন। তাঁর জীবনী আলোচনা করে দেখা যায়, নিজের মত ও পথে আনবার জন্য তিনি কারও উপর জোর তো করেননি, এমনকি কোন আদেশ নির্দেশের বাঁধনও ছিল না। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদে বিশ্বাসী এই মণীষী কিন্তু তাঁর মনের ইচ্ছা, বিশ্বাস ও আগ্রহকে তবুও সমস্ত পরিবারের মধ্যে সঞ্চারিত করতে সমর্থ হয়েছিলেন। তাঁর সুসংযত আচরণ, ব্যক্তিত্ব ও ধর্মনিষ্ঠা তাঁর পুত্রদের জীবনে যে কতখানি প্রভাব বিস্তার করেছিল একটু সচেতনভাবে লক্ষ্য করলেই তা বোঝা যায়।

মহর্ষিদেবের অনেকগুলি পুত্রকন্যা। তাঁদের অনেকেই অল্প বয়সে পরলোক গমন করেন। তাই তাঁর চরিত্রের প্রভাব প্রধানতঃ চার পুত্রের উপরই লক্ষ্য করা যায়। কারণ এই চারজনই দীর্ঘকাল বেঁচেছিলেন এবং পিতার কর্মধারার ধারক ও বাহক হিসাবে নিজেদের কর্মময় জীবনে সুপ্রচুর কাজ রেখে গিয়েছেন।

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সন্তানদের সামাজিক পরিস্থিতি ও ধর্মমত নিয়ে আলোচনা করতে হলে তাঁর চার পুত্র দ্বিজেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্র নাথ ও রবীন্দ্রনাথের জীবন ও কর্মধারার আলোচনা করা দরকার। এঁদের মধ্যেই আর সকলের মতবাদও প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষভাবে পরিস্ফুট এবং মহর্ষিদেবের প্রভাবও সবথেকে বেশী পড়েছে এই চারজনের উপরই। বাকি আর কয়জনের মধ্যে তৃতীয় পুত্র হেমেন্দ্রনাথের কথাও বলা যায়।

(১৮৪৪-৮৪) হেমেন্দ্রনাথ মাত্র ৪০ বৎসর জীবিত ছিলেন। তিনি কেশবচন্দ্র সেনের অনুরক্ত ছিলেন। জীবনস্মৃতিতে রবীন্দ্রনাথ এঁর সম্বন্ধে বলেছেন "যখন চারিদিকে খুব করিয়া ইংরাজী পড়াইবার ধুম পড়িয়া গিয়াছে তখনি যিনি সাহস করিয়া আমাদিগকে দীর্ঘকাল বাংলা শিখাইবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, সেই আমাদের সেজদাদার উদ্দেশ্যে সকৃতজ্ঞ প্রণাম নিবেদন

করিতেছি।" (জীবনস্মৃতি—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—রচনাবলী জন্মশতবার্ষিক, ১০ম খণ্ড—৩১ পৃঃ।)

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহর্ষিদেবের জ্যেষ্ঠ পুত্র। তাঁর জন্ম হয়—২৯শে ফাল্গুন ১৭৬১ শক (১১ মার্চ্চ. ১৮৪০)। তাঁর নিজের লেখা 'পুরাতন প্রসঙ্গ', ২য় পর্যায় থেকে জানা যায় যে শৈশবে তাঁদের বাড়ীতে ভালরকম শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। পরে সেণ্টপলস স্কুলের থেকে স্কলারশিপ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে প্রেসিডেন্সী কলেজে প্রবেশ করেন। কিন্তু "পাশ করিবার জন্য পড়িতে হইবে এ আমি কিছুতেই সুবিধা করিতে পারিলাম না।" মহর্ষি নিজে হিন্দুকলেজ থেকে অল্পদিন পরেই পড়া ছেড়ে চলে আসেন। তবে অত্যধিক অধ্যয়নস্পৃহা, জানবার অদম্য আগ্রহ এবং গৃহে পাঠের উপযোগী পরিবেশ ও আর্থিক সঙ্গতি থাকায় তাঁর উচ্চশিক্ষার পথ আরও প্রশস্ত হয়। তাঁর পুত্রদের বেলায়ও এই নিয়ম সম্পূর্ণ কার্যকরী হয়েছিল। দ্বিজেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথ স্কুল কলেজে খুব বেশীদিন পড়াশোনা না করেও গৃহে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। তাঁদের বহুমুখী জ্ঞানস্পৃহা ও তার জন্য পরিশ্রম দেখলে বিস্মিত হতে হয়। দ্বিজেন্দ্রনাথ কলেজের পড়াশোনা বছরখানেক চালিয়ে সিপাহী বিদ্রোহের আগে ছেড়ে দিয়েছিলেন। ১৮৫৮ খ্রীঃ ১৮ বৎসর বয়সে সর্বসুন্দরী দেবীর সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়।

বাল্যকাল থেকেই দ্বিজেন্দ্রনাথ বাংলা কবিতা রচনা করতেন। চিত্রাঙ্কনেরও ঝোঁক ছিল কিন্তু সেদিকে ঠিকমত মনযোগ না দেওয়ায় উন্নতি সম্ভব হয়নি।) সংস্কৃত সাহিত্যে দ্বিজেন্দ্রনাথ বিশেষ পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। ২০ বৎসর বয়সে তাঁর মেঘদূতের পদ্যানুবাদ প্রকাশিত হয়। ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ 'স্বপ্নপ্রয়াণ' রচিত হয়েছিল। এরপর কিছুদিন তিনি তত্ত্বজ্ঞানের জটিল আলোচনায় বিভোর হয়েছিলেন ও চারখণ্ড 'তত্ত্ববিদ্যা' রচনা করেন।

বাংলা সাহিত্যে দ্বিজেন্দ্রনাথের রচনাসম্ভার বিস্ময়ের উদ্রেক করে। কেবল কাব্য বা দার্শনিক গ্রন্থই নয়, নানাবিষয়ের আলোচনা সমন্বিত প্রবন্ধ, বাংলায় শর্টহ্যাণ্ডের বই, জ্যামিতির বই, অনেকগুলি গল্পের বই, ধর্ম বিষয়ক আলোচনা ও ব্রাহ্মসঙ্গীত তিনি রচনা করেছিলেন। এছাড়া তাঁর লেখা কয়েকখানি ইংরাজী বইয়েরও সন্ধান পাওয়া যায়।

দ্বিজেন্দ্রনাথের বহুমুখী প্রতিভা; কেবল রচনা করেননি অন্যকে রচনার পথও দেখিয়েছেন। তিনি সুদীর্ঘকাল 'ভারতীর' সম্পাদক ছিলেন। অবশ্য 'ভারতী'

প্রকাশের ইচ্ছা ও প্রকৃত সম্পাদনা জ্যোতিরিন্দ্রনাথই করতেন, তবুও 'ভারতীর' নামকরণ ও অন্যান্য বহু আলোচনায় আমরা দ্বিজেন্দ্র-প্রতিভার পরিচয় পাই।

'ভারতীব' সম্পাদকের আসন থেকে বিদায় গ্রহণ করে কয়েকমাসের মধ্যে দ্বিজেন্দ্রনাথ 'তত্ত্ববোধিনী'র সম্পাদনাভার গ্রহণ করেন। 'তত্ত্ববোধিনী'র পৃষ্ঠায় তাঁর বহু সুচিন্তিত রচনা প্রকাশিত হয়। ১৯৮১ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিজেন্দ্রনাথের চেষ্টায় ও সম্পাদনায় 'হিতবাদী' পত্রিকা বার হয়।

বিদ্যার উন্নতিকল্পে নানা সভা সমিতির সঙ্গে দ্বিজেন্দ্রনাথের যোগ ছিল। ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে ১৮ই এপ্রিল জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ীতে 'বিদ্বজ্জন-সমাগম' নামে বার্ষিক সাহিত্যিক সম্মিলনের প্রথম অনুষ্ঠান হয়, আর দ্বিজেন্দ্রনাথই ছিলেন এর প্রধান উদ্যোক্তা। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথের চেষ্টায় খুব অল্পদিনের জন্য 'সারস্বত সমাজ' নামে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের আলোচনা সভা স্থাপিত হয়েছিল। তাতে দ্বিজেন্দ্রনাথ সহসভাপতি ছিলেন। ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার 'ইণ্ডিয়ান সায়েন্স এসোসিয়েশন' প্রতিষ্ঠায় অগ্রসর হলে দ্বিজেন্দ্রনাথ ও গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর এক হাজার টাকা করে চাঁদা দেন। ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতায় থিয়োসফিক্যাল সোসাইটির বঙ্গীয় শাখা স্থাপিত হলে দ্বিজেন্দ্রনাথ তার সহ-সভাপতি নিযুক্ত হন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে ১৩৩১ সালে দ্বিজেন্দ্রনাথ বিশেষ সদস্য নির্ব্বাচিত হন এবং পরে ১৩০৪ সাল থেকে ১৩০৬ এই কয় বছর এই প্রতিষ্ঠানেব সভাপতি ছিলেন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের উদ্যোগে ১৩২০ সালের ২৭-২৯এ চৈত্র কলকাতা টাউন হলে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের ৭ম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এই সভার মূল সভাপতি ছিলেন দ্বিজেন্দ্রনাথ।

কেবল সরস্বতীর অর্চ্চনাতেই যে তাঁর একাগ্রতা ছিল তাই নয়। তিনি ছিলেন খাঁটি স্বদেশী। স্বদেশপ্রীতির বশবর্তী হয়েই তিনি হিন্দু মেলার আয়োজনে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেন। ১৮৬৭ খ্রীঃ ১২ই এপ্রিল চৈত্র সংক্রান্তির দিন দ্বিজেন্দ্রনাথের পরামর্শে, নবগোপাল মিত্রের উদ্যোগে, গণেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আনুকূল্যে ও উৎসাহে এই স্বদেশীমেলার প্রতিষ্ঠা হয়। দ্বিজেন্দ্রনাথ চারবছর এই মেলার সম্পাদকতা করেন। এই সময় তাঁর বিখ্যাত স্বদেশী সঙ্গীতও রচিত হয়। দ্বিজেন্দ্রনাথের অনেকগুলি ব্রহ্মসঙ্গীতও আছে। তিনিই বাংলায় প্রথম স্বরলিপি রচনা করেন।

আদি ব্রাহ্ম সমাজের সঙ্গে তিনি আমরণ যুক্ত ছিলেন। ১৮৬৪-৭১, এই

ছয় বছর যোগ্যতার সঙ্গে এই প্রতিষ্ঠানের সম্পাদকের পদে কাজ করেছিলেন। ১৮৮১-তে আদি ব্রাহ্ম সমাজের একজন ট্রাষ্টি, ১৮৯০ থেকে আচার্য, ১৮৯৯ থেকে সভাপতি এবং ১৯০৪ থেকে আচার্য ও সভাপতি নিযুক্ত হয়েছিলেন।

দ্বিজেন্দ্রনাথের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে আলোচনা করলে দেখা যায় যে তাঁর জীবন খুব ঘটনাবহুল ছিল না বটে, কিন্তু সারাজীবন বিদ্যাচর্চ্চাতেই অতিবাহিত হয়েছে। তিনি বৈয়াকরণ, দার্শনিক ও কবি ছিলেন, তবে সাধারণের কাছে তিনি "স্বপ্নপ্রয়াণের" কবি হিসাবেই বিখ্যাত। প্রচুর ঐশ্বর্যের মধ্যে জীবন কাটালেও তিনি একরকম সর্বত্যাগী ছিলেন। সরলাদেবী এপ্রসঙ্গে লিখেছেন— "পিতৃদত্ত মাসহারার সবটাই জ্যেষ্ঠপুত্র দ্বীপেন্দ্রনাথের হাতে যেত, নিজে কিছুই রাখতেন না। দ্বীপেন্দ্রনাথই পরিবারে তা যথাসম্ভব বণ্টন করতেন। তাঁর নিয়মিত আহার বস্ত্রের কোন অপ্রতুল হত না। কিন্তু একটি কাম্য বস্তুর অভাব মধ্যে মধ্যে অনুভব করতেন—সেটি লেখার জন্য ও বাক্স তৈরীর কাগজ। একদিন শুনি যোড়াসাঁকোতে তাঁর চাকরকে কাকুতি মিনতির স্বরে বলছেন— 'দ্বীপুকে গিয়ে বলিস আজ যদি আমায় একটা দোয়ানি দেন আমি একখানা খাতা আনাই'। একটি দোয়ানির ভিখারী লক্ষপতি! এই নির্লোভ নির্লিপ্ত যোগীপুরুষের নিষ্কামতার না তাঁর শিশুসুলভ নির্ব্বিষ পরম সহৃদয়তার বর প্রার্থনা করব জানিনা।" (ভারতী-মাঘ ১৩৩২—সাহিত্য সাধক চরিতমালা-ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ২য় সংস্করণ—২৬ পৃঃ।)

অবনীন্দ্রনাথ লিখেছেন—"তারপর জ্যাঠামশায়ের আমলে তিনি বসলেন সেখানে। কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য, বড় বড় পণ্ডিত ফিলসফার আসতেন। স্বপ্নপ্রয়াণ পড়া হবে, এ বারান্দা থেকে ছুটলেন বাবা মশায়রা সে বারান্দায়। থেকে থেকে জ্যাঠামশায়ের হাসির ধ্বনি পাড়া মাত করে দিত। সে হাসির ধুম আমরাও কানে শুনতুম।" (জোড়াসাঁকোর-ধারে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও রাণী চন্দ—প্রথমসংস্করণ ৬৩ পৃঃ। বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়।)

দ্বিজেন্দ্রনাথ শেষ জীবন শান্তিনিকেতনে কাটান। তিনি এমনি অমায়িক প্রকৃতির লোক ছিলেন যে তাঁর সঙ্গে পরিচিত সকলেই তাঁর অনুগত হয়ে যেতেন। স্বর্ণময়ী দেবীর লেখা থেকে জানা যায় পরিবারের সকলের প্রতি তাঁর গভীর মমতা ছিল। পিতার মৃত্যুর পর ১৯০৭ থেকে শান্তিনিকেতনে বসবাস আরম্ভ করেন এবং ১৯২৬-২৯ শে জানুয়ারী সেখানেই পরলোকগমন করেন।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও সারদা দেবীর দ্বিতীয় পুত্র সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জুন জন্মগ্রহণ করেন। ছোট বয়সে গৃহশিক্ষকের কাছে ইংরাজী বাংলা সংস্কৃত ইত্যাদি শিক্ষা করে ৭ বৎসর বয়সে হিন্দু কলেজে ভর্ত্তি হন। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে •প্রথম এনট্রান্স পরীক্ষা হয় এবং সেই বছর সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য ইত্যাদি কয়েকজন কৃতি ছাত্র প্রথম বিভাগে এনট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। উচ্চশিক্ষার জন্য তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজে প্রবেশ করেন। ১৮৫৯ খ্রীঃ অষ্টমবর্ষীয়া জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর সঙ্গে সত্যেন্দ্রনাথের বিবাহ হয়। প্রেসিডেন্সী কলেজে পাঠ করার সময়ই সত্যেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মসমাজের কাজে মেতে ওঠেন। কেশবচন্দ্র সেন তাঁর মধ্যস্থতায় দেবেন্দ্রনাথের সংস্পর্শে আসেন। ১৮৫৯ সেপ্টেম্বরে সত্যেন্দ্রনাথকে ও কেশবচন্দ্র সেনকে নিয়ে দেবেন্দ্রনাথ সিংহল ভ্রমণে যান। ঐ বছরই দেবেন্দ্রনাথ ও কেশবচন্দ্র ব্রাহ্মসমাজের যুগ্ম-সম্পাদক ও সত্যেন্দ্রনাথ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদক নিযুক্ত হন। ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে সত্যেন্দ্রনাথ ও তাঁর বন্ধু মনমোহন ঘোষ সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা দেবেন বলে বিলাত যাত্রা করেন। পরীক্ষায় সাফল্য লাভের পর ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দের শেষ দিকে তিনি দেশে ফিরে আসেন। কয়েকদিন পরে সস্ত্রীক জলপথে কর্মস্থান বোম্বাই যাত্রা করেন। ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিলে তিনি আমেদাবাদের কালেক্টর ও ম্যাজিস্ট্রেট হন এবং সুদীর্ঘ ৩৩বৎসর যোগ্যতার সঙ্গে রাজকার্য নির্ব্বাহ করে ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের প্রথমে কাজ ছেড়ে আসতে বাধ্য হন।

১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দের হিন্দুমেলা প্রতিষ্ঠিত হয়। পর বৎসর ঐ মেলায় গাইবার জন্য সত্যেন্দ্রনাথ একটি স্বদেশী গান লেখেন। গানটি তৎকালে খুবই প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। রাজকার্য থেকে অবসর গ্রহণের অল্পদিন পরে সত্যেন্দ্রনাথ নাটোরে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের সম্মিলনের ১০ম অধিবেশনের সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৩০৭ ও ১৩০৮ সনে সত্যেন্দ্রনাথ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করেছিলেন।

"সরকারী কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণের পর সত্যেন্দ্রনাথ জীবনের শেষদিন পর্যন্ত আদি ব্রাহ্মসমাজের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। তিনি ২ ফাল্গুন ১৮২৭ শক (ইং ১৯০৬) হইতে আচার্য এবং ১ শ্রাবণ ১৮২৯ শক (ইং ১৯০৭) হইতে বড়দাদা দ্বিজেন্দ্রনাথের সহিত আচার্য ও সভাপতি নিযুক্ত হন।" (সাহিত্য সাধক চরিতমালা—৬৭নং, ১ম সংস্করণ-২৫পৃঃ-ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়)

সত্যেন্দ্রনাথ ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দের ২৫শে ডিসেম্বর থেকে ১৮৬২র মার্চ্চ বিলাত যাবার আগে পর্যন্ত তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদনা করেন। ১৯০৯ এর এপ্রিল থেকে ১৯১০ এর এপ্রিল এই একবছর আবার সম্পাদনার ভার গ্রহণ করেন। ১৯১৫ এর এপ্রিল থেকে ১৯২৩ এর জানুয়ারী পর্যন্ত ক্ষিতিন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে 'তত্ত্ববোধিনী'র যুগ্ম সম্পাদক ছিলেন।

সত্যেন্দ্রনাথ অনেকগুলি ব্রহ্মসঙ্গীত রচনা করেন। আর গানগুলি খুবই জনপ্রিয়তা অর্জন করে।

সত্যেন্দ্রনাথ বোধহয় মহর্ষিদেবের একমাত্র পুত্র যিনি প্রচলিত স্কুল কলেজের পড়াশোনায় আপত্তি না জানিয়ে কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়েছেন। যদিও তিনি ভারতের প্রথম সিবিল সার্ভিস পরীক্ষা উত্তীর্ণ ব্যক্তি তবুও বাংলা সাহিত্যে তাঁর অবদান নিতান্ত কম নয়। যে স্ত্রীস্বাধীনতা তাঁর জীবনের ব্রত ছিল তার উপর তিনি একটি বই লেখেন। এছাড়া মহারাষ্ট্রীয় সাধকদের কথা তিনিই প্রথম বাংলায় লেখেন। তাঁর 'গীতা' ও 'মেঘদূত'এর পদ্যানুবাদ, আমার বাল্যকথা ও 'বোম্বাই প্রবাস' এবং 'বৌদ্ধধর্ম' সুবিদিত। সংস্কৃত সাহিত্যেও সত্যেন্দ্রনাথের অসাধারণ অধিকার ছিল। ইংরাজীতেও তাঁর কয়েকখানা বই আছে।

স্ত্রীস্বাধীনতার জন্য সত্যেন্দ্রনাথ অত্যন্ত আগ্রহী ছিলেন। প্রাচীনপন্থী বাড়ীর পর্দা তিনিই প্রথম সরিয়ে দেন। সেজন্যে তখন তাঁকে বেশ কিছুটা জোর দেখাতে হয়। অন্তঃপুরের মহিলাদের শিক্ষা, সংস্কৃতির জন্য তিনি অত্যন্ত আগ্রহী ও উৎসাহী ছিলেন। অবনীন্দ্রনাথ লিখেছেন—"তারপর মেজোজ্যাঠামশায়ের পার্টি, আমরা 'রাজা ও রাণী' অভিনয় করেছিলুম।...... দেবদত্ত সেজেছিলেন মেজোজ্যাঠামশাই, সুমিত্রা মেজজ্যাঠাইমা, রাজা রবিকাকা, ত্রিবেদী অক্ষয় মজুমদার, কুমার প্রমথ চৌধুরী, ইলা প্রিয়ম্বদা, সেনাপতি নিতুদা"—(ঘরোয়া-অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও রাণী চন্দ-৯০ পৃঃ, ২য় সংস্করণ, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়।)

'ঘরোয়া'তেই আর এক জাগায় আছে তিনি তাঁর কন্যা ভ্রাতুষ্পুত্রী সকলকে নিয়ে থিয়েটার করেছেন। রবীন্দ্রনাথ জীবনস্মৃতিতে লিখেছেন—"বিলাত যাত্রার পূর্বে মেজদাদা আমাকে প্রথমে আমেদাবাদে লইয়া গেলেন। তিনি সেখানে জজ ছিলেন। আমার বউঠাকুরুণ ও ছেলেরা তখন ইংল্যাণ্ডে, সুতরাং বাড়ী একপ্রকার জনশূন্য ছিল।" (জীবনস্মৃতি-আমেদাবাদ-রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—রচনাবলী জন্মশতবার্ষিক, ১০ম, খণ্ড-৭২ পৃঃ)। আজকের

দিনেও শিক্ষার জন্য এতখানি ঔদার্য ও ত্যাগ খুব সুলভ নয়, আর সেদিনে তো স্বপ্নের কথা ছিল।

সত্যেন্দ্রনাথের কর্মত্যাগের পর বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস সম্মেলনে রাজসাহী যান। সেবার ভূমিকম্পে উত্তর বঙ্গে অনেক ক্ষতি হয়েছিল। বহু দালান বাড়ী পড়ে যায়, মাটি ফেটে রেললাইন ইত্যাদির ক্ষতি হয়েছিল। বড় ভূমিকম্পের পরও কদিন ধরে মাঝে মাঝেই অল্প অল্প ঝাঁকি হ'ত। অবনীন্দ্রনাথ তাঁর ঘরোয়া বইয়ে বলেছেন সেই জন্যে তাঁরা প্রায় সকলে এবং রবীন্দ্রনাথ খড়ের কাছারী ঘরে থাকা ঠিক করেন। কিন্তু—"মেজজ্যাঠামশায় অদ্ভুত লোক, কিছুতেই মানলেন না। তিনি বললেন, 'আমি ওই আমার ঘরেতেই থাকব, আমি কোথাও যাবনা।" (ঘরোয়া-অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও রাণী চন্দ—৬৬ পৃঃ বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ২য় সংস্করণ)। এখানে তাঁর ভীতিহীন বেপরোয়াভাব লক্ষ্য করা যায়।

৯ই জানুয়ারী ১৯২৩-৮১ বৎসর বয়সে কলকাতায় সত্যেন্দ্রনাথের মৃত্যু হয়।

১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা মে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জন্ম হয়। অন্য সব ভাইয়েদের মত তিনি বাড়ীতে কিছুদিন শিক্ষা লাভ করে স্কুলে ভর্ত্তি হন। মহর্ষির তৃতীয় পুত্র হেমেন্দ্রনাথের কঠোর শিক্ষা ব্যবস্থায় জ্যোতিরিন্দ্রনাথের পড়াশোনার প্রতি আগ্রহ কমে যায়। তিনি প্রথমে সেণ্টপলস্ স্কুলে তারপর মণ্টেগু একাডেমি ও শেষে হিন্দু স্কুলে পড়েন। ১৮৬৪ খ্রীঃ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ দ্বিতীয় বিভাগে এনট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে উচ্চশিক্ষার জন্য প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্ত্তি হন।

সত্যেন্দ্রনাথ ছুটিতে কাশীপুরের বাগান বাড়ীতে বন্ধু মনমোহন ঘোষের সঙ্গে সস্ত্রীক বাস করছিলেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথও সেই সময় তাঁদের কাছে ছিলেন। তিনি তাঁর নিকটবর্ত্তী এফ-এ পরীক্ষার পড়া ছেড়ে মনমোহন ঘোষের কাছে ফরাসী ভাষা শিক্ষা করতে থাকেন। মেজ বৌঠাকুরাণীর কাছ থেকে বোম্বায়ের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের গল্প শুনে সেই দেশ দেখার জন্য ব্যাকুল হন এবং সত্যেন্দ্রনাথ ছুটির পর কর্মস্থলে ফিরবার সময় তিনিও সঙ্গে যান। সেখানে তাঁর জন্য সত্যেন্দ্রনাথ ফরাসী ভাষা, অঙ্কন বিদ্যা ও সেতার শিক্ষার ব্যবস্থা করেন।

১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই জুলাই জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সঙ্গে কাদম্বরী দেবীর বিবাহ হয়।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথও তাঁর দাদাদের মত আদি ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে যুক্ত

ছিলেন। ১৮৬৯ থেকে ১৮৮৪ এর আগই পর্যন্ত এই সমাজের সম্পাদক ছিলেন। ব্রাহ্মধর্মের মূলকথা শাস্ত্র ও যুক্তি দ্বারা সাধারণকে বোঝাবার জন্য 'ব্রাহ্মধর্ম বোধিণী সভা' নামে একটি সভা হয়। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও নবগোপাল মিত্র এর সম্পাদক ছিলেন।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ প্রচুর ব্রহ্মসঙ্গীত রচনা করেন এবং আদি ব্রাহ্মসমাজের ব্রহ্মসঙ্গীতের স্থায়িত্ব ও উন্নতি সাধনের জন্য সমাজ মন্দিরের উপর তলায় যে সঙ্গীত বিদ্যালয় খোলা হয় (১৮৭৫-৪ঠা জুন) তিনি তার সম্পাদক ছিলেন।

সত্যেন্দ্রনাথ বিলাত থেকে ফিরে ক্রমে ক্রমে অবরোধ প্রথার উচ্ছেদ করেন এবং জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এই মতের সমর্থক হন। তিনি নিজেই লিখেছেন "মেজদাদা (সত্যেন্দ্রনাথ) বিলাত হইতে ফিরিয়া আমাদের পরিবারের যখন আমূল পরিবর্ত্তনের বন্যা বহাইয়া দিলেন, তখন আমারও মতের পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল। তখন হইতে আর আমি অববোধ প্রথার বিরোধী নহি, বরং ক্রমে ক্রমে একজন সেরা নব্যপন্থী হইয়া উঠিলাম। ইহারই কিছুদিন পূর্বে স্ত্রীস্বাধীনতার উপর কটাক্ষপাত করিয়া আমি 'কিঞ্চিৎ জলযোগ' লিখিয়াছিলাম বলিয়া অত্যন্ত দুঃখিত ও অনুতপ্ত হইয়াছিলাম। সেই জন্য 'কিঞ্চিৎ জলযোগে'র দ্বিতীয় সংস্করণ আর আমি ছাপাই নাই। স্ত্রীস্বাধীনতার শেষে আমি এতবড় পক্ষপাতী হইয়া পড়িলাম যে গঙ্গার ধারের কোন বাগান বাড়ীতে সস্ত্রীক অবস্থানকালে আমার স্ত্রীকে আমি নিজেই অশ্বারোহন পর্যন্ত শিখাইতাম। তাহার পর জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে আসিয়া দুইটি আরব ঘোড়ায় দুইজনে পাশাপাশি চড়িয়া বাড়ী হইতে গড়ের মাঠ পর্যন্ত প্রত্যহ বেডাইতে যাইতাম।" (জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি—সাহিত্য সাধক চরিতমালা—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ১ম সংস্করণ-৬৮নং-১৯ পৃঃ। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ।)

'কিঞ্চিৎ জলযোগ' প্রকাশের অল্পদিন পরেই জ্যোতিরিন্দ্রনাথের উপর জমিদারী পরিদর্শনের ভার পড়ে। প্রজারঞ্জক জমিদার বলে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের খ্যাতি ছিল।

অল্প বয়স থেকেই জ্যোতিরিন্দ্রনাথ অত্যন্ত আমোদ প্রমোদ প্রিয় ও নাট্য উদ্যোগী ছিলেন। খুড়তুতো ভাই গুণেন্দ্রনাথ ও তিনি সবদা একত্র পড়াশোনা ও অন্যান্য আয়োজনে মাততেন। বাংলায় অদ্ভুত নাট্য নাই মনে হওয়ায়— জ্যোতিরিন্দ্রনাথ হাসির গান যোগাড় করে এক 'অদ্ভুত নাট্য' খাড়া করে অভিনয় করেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও গুণেন্দ্রনাথের আগ্রহে ও পরে বাড়ীর

অন্যান্য বড়দের সমর্থনে রামনারায়ণ তর্করত্ন রচিত 'নবনাটক' জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও অন্যান্য ছেলেদের দ্বারা অভিনীত হয়। 'বিদ্বজ্জন-সমাগমের' অনুষ্ঠানেএকবার রবীন্দ্রনাথের কালমৃগয়া অভিনীত হয়। তাতে রবীন্দ্রনাথ অন্ধমুনি ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ দশরথের ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। এ সভার অনুষ্ঠানেই বোধ হয় জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'মানময়ী' গীতিনাটিকা ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে এবং 'হঠাৎ নবাব' প্রহসন ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে অভিনয় করা হয়েছিল।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের অভিনয়ের যেমন ঝোঁক ছিল তেমনি নাটক রচনারও এক অফুরন্ত উৎস ছিল। ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে 'পুরুবিক্রম,' 'সরোজিনী' 'অশ্রুমতী' ইত্যাদি ঐতিহাসিক নাটক ও 'এমন কর্ম আর করব না' প্রহসন সাধারণ রঙ্গালয়ে অভিনীত হয় এবং অত্যন্ত সমাদর লাভ করে। তিনি ভাল ফরাসী ভাষা জানতেন। তাই ফরাসী সাহিত্য থেকে বহু নাটক, ভ্রমণ কাহিনী, প্রহসন ইত্যাদি অনুবাদ করেন। নানা বিষয়ে তাঁর বহু প্রবন্ধ, ইংরাজী সাহিত্য থেকে অনুবাদ, মারাঠা সাহিত্য থেকে অনুবাদ, শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা রহস্য, বহু সংস্কৃত নাটকের অনুবাদ ও সঙ্গীত শাস্ত্র সম্বন্ধে কয়েকখানি মূল্যবান গ্রন্থ রচিত হয়। তাঁর বিপুল রচনা সম্ভার কেবল আকারে বড় নয়, বৈচিত্র্যেও বিস্ময়কর। পরিণত বয়সে তাঁর ফ্রেনলজি বিদ্যাচর্চ্চার ফল স্বরূপ কয়েকখানি ফ্রেনলজির মূল্যবান বইও আছে।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সব থেকে উল্লেখযোগ্য গুণ স্বাদেশিকতা। হিন্দুমেলার দ্বিতীয় অধিবেশনে তিনি নবগোপাল মিত্রের অনুরোধে একটি স্বদেশী সঙ্গীত রচনা করেন। তাছাড়া তাঁর নাটকে, আলোচনায়, চিঠিপত্রে ও পত্রিকা সম্পাদনার মধ্যে সর্বত্র তাঁর স্বদেশপ্রীতির পরিচয় পাওয়া যায়। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের উদ্যোগে রাজনারায়ণ বসুকে সভাপতি করে রবীন্দ্রনাথ ও বাড়ীর আরও কিছু ছেলে মিলে 'সঞ্জীবনী সভা' স্থাপন করেন। এই সভার উদ্দেশ্য ছিল পরাধীন ভারতকে স্বাধীন করা। কি করে করতে হবে তা ঠিকমত না জানলেও আন্তরিকতার অভাব ছিল না। স্বদেশী শিল্পের প্রতি অনুরাগ বশতঃ দিয়াশলাই নির্মান করার ব্যবস্থা করতে গিয়ে একবার তাঁরা বিফল হন। তাঁত চালাতে গিয়েও একটি গামছার বেশী কিছু করতে পারেননি। শিকার শিক্ষার মধ্য দিয়ে শরীর চর্চ্চার চেষ্টাও করেছিলেন, কিন্তু কোনটাই অভিজ্ঞতার অভাবে সার্থক হতে পারেনি। সভাও

অল্পদিন পরে উঠে যায়। তবে স্বাদেশিকতার যে আবহাওয়া সৃষ্টি করতে পেরেছিলেন তার মূল্য নির্দ্ধারণ করা যায় না।

অল্পকিছুদিনের জন্য জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাঁর ভগ্নীপতি জানকীনাথ ঘোষালের সঙ্গে পাটের ব্যবসাও করেন। পরে সেই টাকা নিয়ে শিলাইদহে নীলের চাষ করেন। জার্মান নীল আবিষ্কৃত হওয়ায় সে ব্যবসায় বন্ধ হয়ে যায়। নীলের ব্যবসায়ে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের যে অর্থাগম হয়েছিল তা দিয়ে তিনি নিলামে একটি জাহাজের খোল কেনেন। তারপর সে খোলে এঞ্জিন ইত্যাদি বসিয়ে 'সরোজিনী' নাম দিয়ে চালু করা হয়। পরে 'বঙ্গলক্ষ্মী', 'স্বদেশী', 'ভারত' ও 'লর্ড রিপন' নামের আরও কয়েকটি জাহাজ কেনেন। খুলনা বরিশালে যাত্রী নিয়ে এই জাহাজগুলো যাতায়াত করতো। এই ব্যবসাও বেশীদিন চলেনি। ফ্লোটিলা কোম্পানীর সঙ্গে প্রতিযোগীতায় না পেরে তিনি শেষ পর্যন্ত অনেক ক্ষতি স্বীকার করে থামতে বাধ্য হন। রবীন্দ্রনাথের 'জীবনস্মৃতি'তে আমরা 'সঞ্জীবনী সভা' ও জাহাজের বিস্তৃত বিবরণ পাই।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের একান্ত চেষ্টায় ও যত্নে 'ভারতী' পত্রিকা প্রচারিত হয়। 'ভারতীর' সম্পাদক ছিলেন দ্বিজেন্দ্রনাথ কিন্তু প্রকৃত পক্ষে জ্যোতিরিন্দ্রনাথই এটির সমস্ত দায়িত্ব বহন করতেন। খুব অল্পদিনের জন্যই জ্যোতিরিন্দ্রনাথ আয়োজিত 'সারস্বত সমাজে'র সাহিত্য সমালোচনা সভার অনুষ্ঠান হয়। দেশের গণ্যমান্য লোকদের নিয়ে অনুষ্ঠান করতে বিদ্যাসাগর মশাই নিষেধ করলেও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাঁদের আহ্বান করেন এবং বিদ্যাসাগরমশাইয়ের কথা মত। অল্পদিনেই সভা উঠে গেল। ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দের ১৯শে এপ্রিল জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্নী কাদম্বরী দেবী হঠাৎ আত্মহত্যা করেন। সাহিত্য অনুরাগী কাদম্বরী দেবীর মৃত্যুতে দ্বিজেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ইত্যাদি 'ভারতী'র পরিচালকেরা 'ভারতী' প্রকাশ বন্ধ করে দেন।

স্ত্রী বিয়োগের পর বোধহয় মনের শূন্যতা চাপা দেবার জন্য জ্যোতিরিন্দ্রনাথ নানা বিষয়ে মনঃসংযোগের চেষ্টা করেন। কিছুদিন ফ্রেনলজি চর্চ্চায় সময় কাটান। তারপর বেশ কিছুদিন পুণায় ছিলেন,—সেখানে মারাঠী ভাষা শিক্ষা করেন এবং পরে কয়েকটি মারাঠী বইয়ের অনুবাদ করেন।

১৩০৯-১০এ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের অন্যতম সহ সভাপতির পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের শৈশবকাল থেকে চিত্রাঙ্কনে অত্যন্ত আগ্রহ ছিল।

রবীন্দ্রনাথের নানাবয়সের ছবি ড্রয়িং করে রেখেছিলেন। ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে রবীন্দ্রনাথ বিলাতে সেগুলি চিত্রশিল্পী রোথেনষ্টাইনকে দেখান। রোথেনষ্টাইন ছবিগুলির উচ্চ প্রশংসা করেন এবং পরে তাঁর আগ্রহে ও চেষ্টায় ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে ঐ শিল্পীর ভূমিকাসহ ২৫ খানি রেখাচিত্র একত্রে পুস্তকাকারে মুদ্রিত হয়।

জীবনের শেষ ১৭ বৎসর জ্যোতিরিন্দ্রনাথ রাঁচীতে বাস করেন। ৪ঠা মার্চ্চ ১৯২৫ সন্ধ্যাবেলা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ রাঁচীতে পরলোক গমন করেন।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—"সাহিত্যের শিক্ষায়, ভাবের চর্চ্চায়, বাল্যকাল হইতে জ্যোতিদাদা আমার প্রধান সহায় ছিলেন। তিনি নিজে উৎসাহী এবং অন্যকে উৎসাহ দিতে তাঁহার আনন্দ। আমি অবাধে সঙ্গে ভাবের ও জ্ঞানের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতাম, তিনি বালক বলিয়া আমাকে অবজ্ঞা করিতেন না।" (জীবনস্মৃতি-রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্ররচনাবলী ১০ম খণ্ড, জন্মশতবার্ষিক, পৃঃ ৬১।)

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর নিজে এবং তাঁর চার পুত্র বাংলা দেশের এবং কেউ কেউ ভারতেরও উজ্জ্বল রত্ন বিশেষ। এঁরা সকলেই প্রতিভার দীপ্তিতে আমাদের আশ্চর্য করেন। তাই তাঁদের জীবনের কথা বলতে গিয়ে অল্প কথায় আলোচনা যেন অসম্পূর্ণ হল বলে মনে হয়। অনেক কথাই যেন না বলা থেকে যায়। আর রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে আলোচনা করতে গেলে তো একেবারে অভিভূত হতে হয়। মানুষের জীবনে এতখানি কর্মশক্তি, জ্ঞান, মানবিক অনুভূতি ও সৃষ্টির এমন বহুমুখী ক্ষমতা কি করে সম্ভব হল এই কথাটাই বার বার মনে হয়। তাঁর কর্ম-বহুল জীবন ও রচনা প্রাচুর্যের পুরোপুরি খবর দেওয়া একটি প্রবন্ধে সম্ভব নয়; সুবৃহৎ গ্রন্থরাজি সে কাজ করছে। তবুও আমরা সামান্য কয়েকটি আঁচড়ে এই মহাপুরুষের জীবনের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ছুঁয়ে যাব যাতে তাঁর সামাজিক ও ধর্মমত আমাদের কাছে কিছুটা পরিস্ফুট হয়।

৭ই মে ১৮৬১ খ্রীঃ জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে রবীন্দ্রনাথের জন্ম হয়। বিরাট এক জনবহুল পরিবারের সন্তান, তার উপর বড়লোকের ছেলে ছিলেন বলে বাবা মার সঙ্গে সম্পর্ক ছিল খুব কম। চাকরদের তদারকীতে স্নেহের ভাগ কম ছিল আবার স্বাধীনতাও ছিল না। মানুষের সাহচর্য পেয়েছেন, কিন্তু প্রকৃতির সঙ্গে প্রায় যোগাযোগ ছিল না। জানালার ফাঁক দিয়ে সামান্য একটু আকাশের অংশ, বটগাছ, পুকুর—এই রকম ভাবেই বাইরের যা কিছু দেখতে পেয়েছেন। তবু সেই আকাশ আর বটগাছই বালক রবীন্দ্রনাথকে হাতছানি দিত।

লোকের কল-কোলাহল এড়িয়ে অনেক সময়েই তিনি জানালার ফাঁক দিয়ে মনটিকে পাঠিয়ে দিতেন দূরে দূরান্তরে।

স্কুলের বাঁধাধরা লেখাপড়ায় তাঁর মন বসেনি। তবুও কিছুদিন তাঁকে মনের ইচ্ছের বিরুদ্ধে স্কুলে যেতেই হয়। তাঁর পিতা মহর্ষিদেব তাঁর জন্মের আগে থেকেই বেশীরভাগ সময় দেশ ভ্রমণ করতেন। রবীন্দ্রনাথের উপনয়নের পর তিনি হিমালয় ভ্রমণে যান এবং পুত্রকেও সঙ্গে নেন। তার আগে পরিবারের সকলের সঙ্গে গঙ্গাতীরে পেনেটি গিয়েছিলেন একবার, তাতেই তিনি প্রথম মুক্তির আনন্দ পান ও গঙ্গা দেখে খুব আনন্দিত হন। আর হিমালয় ভ্রমণে তো আরও আনন্দ, কারণ পরিবারের কেউ সঙ্গে যাচ্ছেন না। একা পিতার সঙ্গে অতদূর যাওয়া, আর সেখানে স্কুল নাই। মহর্ষি পুত্রকে নিয়ে কেবল বেড়িয়ে বেড়াননি। নিজে পুত্রকে নানা বিষয়ে শিক্ষা দিতে থাকেন। এখানে তাঁর শিক্ষারীতির বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করার মত। খোয়াইয়ের মধ্যে জলধারা দেখে এসে বোলপুরে একদিন বালক কবি পিতাকে খবর দিলেন, স্নান ও পানের জন্য ঐ জল আনলে ভাল হয়। দেবেন্দ্রনাথ বালককে তাচ্ছিল্য না দেখিয়ে ঐখান থেকেই জল আনবার ব্যবস্থা করেন। ছেলের দায়িত্ববোধ বাড়াবার জন্য একটি দামী ঘড়িতে দম দিতে দিতেন। তাঁর টাকা পয়সারও হিসাব রাখতে হ'ত। টাকার হিসাবে ভুল হ'ত। একদিন তো হিসাবে টাকা বেড়েই গেল, পিতা তাতে রসিকতা করে বললেন যে তাঁকেই টাকা রাখতে দিতে হবে। ঘড়িটাও বালক রবীন্দ্রনাথের উৎসাহের অত্যাচারে নষ্ট হয়ে গেল। কিন্তু এই সব ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথের উপরে যে প্রভাব পড়েছিল সে সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলেছেন—

"ভগবদ্গীতায় পিতার মনের মত শ্লোকগুলি চিহ্নিত করা ছিল, সেইগুলি বাংলা অনুবাদ সমেত আমাকে কাপি করতে দিয়েছিলেন। বাড়ীতে আমি নগণ্য বালক ছিলাম, এখানে আমার পরে এই সকল গুরুতর কাজের ভার পড়াতে তাহার গৌরবটা খুব করিয়া অনুভব করিতে লাগিলাম" (জীবনস্মৃতি-রচনাবলী ১০মখণ্ড, জন্মশতবার্ষিক, ৪৩পৃঃ।) এইভাবে কিছুদিন পুত্রকে সঙ্গে রেখে পরে আবার বাড়ী পাঠিয়ে দিলেন। জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে ফিরে এসে আবার স্কুলে যাওয়া তাঁর পক্ষে অসম্ভব হল। তাই বাড়ীতেই ভালভাবে শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়।

বাল্যকাল থেকেই তাঁর কবিতা রচনার ক্ষমতা দেখতে পাওয়া যায়।

ছোটবেলা থেকে কাব্য রচনায় তাঁর দাদা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, তাঁর বন্ধু অক্ষয় চৌধুরী, পিতৃবন্ধু শ্রীকণ্ঠবাবু, খুড়তুতো দাদা গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও জ্যোতিদাদার স্ত্রী কাদম্বরী দেবীর কাছে অত্যন্ত উৎসাহ পেয়েছেন। এছাড়া বঙ্কিমচন্দ্র ও মাইকেল মধুসূদন দত্ত যেন ভাষাকে তাঁর রচনার উপযোগী করবার কাজ অনেকখানি এগিয়ে রাখেন। কবি বিহারীলাল চক্রবর্ত্তীর প্রভাব তাঁকে নিজের পথ বেছে নিতে সাহায্য করে। যদিও প্রতিভার দিক থেকে দুজনের মধ্যে কোন তুলনা চলে না, তবু বিহারীলাল রবীন্দ্রকাব্যের ধারায় প্রকৃত পথ নির্দ্দেশ করেছেন বলা যায়।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের উৎসাহে ও দ্বিজেন্দ্রনাথের সম্পাদনায় 'ভারতী' পত্রিকা বার হয়। রবীন্দ্রনাথ ১৬ বৎসর বয়সে 'ভারতী'তে লিখতে থাকেন। এই পত্রিকাতেই তাঁর গদ্যলেখা পরিণত রূপ পেতে থাকে। 'ভারতী'তে রচনার আগে থেকেই রবীন্দ্রনাথ 'ভানুসিংহের পদাবলীর' অনেকগুলি কবিতা লেখেন।

১৭ বৎসরে রবীন্দ্রনাথ মেজদাদা সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে বিলাতে যান। এখানে অধ্যাপক হেন্‌রী মর্লির কাছে সাহিত্যচর্চ্চা করেন। এক বছরের কিছু বেশী বিলাতে থাকার পর দেশে ফিরে আসেন। তিনি জাহাজে 'ভগ্নহৃদয়' নামে এক কাব্য আরম্ভ করেন এবং সেটি শেষ হয় ফিরে আসার পর।

১৮৮৩-৯ই ডিসেম্বর রবীন্দ্রনাথের মৃণালিণী দেবীর সঙ্গে বিবাহ হয়। তার আগেই 'সন্ধ্যা সঙ্গীত', 'প্রভাত সঙ্গীত', 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' প্রকাশিত হয়েছিল। 'মানসী' পর্বের আগে কবির নিজের মনে সৃষ্টির জন্য যে ব্যাকুলতা তা'মানসী'তে অনেকটা স্থির হয়েছে। 'মানসী'র পর থেকেই তিনি যেন নিজের মনকে খুঁজে পেয়েছেন। তারও পরের অধ্যায় রবীন্দ্র রচনার স্বর্ণযুগ।

রবীন্দ্রনাথের বিবাহের অল্প পরে মহর্ষিদেব তাঁকে জমিদারী দেখার কাজে নিয়োগ করেন। জমিদারী দেখতে রবীন্দ্রনাথকে পদ্মার উপরে বোটে অনেক সময়ই থাকতে হ'ত। গ্রাম বাংলার রূপ কবিকে এমন আনন্দ দেয় যে বিষয়কর্ম তাঁর কাছে সহজ হয়ে যায়। পদ্মা তাঁর উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। তাঁর মন নদীর সঙ্গে ও অন্যান্য প্রাকৃতিক বস্তুর সঙ্গে আত্মিক যোগ অনুভব করে। জমিদারির কাজের ফাঁকে ফাঁকে তিনি মানুষের অসহায় অবস্থা দেখে ব্যথা পেয়েছেন। এই সময়েই তাঁর 'ছিন্নপত্রাবলী' রচিত হয়। কাব্য, নাটক. গীতিনাট্য, প্রবন্ধ ছাড়া—তাঁর প্রধান আর এক সৃষ্টি ছোটগল্প এই সময়ে পাওয়া যায়, যা এর আগে প্রায় অজানা ছিল। গ্রামের মানুষের রোজকার

সুখ দুঃখ কান্নাহাসির সংস্পর্শে এসে কবি রবীন্দ্রনাথ, বড় লোকের ছেলে রবীন্দ্রনাথ যেন সাধারণের মর্মব্যথা আরও ভাল করে অনুভব করলেন। তাঁর সামাজিক চিন্তা যা পরবর্ত্তী কালে পরিণতরূপ নিয়ে ফুটে উঠেছিল তার উপকরণ তিনি পেয়েছিলেন এই সময়েই অত্যন্ত কাছে থেকে জনসাধারণের জীবনযাত্রার অভিজ্ঞতা থেকে। দেশেব প্রকৃত প্রয়োজন কোনখানে, কি করলে দেশের সত্যিকার উন্নতি হবে তা তিনি তাঁর মনের উপলব্ধি ও অভিজ্ঞতা মিশিয়ে বার বার প্রকাশ করেছেন। ১৮৯১ থেকে ১৯০১ পর্যন্ত তিনি জমিদারির কাজে পদ্মা বক্ষে ছিলেন আর এই সময়কে তাঁর রসজীবনের শ্রেষ্ঠতম যুগ বললে বোধ হয় ভুল হয় না। সাধারণভাবে মনে হতে পারে যে প্রকৃতির মাঝখানে ছিলেন তাই তাঁর সারা মন জুড়ে থাকবে প্রকৃতি। কিন্তু কবির বেলায় দেখা যায়, প্রকৃতি তো ছিলই তবে মানুষই যেন কবিকে বেশী টেনেছে। মানুষকে তিনি প্রকৃতির কোলেই যেন অন্তর দিয়ে অনুভব করলেন।

আমরা কবি রবীন্দ্রনাথ, নাট্যকার রবীন্দ্রনাথ, প্রবন্ধকার ও ঔপন্যাসিক রবীন্দ্রনাথের একটু ইঙ্গিত দিয়ে দিয়েছি। কিন্তু তিনি কেবল সৃষ্টিই করেননি সম্পাদকতার পালনী শক্তির পরিচয়ও দিয়েছেন। অল্প বয়সেই পারিবারিক পত্রিকা 'বালক' সম্পাদনা করেন রবীন্দ্রনাথ; যদিও জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর নাম দিয়ে পত্রিকা প্রকাশিত হত।

'হিতবাদী' পত্রিকার কথা আমরা আগেই জেনেছি। এই পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের বহু রচনা প্রকাশিত হয়েছিল। তাঁর ছোটগল্প লেখার একরকম সূত্রপাত হয় এই পত্রিকায়। তাছাড়া সাহিত্য প্রবন্ধ ও সমালোচনাও বার হত। 'সাধনা' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুত্র সুধীন্দ্রনাথ। 'সাধনাতে'ও কবির প্রচুর ছোটগল্প ও অন্যান্য রচনা প্রকাশিত হয়। 'সাধনা' বন্ধ হবার পর তিনি একবৎসর 'ভারতী'র সম্পাদক ছিলেন। আর এতেও কবির রচনাই ছিল প্রধান আকর্ষণ। এর কিছুকাল পরে 'বঙ্গদর্শন' নবপর্য্যায়ে রবীন্দ্র সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকাতেই রবীন্দ্রনাথের 'চোখের বালি' ও 'নৌকাডুবি' এই দুটি বিখ্যাত উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছিল। তিনি পাঁচ বছর 'বঙ্গদর্শনে'র সম্পাদনা করেছিলেন।

১৩০৯ সালের ৭ই অগ্রহায়ণ মৃণালিনী দেবীর মৃত্যু হয়।

স্ত্রীর মৃত্যুর আগে থেকেই তিনি শান্তিনিকেতনের আশ্রম-বিদ্যালয় গড়ে তোলেন। জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত এই বিদ্যালয়ই তাঁর অবলম্বন ছিল।

এখানে এসে তাঁর অধ্যাত্মচেতনা যেন উপলব্ধির স্তরে পৌছল। আর তার বাণীরূপ 'গীতাঞ্জলি', 'বলাকা' কাব্যে, 'শান্তিকেতন' প্রবন্ধের ছত্রে ছত্রে। রবীন্দ্রনাথের মধ্যে যেন দুটি মানুষ একসঙ্গে জড়িয়ে ছিল। একজন দার্শনিক আর একজন কবি। একজন নানা সমস্যার কথা ভেবেছেন সমাধান ভেবেছেন, অন্যজন রূপ, রস, গন্ধভরা পৃথিবীকে উপভোগ করে চলেছেন। শান্তিনিকেতনে এসে কবির মধ্যে যেন এই দুই শক্তি সমান কার্যকরী হয়ে সম্পূর্ণতা পেল। একদিকে আশ্রম, অন্যদিকে নিজের সৃষ্টি—এই নিয়েই কবি, সাংসারিক শোক সন্তপ্ত কবি, আনন্দে থাকতেন। মৃত্যুর কয়েকদিন আগে যখন নিজে লিখতে পারেননি তখনও অর্দ্ধআচ্ছন্ন অবস্থায় মুখে মুখে কবিতা বলে গিয়েছেন। সমগ্র জীবনই সৃষ্টির মহান্ সম্ভারে ভরা।

খুব অল্প কথায় মহর্ষিদেবের চারজন স্বনামধন্য পুত্রের জীবনের উল্লেখযোগ্য কিছু আলোচনা করা গেল। এবার তাঁদের সামাজিক ও ধর্মমত সম্বন্ধে এবং সেইসঙ্গে পিতার প্রভাব সম্বন্ধে আলোচনা হওয়া দরকার।

দ্বিজেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে যা জানা যায় তাতে দেখা যায় তিনি সামাজিক জীবন সম্বন্ধে খুব সচেতন ছিলেন না। নিজের লেখা নিয়ে ও তত্ত্বচিন্তা নিয়ে বিভোর হয়ে থাকতেন। রাজনারাণ বসুকে লেখা তাঁর চিঠি থেকে বোঝা যায় তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব ছিল। কিন্তু তিনি খুব একটা সামাজিক মেলামেশায় অভ্যস্ত ছিলেন বলে জানা যায় না। তবে হিন্দুমেলা, সাহিত্য সভা, সাহিত্য পরিষদ ও ব্রাহ্ম সমাজের সঙ্গে যুক্ত থেকে যে সামাজিকতা তা তিনি যতদিন কলকাতা ছিলেন অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে নির্বাহ করেছেন। ১৮৭০ থেকে ১৯০৫ পর্যন্ত তিনি কলকাতাতেই ছিলেন এবং বিদ্বজ্জন সমাজের রাজচক্রবর্ত্তীই ছিলেন। পিতার মৃত্যুর পর একবছর ছিলেন রায়পুরের সিংহপরিবারে এবং শেষ কটি বছর শান্তিনিকেতনে।

মহর্ষির ছেলেদের মাথায় নানা সময়ে নানা রকম খেয়াল চেপেছে, সেটাকে ঠিক সাংসারিক বুদ্ধি বলা যায় না। তবু তাঁদের মধ্যে কিছুটা স্বাভাবিক সাংসারিক বুদ্ধি ছিল। তাই দেখা যায় জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথ নিজেদের সৃষ্টি-ক্ষেত্রে যত নিমগ্নই হন প্রজারঞ্জক জমিদারও ছিলেন। কিন্তু দ্বিজেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে জানা যায় যে তিনি একেবারেই অসাংসারিক ছিলেন।

"তাঁর এক আত্মীয়ের মুখে শুনেছি, একবার বাস্পার ক্রপ হলে পর সুযোগ বুঝে পিতা মহর্ষি তাঁকে খাজনা তুলতে গ্রামাঞ্চলে পাঠালেন। গ্রামের দুরবস্থা

দেখে তিনি নাকি তার করলেন, 'সেও ফিফ্‌টি থাউজেণ্ড'। (তাঁর গ্রামোন্নয়ন করবার বোধহয় বাসনা হয়েছিল)। উত্তর গেল 'কাম্‌ব্যাক্‌।' (বড়বাবু—সৈয়দ মুজতবা আলী—প্রথম সংস্করণ, ২য় মুদ্রণ, ১৫ পৃ: মিত্র ও ঘোষ।)

অসাংসারিক উদাসীন দ্বিজেন্দ্রনাথের আর এক উদাহরণ পাই, "রবীন্দ্রনাথ তাঁর সর্বাগ্রজকে বললেন যে, এবারে গরম বেশী পড়বে বলে তিনি হিমালয়ের ঘুমে বাড়ীভাড়া করেছেন, 'বড়দাদা' গেলে ভাল হয়। আমার স্পষ্ট মনে আছে, বড়বাবু যেন আকাশ থেকে পড়লেন। বললেন 'আমি? আমি আমার এই ঘর সংসার নিয়ে যাব কোথায়?' যে সব গুরুজন ও ছেলেরা গুরুদেবের সঙ্গে গিয়েছিলেন তাঁরা একে অন্যের মুখ চাওয়া চাওয়া করছিলেন। হয়তো বা মুখটিপে হেসেও ছিলেন। তাঁর ঘর সংসার। ছিল তো সবে মাত্র দুএকটি কলম, বাক্স বানাবার জন্য কিছু পুরু কাগজ, দুএকখানা খাতা, কিছু পুরোন আসবাব। একে বলে ঘর সংসার! এবং তার প্রতি তাঁর মায়া! জীবনস্মৃতির পাঠক স্মরণে আনতে পারবেন, নিজের রচনা কবিতার প্রতিই তাঁর কী রকম ঔদাসীন্য ছিল। লোকমুখে শুনেছি সকলের অজান্তে এক ভিকিরি এসে ভিক্ষা চাইলে তিনি বললেন, 'আমার কাছে তো এখন কিছু নেই। তুমি এই শালখানা নিয়ে যাও," (বড়বাবু—সৈয়দ মুজতবা আলী ১মসংস্করণ, ৬ পৃঃ, ও মিত্র ও ঘোষ।)

সকলেই জানেন দ্বিজেন্দ্রনাথ নিষ্ঠাবান ব্রাহ্ম ছিলেন। কিন্তু তাঁর ঔদার্যের অভাব দেখা যায়নি। একজন ভিন্ন ধর্মাবলম্বীর মুখ থেকে জানা যায়, "ভারতীয় দর্শন সম্বন্ধে আমার যেটুকু জ্ঞান সে দ্বিজেন্দ্রনাথের কাছ থেকে। বাকিটুকু রমন মহর্ষির কাছ থেকে ও বিবেকানন্দ পড়ে। হিন্দু দ্বিজেন্দ্রনাথ আমাকে সুফিতত্ত্বের মূল মর্মকথা বুঝিয়ে দেন। সুফি তত্ত্বে তাঁর জ্ঞান পিতা দেবেন্দ্রনাথের কাছ থেকে।" (বড়বাবু—সৈয়দ মুজতবা আলী—৪৪ পৃঃ, ১ম মিত্র ও ঘোষ।)

এই লেখকই দ্বিজেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে আরও বলেছেন—"বঙ্কিমচন্দ্র যখন তাঁর 'কৃষ্ণ চরিত্রে' প্রমাণ করতে চাইলেন গীতার শ্রীকৃষ্ণ আর বৃন্দাবনের শ্রীকৃষ্ণ এক ব্যক্তি নন, তখন দ্বিজেন্দ্রনাথ নাকি রবীন্দ্রনাথের কাছে এসে বলেন, বঙ্কিমবাবু এসব কি আরম্ভ করলেন রবি? বৃন্দাবনের রসরাজকে মেরে ফেললেন যে!" (বড়বাবু—সৈয়দ মুজতবা আলী, ১ম সংস্করণ, ২২ পৃঃ। মিত্র ও ঘোষ।)

আজকের দিনে বৈষ্ণব পদাবলীর প্রাধান্য ও অবদান স্বীকৃত কিন্তু সেকালের

পিউরিটান যুগে বিশেষ করে ব্রাহ্ম পরিবারে এরকম কথা অত্যন্ত আশ্চর্য লাগে। কিন্তু এটাও কেবল দ্বিজেন্দ্রনাথের বিশেষত্ব নয়, তাঁর পরিবারের বিশেষত্ব। দেবেন্দ্রনাথ শুধু সুফি সাধনা সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল ছিলেন তাই নয় বহু ধর্মের মূল কথা,দর্শন অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে জেনেছেন ও অন্যের ধর্মকে শ্রদ্ধা দেখিয়েছেন। পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথের বিশ্বজনীনতার মূল বীজ এইভাবে তাঁর পিতা ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার মধ্যে পাওয়া যায়।

শেষের জীবনে শান্তিনিকেতনে দ্বিজেন্দ্রনাথ পিতার মত শাস্ত্রচর্চা ও ধ্যান ধারণায় মগ্ন থাকতেন। "এখনো বাঙলা দেশে বিস্তর না হোক, বেশ কিছুলোক বেঁচে আছেন যাঁরা তাঁর সে ধ্যানমূর্তি দিনের পর দিন দেখেছেন। সূর্যোদয়ের বহুপূর্বেই তিনি আগের দিনের বাসি জলে স্নান করে ধ্যানে বসতেন। সে সময়ে ছোট ছোট পাখী, কাঠ বেবালি তাঁর গায়ের উপর এসে বসতো, ওঠানামা করতো। ঘণ্টার পব ঘণ্টা কেটে যেত। পাখীরা অপেক্ষা করতো ধ্যানভঙ্গের পর তিনি তাদের খাওয়াবেন। ময়দার গুলি বানিয়ে মুনীশ্বর তার ব্যবস্থা করে রাখতো।" (বড়বাবু—সৈয়দ মুজতবা আলী—১ম সংস্করণ, ২৩ পৃঃ মিত্র ঘোষ।)

পিতা পুত্রের চরিত্রগত মিল ছিল খুব বেশী। কেবলমাত্র ঔদাসীন্যের ব্যাপারে দ্বিজেন্দ্রনাথের মিল ছিল না। দেবেন্দ্রনাথ ছিলেন একদিকে অত্যন্ত উদার, জ্ঞানি ও ধার্মিক অন্যদিকে তিনি ছিলেন বেশ শৌখিন ও হিসাব কুশলী। তাই বলে যে তাঁব মধ্যে নীচতা বা দীনতা ছিল তা নয়। তাঁর অকুণ্ঠ দান মনে রাখবার মত। তবে তিনি তাঁরজ্যেষ্ঠ পুত্রের মত অন্যমনস্ক দান করেননি—দানেরও একটা হিসাব লেখা থাকতো। তাঁর সম্বন্ধে নাতী অবনীন্দ্রনাথ বলেছেন—"কর্তাদাদামশায় মহর্ষি হলে কী হবে—এদিকে শৌখিন ছিলেন খুব। কোথাও একটু নোংরা সইতে পারতেন না। সব কিছু পরিস্কার হওয়া চাই। কিছুদিন বাদে বাদেই তিনি ব্যবহারের কাপড় জামা ফেলে দিতেন, চাকররা সেগুলো পরতো। কর্তাদাদা মশায়ের চাকরদের যা সাজের ঘটা ছিল—একেবারে ধোপদোরস্ত সব সাজ।

কর্তাদাদামশায় কখনো এই বৃদ্ধকালেও তোয়ালে দিয়ে গা রগড়াতেন না, চামড়ায় লাগবে। সে জন্য মলমলের থান আসত, রাখা থাকত আলমারির উপরে, তাই থেকে কেটে কেটে দেওয়া হত, তারই টুকরো দিয়ে তিনি গা

রগড়াতেন, চোখ পরিষ্কার করতেন" (ঘরোয়া—অবনীন্দ্রনাথ ও রাণী চন্দ —৩৭ পৃঃ, ১৩৫০ সাল—বিশ্বভারতী)

আর এক জায়গায় তিনি বলেছেন "কর্ত্তাদাদামশায় খুব হিসেবী লোক ছিলেন। মহর্ষিদেব হয়েছেন বলে বিষয় সম্পত্তি দেখবেন না,তা নয়। তিনি শেষ পর্যন্ত নিজে সব হিসেব নিকেশ নিতেন। রোজ তাঁকে সব রকমের হিসেব দেওয়া হত।" (ঘরোয়া—অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও রাণী চন্দ—৪২ পৃঃ—১৩৫০ সাল—বিশ্বভারতী)

প্রিন্স দ্বারকানাথের সময় থেকে ঠাকুর পরিবারে বিলাত যাওয়ার প্রচলন। দেশের মধ্যেও ভ্রমণের সখ এই পরিবারে বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। দেবেন্দ্রনাথ তো জীবনের বেশীর ভাগ সময় ভ্রমণেই কাটিয়েছেন। সত্যেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ ও পরিবারের প্রায় সকলেই ভ্রমণে উৎসাহী ছিলেন। কিন্তু দ্বিজেন্দ্রনাথের ভ্রমণে উৎসাহ ছিলনা। বিদেশে যাবার প্রস্তাব নাকি তিনিই বাতিল করেছিলেন।

দুএকটি পার্থিব বিষয়ে পিতা পুত্রে মিল না থাকলেও ধর্মের ব্যাপারে সাদৃশ্য অদ্ভুত ছিল। উভয়েই প্রাচীন পন্থী ছিলেন কিন্তু অনুদার ছিলেন না। দেশাত্মবোধ ও সহৃদয় রসিকতায় উভয়েরই মিল ছিল।

সতেন্দ্রনাথ বোধহয় ঠাকুর পরিবারের ব্যতিক্রম। তিনি নিয়ম মাফিক পড়াশোনায় আপত্তি জানাননি, কৃতিত্বের সঙ্গে এখানকার ও বিদেশের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন। লক্ষ্য করে দেখা যায় বাঁধাধরা ব্যবস্থায় পঠন পাঠনের আপত্তি এ বংশের প্রায় সকলেরই ছিল। খুব অল্প বয়সের থেকে পিতার মত তাঁরও ধর্মের আকর্ষণ লক্ষ্য করা যায়। ব্রাহ্ম সমাজের সঙ্গে তিনিও ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন কিন্তু বিষয় কর্মে সম্পূর্ণ মনযোগ ছিল। স্বাদেশিকতায় পিতা ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার মত আগ্রহ ছিল তাই সরকারী কর্মচারী হয়েও হিন্দু মেলার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ইনি অত্যন্ত নব্যপন্থী ছিলেন। প্রাচীনপন্থী পিতা ও সমগ্র পরিবারের আপত্তি সত্তেও স্ত্রীলোকের অবরোধ প্রথা উঠাবার চেষ্টা করেন। এটা তখনকার দিনে একটা বিদ্রোহের মত মনে হয়েছে। তবে তাঁদের পরিবারে নারীর মর্য্যাদা, সম্মান ও সুশিক্ষার ব্যবস্থা মহর্ষির আমল থেকেই ছিল, কেবল পর্দা প্রথা ছিল। তিনি তা উঠিয়ে দিয়ে শিক্ষাক্ষেত্র আরও প্রসারিত করেন।

"সত্যেন্দ্রনাথ পিতার প্রাচীন পন্থী মতের সহিত সর্বদা একমত হইতে

পারিতেন না, পুত্র কন্যার শিক্ষা-বিষয়ে স্বাধীনভাবেই চলিতেন। ইন্দিরা দেবীকে সাহেবী স্কুলে দিয়া ফরাসী ভাষায় ও য়ুরোপীয় সঙ্গীত বিদ্যায় পারদর্শী করেন।" (রবীন্দ্র জীবনী—১ম খণ্ড—প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়—১৩ পৃঃ।)

সত্যেন্দ্রনাথ ধর্মীয় ব্যাপারে পিতাকে অনুসরণ করলেও সামাজিক বিষয়ে ভিন্ন মতের ছিলেন। তবে পারিবারিক শিক্ষা সংস্কৃতি রক্ষার বিষয়ে তাঁরও পিতার মত আগ্রহ লক্ষণীয়। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ যখন তাঁর কাছে বোম্বায়ে ছিলেন, তিনি তাঁর উচ্চ শিক্ষার বন্দোবস্ত করেন। রবীন্দ্রনাথকে বিলাতে নিয়ে যাওয়া এবং তার পূর্বে আমেদাবাদে তাঁর শিক্ষার ব্যবস্থায় পিতা দেবেন্দ্রনাথের মত বিচক্ষণতার পরিচয় পাওয়া যায়। জীবনের বেশীর ভাগ সময় বাড়ীর বাইরে কাটিয়েছিলেন বলে পিতার সঙ্গে চরিত্রগত মিল খুব বেশী ছিল না—তিনি খানিকটা স্বতন্ত্র ধরণের ছিলেন।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথও তাঁর দাদাদের মত শিক্ষায় সংস্কৃতিতে প্রতিভায় সমুজ্জল। তিনিও অল্পবয়স থেকে ব্রাহ্ম সমাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। জীবনের শেষ ১৭ বৎসর রাঁচিতে নিরিবিলি কাটান। ধর্ম আচরণ সাহিত্য আরাধনাতেই জীবন কাটিয়েছেন। তিনিও পিতার সাহিত্যানুরাগ, স্বাদেশিকতা ও ধর্মীয়ভাব পেয়েছিলেন। সত্যেন্দ্রনাথের প্রভাবে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের মধ্যেও পর্দা বিরোধী মনোভাব জাগে। সামাজিক বিষয়ে তিনি ছিলেন প্রগতিশীল, উদারপন্থী ও উন্নতিকামী। রবীন্দ্রনাথ 'জীবনস্মৃতির' এক জায়গায় বলেছেন—"আমার বেশ মনে আছে, মেজদাদার কোন চিঠিতে ছিল তিনি 'কর্মক্ষেত্রে গলবদ্ধরজ্জু' হইয়া খাটিয়া মরিতেছেন—সেই স্থানের কয়েকটি বাক্য লইয়া পিতা আমাকে তাহার অর্থ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। আমি যেরূপ অর্থ করিয়াছিলাম তাহা তাঁহার মনোনীত হয় নাই, তিনি অন্য অর্থ করিলেন। কিন্তু আমার এমন ধৃষ্টতা ছিল যে সে-অর্থ আমি স্বীকার করিতে চাহিলাম না। তাহা লইয়া অনেকক্ষণ তাঁহার সঙ্গে তর্ক করিয়াছিলাম। আর কেহ হইলে নিশ্চয় আমাকে ধমক দিয়া নিরস্ত করিয়া দিতেন, কিন্তু তিনি ধৈর্যের সঙ্গে আমার সমস্ত প্রতিবাদ সহ্য করিয়া আমাকে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন।" (জীবনস্মৃতি—৪৮ পৃঃ, জন্মশতবার্ষিক রচনাবলী—১০ম খণ্ড) জ্যোতিদাদা সম্বন্ধেও বলেছেন "আগেই বলেছি, বড় ছোটর মধ্যে চলাচলের সাঁকোটা ছিল না। কিন্তু ঐ সকল পুরোণ কায়দার ভিড়ের মধ্যে জ্যোতিদাদা এসেছিলেন নির্জলা নতুন মন নিয়ে। আমি ছিলুম তাঁর চেয়ে বারো বছরের

ছোট। বয়সের এতদূর থেকে আমি যে তাঁর চোখে পড়তুম, এই আশ্চর্য। আরও আশ্চর্য এই যে, তাঁর সঙ্গে আলাপে জ্যাঠামি বলে কখনও আমার মুখ চাপা দেননি। তাই কোন কথা ভাবতে আমার সাহসে অকুলান হয়নি।" (ছেলেবেলা—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ১৫১ পৃঃ, জন্মশতবার্ষিক রচনাবলী—১০ম খণ্ড)

পিতার চরিত্রের এই মহৎ গুণটির অধিকারী জ্যোতিরিন্দ্রনাথও ছিলেন। তিনি দেবেন্দ্রনাথের মত ছোটদের ব্যক্তিত্বের মূল্য দিতেন। তাদের বাচালতাও ধৈর্য ধরে শুনতেন।

সন্তানদের উপর পিতার প্রভাব অল্পবিস্তর অবশ্যই পড়ে; আর যে পিতা সমস্ত বাংলাদেশ তথা ভারতবর্ষের লোকের মনে প্রভাব বিস্তারে সক্ষম হয়েছেন, নবযুগের কৃষ্টি, চিন্তা ও ধর্মের গতিকে অনেকখানি নিয়ন্ত্রিত করতে পেরেছেন, তাঁর প্রভাবে যে তাঁর পুত্ররা প্রভাবিত হবেন একথা বলাই বাহুল্য। প্রধানতঃ চার পুত্রের উপর পিতার দেবোপম চরিত্রের প্রভাব পড়লেও সর্বকনিষ্ঠের উপর প্রভাব যেন সব থেকে বেশী।

রবীন্দ্রনাথের সমস্ত রকম পরিণতির পিছনে তাঁর পিতা মহর্ষিদেবের ও পরিবারের প্রভাব কাজ করেছে। তাঁব জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা তিনজন, বিশেষ করে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, তাঁর উপর খুবই প্রভাব বিস্তার করেন। সাহিত্য জীবন বিকাশে কবি বিহারীলাল চক্রবর্ত্তী, জ্যোতিরিন্দ্রনাথের বন্ধু অক্ষয় চৌধুরী, গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাদম্বরী দেবী ও আন্না তড়খড়ের নাম উল্লেখযোগ্য। কিন্তু রবীন্দ্র জীবন-সাধনা ও কর্মপন্থাকে যিনি সব থেকে প্রভাবিত ও অনেকখানি নিয়ন্ত্রিত করেছেন তিনি তাঁর পিতা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

পিতার কাছ থেকে রবীন্দ্রনাথ সব থেকে উল্লেখযোগ্য যে গুণটি লাভ করেছিলেন সেটি ভারসাম্যের ভাব। সংসারকে একটুও অবহেলা না করে অপার্থিব সাধনার দিকে আগ্রহ মহর্ষির এক বিশেষ গুণ। তবে প্রথম জীবনে ধর্মের টানে বিষয় সম্বন্ধে খানিকটা ঔদাসীন্য লক্ষ্য করা যায়। পিতার মৃত্যুর পর মহর্ষি বিষয়ের প্রতি ঔদাসীন্যতার জন্য ক্রুত ঋণ পরিশোধ করতে ব্যস্ত হন। একটু চিন্তা করে ধীরে ধীরে এ্কাজ করলে বৈষয়িক ক্ষতি কম হ'ত। হিমালয় থেকে তপস্যা শেষ করে আসার পর তাঁর ভারসাম্যের ভাব লক্ষ্য করা যায়, যা শেষ পর্যন্ত ছিল। রবীন্দ্রনাথ পিতার এই গুণের অধিকারী ছিলেন। তবে তিনিও পত্নী বিয়োগের পর বেশ কিছুদিন উদাসীন হয়ে থাকেন; সে সময় সংসারের দায় কমিয়ে বিষয় হস্তান্তর করবার আগ্রহ দেখা যায়। পরে 'বলাকা'

রচনার পর থেকে যেন ভারসাম্যের ভাব ফিরে আসে এবং শেষ পর্যন্ত তাঁর এই গুণটি ছিল।

অল্পবয়স থেকেই তিনি একটা স্বাদেশিকতাব পরিবেশে মানুষ। বাংলা ভাষার চর্চা তখন প্রায় অপ্রচলিত। মেয়েরা বা অর্দ্ধশিক্ষিত লোক ছাড়া চিঠি পত্রে পর্য্যন্ত বাংলা লেখার চলন ছিল না। কিন্তু মহর্ষি নিজে বাংলার চর্চা করতেন এবং পরিবারের মধ্যে বেশ ভালরকম বাংলা শিক্ষার ব্যবস্থা রেখেছিলেন। তাই বলে ইংরাজী শিক্ষার চলন ছিল না তা নয়। রীতিমত বিদেশী সাহিত্য ও দর্শন আলোচিত হত।

দেশপ্রেমের উন্মাদনা তখনও সমস্ত দেশে ছেয়ে যায়নি। রঙ্গলাল ও হেমচন্দ্রের দেশপ্রেমের কবিতা সবে তখন সাধারণের মধ্যে চেতনা জাগাতে যাচ্ছে। সেই সময়েই তাঁদের বাড়ীতে স্বদেশী আবহাওয়া ছিল। দেবেন্দ্রনাথ সর্বদা সক্রিয়ভাবে স্বদেশী আন্দোলনে যোগ না দিলেও তাঁর উৎসাহ ও আনুকূল্যে হিন্দুমেলার উদ্যোগ হয়েছিল। তাঁর জীবনীকার অজিতকুমার চক্রবর্ত্তী লিখেছেন যে মহর্ষি কংগ্রেসের চাঁদা দেওয়া ও অন্যান্য সাহায্য দ্বারা জাতীয় আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করেছেন। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—"বাহির হইতে দেখিলে আমাদের পরিবারে অনেক বিদেশী প্রথার চলন ছিল। কিন্তু আমাদের পরিবারের হৃদয়ের মধ্যে একটা স্বদেশাভিমান স্থির দীপ্তিতে জাগিতেছিল। স্বদেশের প্রতি পিতৃদেবের যে একটি আন্তরিক শ্রদ্ধা তাঁহার জীবনের সকল প্রকার বিপ্লবের মধ্যেও অক্ষুণ্ণ ছিল, তাহাই আমাদের পরিবারস্থ সকলের মধ্যে একটি প্রবল স্বদেশ-প্রেম সঞ্চার করিয়া রাখিয়াছিল।" (জীবনস্মৃতি—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—৬৬ পৃঃ। ১০ম খণ্ড, জন্মশতবার্ষিক রচনাবলী) আর এক জায়গায় বলেছেন—"হিন্দুমেলার পরামর্শ ও আয়োজনে আমাদের বাড়ীর সকলে তখন উৎসাহিত, তার প্রধান কর্মকর্তা ছিলেন নবগোপাল মিত্র। এই মেলার গান ছিল মেজদাদার লেখা 'জয় ভারতের জয়', গণদাদার 'লজ্জায় ভারত যশ গাইব কী করে', বড়দাদার 'মলিন মুখ চন্দ্রমা ভারত তোমারি'। জ্যোতিদাদা এক গুপ্ত সভা স্থাপন করেছেন, একটি পোড়ো বাড়িতে তার অধিবেশন, ঋক্‌বেদের পুঁথি, মড়ার মাথার খুলি আর খোলা তলোয়ার নিয়ে তার অনুষ্ঠান; রাজনারায়ণ বসু তার পুরোহিত; সেখানে আমরা ভারত উদ্ধারের দীক্ষা পেলেম।" (আত্মপরিচয়—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—জন্মশতবার্ষিক রচনাবলী, ১০ম খণ্ড, ২০৮ পৃঃ।)

বাল্যের সেই স্বদেশ প্রেমের প্রভাব কবির সারাজীবনেই লক্ষ্য করা যায়। তবে রাজনৈতিক নেতার স্বাদেশিকতা আর কবির স্বাদেশিকতা এক নয়। সর্বদাই আমরা লক্ষ্য করেছি সমসাময়িক রাজনৈতিক নেতাদের থেকে তাঁর দৃষ্টি যেন অনেকখানি পৃথক। ১৩০৪।১৯শে জ্যৈষ্ঠ—১৮৯৭-১১ই জুন—বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মিলনে নাটোরে গিয়েছিলেন। তখনকার রেওয়াজ অনুযায়ী সম্মিলনের সভাপতি সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ইংরাজীতে অভিভাষণ লেখেন। কিন্তু বাংলায় বলা না হলে সাধারণের বুঝতে অসুবিধা হবে মনে করে রবীন্দ্রনাথের নেতৃত্বে অবনীন্দ্রনাথ ইত্যাদি যুবকদল বাংলায় আলোচনার জন্য অনুরোধ করতে থাকেন। রবীন্দ্রনাথ সভাপতির ভাষণ বাংলায় তর্জমা করে দেন এবং আর সকলের বক্তৃতা যাতে বাংলায় হয় সেজন্য যুবকদলের সঙ্গে চেষ্টা করেন। এতে যদিও তখন নেতাদের অনেকে চটেছিলেন তবু সেই থেকে বাংলায় বক্তৃতা দেবার নিয়ম হয়। 'ঘরোয়া'য় অবনীন্দ্রনাথ এই ঘটনাটি এবং একটি পার্টিতে রবীন্দ্রনাথেব নেতৃত্বে 'ন্যাশনাল ড্রেসে' অর্থাৎ ধুতি জামা পরে যাবার কথা সুন্দরভাবে লিখেছেন। এই গল্পদুটির মধ্যে থেকে আমরা রবীন্দ্রনাথের স্বদেশ প্রেমের কথা জানতে পারি। 'ঘরোয়ায়' স্বাদেশিক রবীন্দ্রনাথের আর এক চিত্র পাই, ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের রাখীবন্ধনের দিনের। কবি নির্ভীক চিত্তে মসজিদের মধ্যে ঢুকে মোল্লাদের হাতে রাখী বেঁধে আসেন। তবে রবীন্দ্রনাথ দেশকে ভালবাসলেও রাজনৈতিক আন্দোলনে খুব বেশী আসেনান। কারণ তিনি কবি' তাঁর মন নিভৃত রচনার জন্য যতখানি ব্যাকুল ছিল আন্দোলনের জন্য ততখানি নয়। এক বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময়ে কবি দেশের লোকের সঙ্গে পথে নেমেছেন নতুবা পত্র পত্রিকায় তাঁর লেখায় স্বদেশ চিন্তার যা পরিচয় আছে তাতে তৎকালের রাষ্ট্রনৈতিক নেতারা খুসি হননি। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে আমরা দেশাত্মবোধের জয়গান পাই, যদিও তখনও ঠিক আন্দোলন আরম্ভ হয়নি, দেশপ্রেম তখন ভাবের রাজ্যে ছিল। রবীন্দ্রনাথের সময়ে বাস্তব ক্ষেত্রে স্বরাজের জন্য আন্দোলন আরম্ভ হয়েছিল। তাই তাঁর সুযোগ হয়েছিল তাকে পরিস্কারভাবে দেখবার এবং এর ত্রুটিও তাঁর চোখে পড়ে। সেইজন্য খুব উঁচুচোখে এটাকে দেখেননি। অর্থাৎ তাঁর চোখে দেশাত্মবোধ মানবিকতার উপরে নয়। প্রথম জীবনের 'বৌঠাকুরাণীর হাটে'র প্রতাপ চরিত্র তার প্রথম উদাহরণ। আমাদের প্রচলিত ধারণায় আঘাত লাগে বটে কিন্তু রবীন্দ্রনাথ প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত একটি নীতিই মেনে এসেছেন—ধর্ম হ'ক বা দেশ প্রেম

হ'ক, মানবিকতা সব থেকে বড়। প্রবোধচন্দ্র সেন এই দিকে আলোকপাত করে দেখিয়েছেন যে রবীন্দ্রমানসে দেশপ্রেম কোনদিন তেমন প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। প্রতাপ চরিত্রের বীরত্ব ও দেশপ্রেম যত বড়ই হ'ক, তার নিষ্ঠুরতা ও অমানবিকতা কবিকে ক্ষুব্ধ করেছে। যৌবনের জয়গান, সৌন্দর্যের পূজা ও মানবিকতাকে তিনি প্রথম জীবনে যেমন সর্বোচ্চ স্থান দিয়েছেন সারাজীবনই তাকে সবার উপরে স্থান দিয়েছেন। 'গোরা'য় সেটা যেন আরও পরিণত রূপে প্রকাশ পেয়েছে। তবে দেশের সার্বিক উন্নতিতে, অর্থাৎ constructive work য়ে তাঁর সম্পূর্ণ সমর্থন ছিল। দেশের মানুষের সামাজিক ও মানসিক উন্নতি তাঁর কাছে যতখানি ছিল, রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা ঠিক ততখানি মূল্যবান ছিল না। তাঁর মনে হয়েছিল দেশকে আগে যেরকম করে হ'ক স্বাধীন করে পরে ইচ্ছেমত হঠাৎ দেশের মানুষের উন্নতি করা যায় না। আজ আমরা মর্মে মর্মে তাঁর অভিমতের বাস্তবতা অনুভব করছি। 'কালান্তরে'র বিভিন্ন প্রবন্ধে কবি বার বার বলেছেন—মানুষের সার্বিক উন্নতি চাই। গান্ধিজীর কাছে তাঁর অনুযোগ ছিল যে তিনি সত্য উপলব্ধি করেও কেন দেশবাসীকে সঙ্কীর্ণপথে আহ্বান করলেন, কেন মহান্ উন্নতির দিকে নির্দেশ দিলেন না। এক কথায় রবীন্দ্রনাথের দেশপ্রেম অনেকখানি বিশ্বপ্রেমের দিকে মুখ করে।

রবীন্দ্রনাথের সামাজিক মত সম্বন্ধে আমরা প্রবন্ধগুলি থেকে জানতে পারি। তবে ব্যক্তিগত জীবনে পিতার জীবিতকালে তিনি নিজের মত প্রতিষ্ঠা করেননি। সম্পূর্ণভাবে পিতাকে অনুসরণ করে গিয়েছেন। তাঁর বিবাহ সম্বন্ধে তাঁর জীবনীকার বলেছেন—"রবীন্দ্রনাথের মনে জীবন সঙ্গিনী সম্বন্ধে যে সব কল্পনা বা স্বপ্ন ছিল, এই বিবাহের দ্বারা সেগুলি কতদূর সফল হইয়াছিল, তাহা বলা কঠিন। তাঁহাকে বাংলা দেশের পল্লীগ্রামের দরিদ্র গৃহস্থের অল্প শিক্ষিত, এগারো বৎসরের বালিকাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিতে হইল। রবীন্দ্রনাথ 'য়ুরোপ যাত্রী'র পত্রধারায় 'যথার্থ দোসর', 'গোলামচোর' প্রভৃতি রচনায় জীবন সঙ্গিনী সম্বন্ধে যে সব মনোরম মতামত ব্যক্ত করিয়াছিলেন, তাহা যে বাস্তব জগতে সম্ভব নহে, তাহা প্রাচীনপন্থী পিতার শাসন ব্যবস্থায় প্রমাণিত হইল। রবীন্দ্রনাথের ন্যায় প্রতিভাবান্ যুবকের উপযুক্ত নারী জগতে অলভ্য না হইলেও বাংলার ক্ষুদ্র গণ্ডী পিরালী সমাজের ব্রাহ্মশাখার মধ্যে যে দুর্লভ তাহা বলাই বাহুল্য। ইহা জানিয়াই তাঁহার অভিভাবকগণ তাঁহাদের মনোনীত বালিকাকে জীবন সঙ্গিনীরূপে গ্রহণ করিতে বাধ্য করিলেন,কিন্তু ভবিতব্যের অমোঘবিধান

জানে তাহা মানিয়া লইলেন এবং অত্যন্ত স্নেহের সহিত নববধূকে গ্রহণ করিলেন। কবির মৃত্যুর পর প্রকাশিত স্ত্রীকে লিখিত 'চিঠিপত্র' হইতে আমরা জানিতে পারিয়াছি সংসার বিষয়ে কবি কী স্নেহশীল, কর্ত্তব্যপরায়ণ ছিলেন।" (রবীন্দ্রজীবনী, প্রথম খণ্ড, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় – সংশোধিত সংস্করণ— ১৩৬৭ পৌষ—১৭৬-১৭৭ পৃঃ, বিশ্বভারতী।)

এখানেও পিতৃ চরিত্রের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। মহর্ষি যখন ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেন সারদাদেবী সেসময় হিন্দুধর্মে বিশ্বাসী ছিলেন। অজিত কুমার চক্রবর্ত্তী লিখেছেন, মহর্ষি ধৈর্যের সঙ্গে স্ত্রীর অবস্থা বিবেচনা করে দেখেছেন। নিজের মত ও পথে আসবার জন্য কখনও জোর করেননি। রবীন্দ্রনাথও তাঁর স্ত্রীর নানা বিষয়ের অপূর্ণতাকে স্নেহ ও বিবেচনা নিয়ে দেখেছেন, কখনও তাঁর উপর জোর করেননি বা অধৈর্য হননি। পিতৃ চরিত্রের ধৈর্য কবিরও চরিত্রের প্রধান একটি গুণ ছিল।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর সামাজিক প্রবন্ধের বই 'সমাজে'র 'হিন্দু বিবাহ' প্রবন্ধে ও অন্যান্য নানা জায়গায় বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধতাই করেছেন। তবু দেখতে পাই তাঁর মেয়েদের অল্প বয়সে বিয়ে দিয়েছেন। মনে হয় কবির নিজের মতের চেয়ে পিতার এবং স্ত্রীর মতের প্রাধান্য দিতে হয়েছে।

তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র রথীন্দ্রনাথের উপনয়ন হয় তাঁদের বাড়ীর নিয়ম অনুযায়ী। কারণ দেবেন্দ্রনাথের ইচ্ছা তিনি মেনে নিতেন। নতুবা—"যাঁহারা রবীন্দ্রনাথকে শেষ জীবনে দেখিয়াছেন, বা যাঁহারা তাঁহার জীবনের শেষের দিকদার রচনার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত, তাঁহারা কবিকে সর্বধর্ম সর্ব সমাজ সর্ব দেশকাল-অতীত বাণীর প্রচারক বলিয়া জানিবেন। কিন্তু আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, এখন তিনি সামাজিক ব্যাপারে সম্পূর্ণরূপে পৈত্রিক পথের অনুবর্ত্তক। তাঁহাদের পরিবারের সকলকেই আদি ব্রাহ্ম সমাজের অনুষ্ঠান পদ্ধতি মানিয়া চলিতে হইত কারণ মহর্ষি এখনো জীবিত। আদি ব্রাহ্ম সমাজে পৌত্তলিক অনুষ্ঠান ব্যতীত হিন্দুসমাজের অনেক কিছুই অনুসৃত হইত-বর্ণভেদ স্বীকৃত হইত-বিবাহাদি ব্রাহ্মণ ব্যতীত অপর কাহারো সহিত নিষ্পন্ন হইতে পারিত না-উপনয়নাদি যথাবিহিতসম্পাদিত হইত, পৌরহিত্যাদি কর্মে ব্রাহ্মণেতর বর্ণের অধিকার ছিল না; তবে সকল অনুষ্ঠানই সম্পূর্ণরূপে অপৌত্তলিকভাবে সম্পাদিত হইত। রবীন্দ্রনাথ আমাদের আলোচ্যপর্বে যে এই সব অনুষ্ঠানাদির বিরুদ্ধে মতবাদ পোষণ করিতেন, তাহার কোন ব্যবহারিক প্রমাণ আমরা পাই না;

তাঁহার সে যুগের এবং পরবর্ত্তী কয়েক বৎসরের রচনার মধ্যে হিন্দু সমাজের বহু লোকাচার, ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠত্বাদির সমর্থন পাই—এমন কি আচারিক শৈথিল্যকেও সামাজিক অপরাধ বলিয়া বিবেচনা করিতেছেন দেখা যায়।" (রবীন্দ্রজীবনী-১ম খণ্ড, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, সংশোধিত সংস্করণ, ১৩৬৭ পৌষ, বিশ্বভারতী, পৃঃ ৪২১-৪২২।)

মহর্ষির মৃত্যু হয় ১৩১২ সালে (১৯০৫)। রবীন্দ্রনাথের ইচ্ছানুযায়ী তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র রথীন্দ্রনাথের বিয়ে হয় অবনীন্দ্রনাথের ছোট বোন বিনয়নী দেবীর বিধবা কন্যা প্রতিমা দেবীর সঙ্গে (১৩১৬-১৪ই মাঘ)। নিজের উদার প্রগতিশীল মতকে কবি পিতার মৃত্যুর পর প্রতিষ্ঠিত করেন।

রথীন্দ্রনাথ ও প্রতিমাদেবী নিঃসন্তান ছিলেন, তাই তাঁরা একটি গুজরাটি শিশুকে কন্যারূপে গ্রহণ করেন। কবি অন্তর থেকে এই নাত্‌নীকে গ্রহণ করেন; 'নন্দিনী' নামও তাঁর দেওয়া। এই ঘটনাগুলি থেকে বোঝা যায় পিতৃ প্রভাবমুক্ত কবির সামাজিক মত তাঁর লিখিত মতের মত সংস্কারমুক্ত উদার।

এই সংস্কারমুক্ত মনের পরিচয় তাঁর 'সমাজ' শীর্ষক প্রবন্ধের বইয়ে ও 'কালান্তরের' নানা প্রবন্ধে পাওয়া যায়। কেন যে কোন কোন লোক কবিকে পলায়নী মনোবৃত্তির অপবাদ দিয়েছেন বোঝা যায় না, আমাদের জীবনের সমস্ত আনন্দ উৎসব ও সমস্যার সঙ্গেই তো তাঁর যোগ আছে। প্রচলিত লোকাচারের সঙ্কীর্ণতা, গুরু পুরোহিতের নামে অমানবিকতা, ধর্মের নামে হীন আচার অনুষ্ঠান, শিক্ষার ত্রুটি ও অযথা অনুকরণের বিরুদ্ধে কবি বার বার আপত্তি করেছেন। তিনি বার বার উদার উন্নত মতবাদকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। দেশকালের অভিমান নিয়ে অন্যায় আর্যত্বের গর্ব না করে পশ্চিমের শিক্ষাকেও মনের দরজা খুলে গ্রহণ করে নিতে নির্দেশ দিয়েছেন। তাঁর সামাজিক মতকেই যেন তিনি বিশ্বভারতী ও শ্রীনিকেতনের কর্মক্ষেত্রে রূপ দিতে চেয়েছেন।

আমরা মহর্ষির মধ্যে জন্মগত সংগঠনী প্রতিভা লক্ষ্য করি। রামমোহন ব্রাহ্মধর্মের গোড়াপত্তন করেছিলেন ঠিকই কিন্তু তাকে লালন পালন করে শৈশব থেকে পরিপূর্ণ যৌবনে এনে এবং পরবর্ত্তী কালের মত করে গড়ে তোলেন মহর্ষি। বহুলোককে এক ভাবতন্ত্রে আনলেই কর্ত্তব্য সমাধা হয় না। তাকে স্থিতি দিতে হলে আরও অনেক কিছু করার দরকার হয়। মহর্ষিকেও তাই ধর্মের ঠিক মতামত ব্যক্ত করার জন্য 'ব্রাহ্মধর্ম' গ্রন্থ লিখতে হয়। কারণ বেদের সমস্ত অংশ তাঁদের গ্রহণীয় নয় বলে আদর্শ স্থাপনের জন্য নতুন গ্রন্থের প্রয়োজন

ছিল। এই গ্রন্থখানিকে ব্রহ্মোপনিষদ বলা যায়। এই গ্রন্থ ও ব্রাহ্মধর্মের ব্যাখ্যার জন্য 'ব্রাহ্মধর্মের ব্যাখ্যান' রচনা করেন। 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকা ব্রাহ্মধর্মের মুখপত্রে পরিণত হয়। ব্রাহ্মদের সামাজিক আচরণ অর্থাৎ বিবাহ শ্রাদ্ধ ইত্যাদি অনুষ্ঠানের জন্য তাঁকে অনেক ভাবতে হয়েছে, অনেক প্রতিকূলতার মধ্যে দিয়ে অগ্রসর হতে হয়েছে। ধীরভাবে বিবেচনা করে দীর্ঘ দিন ধরে তিনি এই সব উৎসব অনুষ্ঠানের বিধি স্থির করেছেন। ব্রাহ্মরা যখন দ্বিধা ও ত্রিধা বিভক্ত হয়ে যায় তখনও মহর্ষি প্রবর্তিত কাঠামোটি রেখেছিল। মহর্ষির শ্রেষ্ঠ কাজ এই ব্রাহ্ম সমাজ। তাঁর সন্তানদের মধ্যে একমাত্র রবীন্দ্রনাথই পিতার কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে এই গুণটি পেয়েছিলেন। শান্তিনিকেতন প্রতিষ্ঠায় তা প্রকাশ পেয়েছে। শান্তিনিকেতন ও শ্রীনিকেতন মিলিয়ে বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠান রবীন্দ্রনাথের সংগঠনী শক্তির পরিচয় বহন করে। এটা সচেতনভাবের প্রকাশ হতে পারে তবু রক্তের মধ্যে ধারা বহন করায় সম্ভব হয়েছে বলেই মনে হয়।

সামাজিক রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর উপর তাঁর পিতার প্রভাব কতখানি তা আলোচনা করে দেখা গেল। এবার আমরা রবীন্দ্রনাথের ধর্ম এবং তার উপর পিতা মহর্ষিদেবের প্রভাব কতখানি তা নিয়ে আলোচনায় আসতে পারি।

রবীন্দ্রনাথ মহামানব। তাই তাঁর ধর্ম সম্বন্ধে একেবারে দুই এক কথায় কিছু বলা সম্ভব নয়। সাধারণ লোকের কাছে ধর্মীয় আচরণই ধর্মের পর্যায়ে পড়ে। তাদের ধর্মবোধ অর্থাৎ ঈশ্বর উপাসনার রীতি পদ্ধতি বা আকাঙ্ক্ষাকেও ধর্ম বলা চলে কিন্তু এরকম একজন সূক্ষ্ম অনুভূতিশীল গভীর মানসের ব্যক্তির সম্বন্ধে তাঁর ধর্মীয় আচারটুকুর কথাই সব নয়, তাঁর উপলব্ধির কথাও জানবার আগ্রহ থাকে।

যে পরিবারে রবীন্দ্রনাথ জন্মেছিলেন সেখানে হিন্দুধর্মের নানা সংস্কারের বোঝা তাঁর জন্মের আগেই সরে গিয়েছিল। তাঁর পিতা দেবেন্দ্রনাথ বাড়ীর শিশুদের নিয়মিত ব্রাহ্মমন্ত্র আবৃত্তির দিকে লক্ষ্য রাখতেন। তাই তিনি যে অনেকখানি উপনিষদ ও ধর্মীয় আবহাওয়ায় মানুষ হয়েছিলেন সে সম্বন্ধে সন্দেহ নাই।

মহর্ষির জীবনী আলোচনা করে আমরা দেখেছি ছোটবেলা থেকেই তাঁর সৌন্দর্যবোধ ছিল। আত্মচরিতের পাঠক মাত্রেই জানেন প্রকৃতির সৌন্দর্য তাঁকে কি গভীরভাবে আকর্ষণ করত। তাঁর মধ্যে একজন ধ্যানী বা সাধক পুরুষ ছিলেন যিনি প্রকৃতির সৌন্দর্যের মধ্যে ভগবানের মহিমা উপলব্ধি

করতেন। হিমালয় ভ্রমণের বর্ণনা প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন—"কত জাতি পুষ্প প্রস্ফুটিত হইয়া রহিয়াছে, তাহা সহজে গণনা করা যায় না। শ্বেতবর্ণ রক্তবর্ণ পীতবর্ণ নীলবর্ণ স্বর্ণবর্ণ, সকল বর্ণেরই পুষ্প যথাতথা নয়নকে আকর্ষণ করিতেছে। এই পুষ্প সকলের সৌন্দর্য ও লাবণ্য, তাহাদের নিষ্কলঙ্ক পবিত্রতা দেখিয়া সে পরম পবিত্র পুরুষের হস্তের চিহ্ন তাহাতে বর্ত্তমান বোধ হইল।......আমার সঙ্গে এক ভৃত্য বনলতা হইতে তাহার পুষ্পিত শাখা আমার হস্তে দিল। এমন সুন্দর পুষ্পের লতা আমি আর কখনও দেখি নাই। আমার চক্ষু খুলিয়া গেল, আমার হৃদয় বিকশিত হইল। আমি সেই ছোট ছোট শ্বেত পুষ্পগুলির উপরে অখিলমাতার হস্ত পড়িয়া রহিয়াছে দেখিলাম" (আত্মজীবনী, ৩৫শ পরিচ্ছেদ)

"এই-যে তোমার প্রেম, ওগো
হৃদয় হরণ,
এই-যে পাতায় আলো নাচে
সোনার বরন।
এই-যে মধুর আলসভরে
মেঘ ভেসে যায় আকাশ পরে,
এই-যে বাতাস দেহে করে
অমৃত ক্ষরণ।"

একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যায় পিতার প্রভাব কতখানি কাজ করেছে। দুজনেই প্রকৃতির মধ্যে ঈশ্বরের মহিমা উপলব্ধি করেছেন। অবশ্য রবীন্দ্রনাথ পিতাকে কবিত্বে যে ছাড়িয়ে গিয়েছেন একথা বলাই বাহুল্য। তবে ঈশ্বর-মহিমা উপলব্ধির কথা বলা যায় না কে বেশী কে কম।

মহর্ষি ব্রাহ্ম সমাজের প্রতিষ্ঠাতা হলেও শান্তিনিকেতন আশ্রম অসাম্প্রদায়িক। মাঝে মাঝে সাম্প্রদায়িক করবার জন্য চেষ্টা হয়েছে, রবীন্দ্রনাথ পিতার আদর্শ মনে রেখে সেই চেষ্টা দমন করেছেন। অর্থাৎ অসাম্প্রদায়িক মন-ভাবও পিতার চরিত্র থেকেই পাওয়া।

যৌবনে ধর্ম সম্বন্ধে তাঁর যে ভাব লক্ষ্য করা যায় তা সম্পূর্ণ পিতার অনুসরণ। নিজের খুব যে আকর্ষণ ছিল বোধ হয় না, যদিও অতি অল্প বয়স থেকেই তিনি ব্রহ্মসঙ্গীত রচনা করে যাচ্ছেন একথা ঠিক। তাঁর নিজের মধ্যে যে অধ্যাত্ম উপলব্ধি হয়েছিল তা মনে হয় না। তখনই তিনি মানুষ ও প্রকৃতির

সঙ্গে একাত্ম হয়েছিলেন, তাদের আত্মার আত্মীয় ভেবেছেন ; কিন্তু ব্রহ্মের উপলব্ধি আসে আরও পরে। প্রথম বয়সের ব্রহ্মসঙ্গীত তাঁর অন্তরের ভাবকে অনুসরণ করে দরদী কবির লেখা হয়েছে কিন্তু পরে 'গীতাঞ্জলি' পর্বে ও 'নৈবেদ্যে'র কবিতায়—"ব্যক্তিগত আধ্যাত্মিক জীবনের সঙ্গে সমষ্টি যোগ চেষ্টা হইতেছে 'নৈবেদ্যের' কবিতাগুচ্ছের বাণী"। শান্তিনিকেতনের উপদেশমালায় কবি-জীবনের একটি বিশেষপর্বের সাধনালব্ধ ধ্যানের ও অনুভূতির প্রকাশ। প্রথম জীবনের আচরনীয় ধর্মবোধ ক্রমে ক্রমে তাঁর জীবনের মধ্যে বিকশিত হয়েছে। নিজের অধ্যাত্ম অনুভূতির গভীর উপলব্ধিগত রসরূপ তাঁর নানা গানে, শান্তিনিকেতনের উপদেশমালায়, 'ধর্ম' গ্রন্থে, 'গীতাঞ্জলি'র পাতায় পাতায় ও 'নৈবেদ্যর' প্রতি ছত্রে। তার পরের রচনায় যে এই অনুভূতির কথা নেই তা নয় তবে এমন একত্রিত ভাবে নয়, নানা জায়গায় ছড়িয়ে আছে।

"রবীন্দ্র সাহিত্য যাঁহারা গভীরভাবে অধ্যয়ন ও তাঁহার সঙ্গীত শুদ্ধভাবে শ্রবণ করিবার অবকাশ পাইয়াছেন. তাঁহারা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করিয়াছেন যে, ঈশ্বর বিশ্বাস কবির আশৈশবের সংস্কার। তবে তিনি ঈশ্বরকে যেভাবে কল্পনা করিতেন, তাহা যে কেবল লৌকিক হিন্দু ধর্ম হইতে পৃথক তাহা নহে, তাহা ব্রাহ্ম ধর্মানুমোদিত ব্রহ্মজ্ঞান হইতেও অন্যরূপ, তাঁহার ধর্ম তাঁহার নিজেরই।" (রবীন্দ্রজীবনী—২য় খণ্ড-প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়—১৮৪ পৃঃ। সংস্করণ—১৩৫৫ মাঘ-বিশ্বভারতী।)

"রবীন্দ্রনাথের উপরে উপনিষদের প্রভাব সর্বজনবিদিত। এজন্য কোন প্রমাণ—প্রয়োগের অপেক্ষা রাখেনা। একেবারে স্বতঃ প্রকাশ। একেবারে প্রথম যুগের কাব্য—কবিতা—সঙ্গীত ও গদ্য রচনা হইতে আরম্ভ করিয়া মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বের লেখা পর্য্যন্ত সব লেখার মধ্যেই এই সত্যের পরিচয় আছে। কোথাও একটু গূঢ়, কোথাও ঈষৎ রূপান্তরিত, কোথাও একেবারে স্পষ্ট।" (রবীন্দ্রায়ণ—১ম খণ্ড—পুলিন বিহারী সেন সম্পাদিত, উপনিষদ ও রবীন্দ্রনাথ, শশীভূষণ দাশগুপ্ত—৩৬ পৃঃ, রবীন্দ্রজন্মশতবর্ষপূর্তি—বাক্‌সাহিত্য।)

উপনিষদ্ যে কবির জীবনের সঙ্গে এমনভাবে জড়িয়ে গিয়েছে তার মূলে পিতৃপ্রভাব কাজ করেছে। মহর্ষির ধ্যানরস—রসিকতার ভাবটি সব থেকে জ্যেষ্ঠ পুত্রের মধ্যে বিকশিত হয়েছিল এ কথা ঠিক ; কিন্তু কনিষ্ঠও এই গুণ পেয়েছিলেন। মহর্ষি বা দ্বিজেন্দ্রনাথের মত সুদীর্ঘ সময় ধ্যানে ব্যয় না করলেও রবীন্দ্রনাথও ধ্যানে সময় কাটাতেন জানা যায়। শান্তিনিকেতন উপদেশমালা

রচনায় পূর্বের কথায় অধ্যাপক বিশী তাঁর 'রবীন্দ্রকাব্যপ্রকৃতি ও জীবন সাধনার উপরে দেবেন্দ্রনাথের প্রভাব' প্রবন্ধে বলেছেন,—"আচার্য ক্ষিতিমোহন সেনের কাছে শুনেছি যে এই সময়টায় শেষরাতে উঠে রবীন্দ্রনাথ বসতেন, সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে ধ্যানভঙ্গ হত। ক্ষিতিমোহন সেন প্রমুখ তৎকালীন কয়েকজন শান্তিনিকেতনিকের আকিঞ্চনে ধ্যানভঙ্গান্তে রবীন্দ্রনাথ কিছু উপদেশ দিতে রাজি হন।" (বিশ্বভারতী পত্রিকা, বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৭৫—২৭০ পৃঃ।)

মহর্ষির ভ্রমণের ঝোঁক ছিল যে সময় ভারতের সর্বত্র রেলপথ বিস্তৃত হয়নি, সেই কষ্টসাধ্য ভ্রমণেও মহর্ষি ভারতের প্রায় সর্বত্র গিয়েছেন। ভারতের বাইরেও চীনদেশ ও সিংহল ঘুরে এসেছেন। পিতার এই ভ্রমণের আগ্রহ রক্তের অধিকারে রবীন্দ্রনাথও পেয়েছিলেন। আর তাঁর ভ্রমনের পরিধি যে সুবিস্তৃত একথা সকলেরই জানা আছে। একমাত্র অষ্ট্রেলিয়া ছাড়া পৃথিবীর আর সব জায়গাতেই তিনি একাধিক বার গিয়েছেন। মহর্ষি সাধনার জন্য ভ্রমণে বার হতেন, রবীন্দ্রনাথের ভ্রমণই সাধনা ছিল। 'পথের দুধারে আছে মোর দেবালয়', 'পথ চলাতেই আনন্দ'—ইত্যাদি গানে তার পরিচয় মেলে। আধ্যাত্মিক প্রভাব ভিন্ন এই স্বভাব-ধর্মেও মিল দেখা গেল পিতা-পুত্রের।

রবীন্দ্রনাথের ধর্ম আচরণ অর্থাৎ লৌকিক ধর্ম এবং আধ্যাত্মিক উপলব্ধি তাঁর জীবনের মূল ধর্ম অর্থাৎ বিশ্বমানবিকতার সঙ্গে এক তা আমরা দেখেছি। তাঁর আর এক ধর্মের কথা তবুও বলা হয়নি। তা হচ্ছে তাঁর স্বধর্ম। তিনি কবি তাই কাব্য রচনাই তাঁর আসল ধর্ম। তিনি নিজেও বলেছেন, "কবিরে খুঁজিছ যেথা সেথা সে নাহিরে"। অর্থাৎ তাঁর সম্পূর্ণ ব্যক্তিত্বের বিকাশ যেন লৌকিক জীবনের মধ্যে নয়, কাব্যের মধ্যে। তাঁর সৃষ্টির মধ্যেই তাঁর জীবনের সব আশা ও আদর্শ, জ্ঞান ও উপলব্ধি রয়েছে। রাজনৈতিক নেতারা তাঁর স্বাদেশিকতায় যদিও ঠিক খুসি হতে পারেননি তবু দেখা যায় তাঁর স্বদেশী সঙ্গীত তখনকার উদ্দীপনার ও দেশপ্রেমের মন্ত্র স্বরূপ ছিল, আর তারই একটি আজ আমাদের জাতীয় সঙ্গীত। গানে তাঁর ধর্মবোধও মূর্ত হয়েছে। তাঁর সৃষ্টিই তাঁর ধর্ম। তিনি লিখেছেন—'মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।'

সকলেই জানেন রবীন্দ্রনাথ ছিলেন সৌন্দর্যের পূজারী। এই সৌন্দর্যকে উপভোগ করবার যে অনুভূতি তা তিনি পিতার কাছ থেকে সহজাত আশীর্বাদ রূপে পেয়েছিলেন। মহর্ষি হিমালয় ভ্রমণের সময় একজন কবির চোখ দিয়ে সৌন্দর্য উপভোগ করেছেন, আবার সাধকের চোখে তাঁর মহিমা উপলব্ধি

করেছেন। তাঁর আত্মচরিত পড়লে কেবল অধ্যাত্ম সাধনার তথ্যই জানা যায় না একজন সৃষ্টিশীল সাহিত্যিকের স্পর্শ পাওয়া যায়। এই গুণটি মহর্ষির অন্য পুত্রদের মধ্যেও পাওয়া যায়—আর রবীন্দ্রনাথে তা পরিপূর্ণ। বাড়ীর সাহিত্যিক আবহাওয়া সম্বন্ধে জীবনস্মৃতির পাঠকের কাছে বেশী বলার প্রয়োজন হয় না।

মহর্ষির জীবনী আলোচনাকালে আমরা দেখেছি তিনি মাত্র একুশ বৎসর বয়সে দিদিমার মৃত্যুর সময়ে অকস্মাৎ এক আনন্দানুভূতিতে নিমজ্জিত হন। তাঁর আধ্যাত্মিক জীবন বিকাশের সূচনা এইখানে। রবীন্দ্রনাথও অকস্মাৎ একদিন সদরষ্ট্রীটের বাড়ীতে সকাল বেলা তাঁর কবি-মন উন্মোচনের এক গভীর অনুভূতির উপলব্ধিতে প্লাবিত হন ঐ একুশ বৎসর বয়সেই। মহর্ষি ও রবীন্দ্রনাথ দুজনেরই আত্মবিকাশের কেন্দ্র বিন্দু হিসাবে ঐ উন্মোচনীর মূল্য অনস্বীকার্য। সেদিনের সেই ক্ষণিক আনন্দকে স্থিরভাবে জীবনে পাবার জন্য দুজনেই সাধনা করেছেন। মহর্ষির 'আত্মজীবনী' ও রবীন্দ্রনাথের 'জীবন-স্মৃতির' সাহিত্যিক ঐশ্বর্যকে সম্পূর্ণ স্বীকার করেও বলা যায় এই দুই মনীষীর জীবনের গভীর উপলব্ধিকে বহন করছে বলে বই দুইটির ঐতিহাসিক মূল্য অপরিসীম। এদুটির আরও সাদৃশ্যও আছে। বই দুটি জীবনচরিত হলেও গতানুগতিক ধারায় রচিত নয়। জীবন খণ্ডের পরিচয় আছে। মনে হয় কবি পিতার জীবনচরিত থেকেই অনুপ্রেরণা' পেয়েছিলেন। এই প্রসঙ্গে বলা যায় 'ব্রাহ্মধর্মের ব্যাখ্যান' সম্ভবতঃ 'শান্তিনিকেতন উপদেশমালা' সৃষ্টির প্রেরণা হিসাবে কাজ করেছে। দুজনেই চল্লিশ বছরের পর পঞ্চাশের কাছাকাছি সময়ে এই বই দুটি রচনার পুর্বে উপদেশ দিতেন। এদুটির আলোচনা হলে দেখা যাবে রবীন্দ্রনাথ পিতার দ্বারা কতখানি প্রভাবিত হয়েছিলেন। বহু শ্লোক মহর্ষির পর তিনিও ব্যাখ্যা করেছেন। দুজনের প্রতিভার পার্থক্য অবশ্য ছিল তাই প্রকাশভঙ্গীর পার্থক্য আছে, কিন্তু মূলে দুজনে এক সত্যের অভিমুখেই গিয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথের নানা রচনায় আমরা মহর্ষির প্রশস্তি পেয়েছি। পিতার প্রতি মহর্ষির পুত্রদের সকলেরই অসীম শ্রদ্ধা ছিল কারণ তিনি পুত্রদের সামনে উচ্চ আদর্শ তুলে ধরতে পেরেছিলন। পিতার মৃত্যুর পর হঠাৎ মহর্ষি বিপুল ঋণভারে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েন। সে সময়ে অনেকেই তাঁকে পরামর্শ দেন কিন্তু তিনি সম্পত্তির দিক থেকে ক্ষতিগ্রস্ত হলেও সামান্যতম অসত্যের বা অন্যায়ের পথে যাননি।

"রবীন্দ্রনাথের কথা শুনবার সৌভাগ্য যাঁদের হয়েছিল তাঁরা নিশ্চয় লক্ষ্য করেছেন পিতৃদেব ও বাবামশায় বলতে তাঁর কণ্ঠ ও চোখে-মুখে কী গভীর ভক্তি উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠত। এখানে একটি পত্রখণ্ড উদ্ধার করছি মহর্ষির উপরে চরম নির্ভরশীলতার একটি দৃষ্টান্তরূপে। মাঘোৎসবে সমান হবে গীত হওয়ার উদ্দেশ্যে একজন আত্মীয়ার লিখিত একটি গান ইন্দিরা দেবী পাঠিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথকে। রবীন্দ্রনাথ মন্তব্য করছেন "একটা কথা মনে রাখিস্ 'সর্ব্বংখলু ব্রহ্ম' এ মত আদি বা সাধারণ বা কোনো ব্রাহ্মসমাজেরই নয়'।— "সর্ব্ব জীবে আছে ব্রহ্ম'' বললে দোষ খণ্ডন হয়, হয়তো "সর্ব্বগত ব্রহ্ম" ছন্দে মিলতে পারে, মিলুক বা না মিলুক 'সর্ব্বংখলু ব্রহ্ম' কোন মতেই যেন ব্যবহার না করা হয় - মনে রাখিস বাবামশায় থাকলে তিনি কিছুতেই এসহ্য করতেন না।" তখন রবীন্দ্রনাথের বয়স চুয়াত্তর, এই সুপরিণত বয়সেও মহর্ষির উপরে কী গভীর নির্ভরশীলতা। মহর্ষির সাধনার উত্তুঙ্গ শিখর সর্বদা চোখে জাগছে কিনা।'' (বিশ্বভারতী পত্রিকা, বৈশাখ-আষাঢ়-১৩৭৫-রবীন্দ্র কাব্য প্রকৃতি ও জীবন সাধনার উপর দেবেন্দ্রনাথের প্রভাব—প্রমথনাথ বিশী। ২৬৬-২৬৭ পৃঃ।)

রবীন্দ্রনাথের মানবিকতা ধর্মের আর এক উদাহরণ হিসাবে উল্লেখ করা যায়—"দুঃখে যে জন অনুদ্বিগ্নমনা সুখে যে জন বিগতস্পৃহ সে তো শান্ত; শান্তরস কি রস? খৃষ্টান মিষ্টিক তরুণ সাধককে বলেছেন, যা বলার এই বেলা বলে নাও। ব্রহ্ম প্রাপ্তির পর যে অভূতপূর্ব আনন্দ পাবে তখন আর কোন কিছু বলতে চাইবে না।

চতুর্দিক থেকে তারস্বরে প্রতিবাদ উঠবে– আমি জানি—তবু ক্ষীণ কণ্ঠে নিবেদন করে যাই, রবীন্দ্রনাথ সেই ব্রহ্মানন্দে লীন হতে চাননি। তিনি আমাদের মত পাপীতাপীদের যে ভাঙা নৌকা, সেটা ছেড়ে দিয়ে চলে যেতে চাননি। সুখের মলয় বাতাসে ঝঞ্ঝাবাতের ক্রূর আঘাতে নিমজ্জমান তরীতে বসে তিনি আমাদের শুনিয়েছেন, আমাদেরই হৃদয়ের গীতি—যে গীতির প্রকাশ ক্ষমতা আমাদের নেই।

যুধিষ্ঠিরের মত স্বর্গারোহন করতে চাননি।'' (বড়বাবু-সৈয়দ মুজতবা আলী—রবীন্দ্রনাথের আত্মত্যাগ-৪১ পৃঃ, ১ম সং, মিত্র-ঘোষ।)

এখানে লেখক রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টিধর্ম ও মানবধর্মের কথা বলেছেন। একটিকে ছেড়ে আর একটির কথা বলাই যায় না এমন অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। এখানেও

মহর্ষির প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। মহর্ষিও ব্রহ্মানন্দ একা ভোগ করতে চাননি। তিনি সাধারণের জন্য সর্বদা অনুভব করেছিলেন তাই তাদের জন্য তাঁর সুচিন্তিত উপদেশমালা।

রবীন্দ্রনাথ জীবনে বারবার আঘাত পেয়েছেন। অল্প বয়সে মা মারা যান। প্রথম যৌবনের অন্তরঙ্গ সঙ্গী বৌঠান কাদম্বরীদেবী আত্মহত্যা করেন। মাত্র ৪০ বৎসর বয়সে স্ত্রী মারা যান। সেই বছরই মেজো মেয়ে রেণুর মৃত্যু। স্ত্রীর মৃত্যুর পাঁচ বছর পর আকস্মিকভাবে ছোট ছেলে শমীন্দ্রনাথের মৃত্যু হয়। এতেই শেষ নয়, দশ বছরের মধ্যেই বড় মেয়ে মাধুরীলতা চলে যান। বৃদ্ধ বয়সে (৭১) ছোট মেয়ে মীরা দেবীর ছেলে নীতুর মৃত্যু হয় জার্মানীতে। মৃত্যুর সময় তার মা তার কাছে ছিলেন। তিনি যেদিন বোম্বাই পৌছান তার কদিন আগে কবি তাঁকে চিঠি লিখে পাঠিয়েছিলেন; তার মধ্যে আছে—"যে রাত্রে শমী গিয়েছিল সে রাত্রে সমস্ত মন দিয়ে বলেছিলুম বিরাট বিশ্বসত্তার মধ্যে তার অবাধ গতি হোক, আমার শোক তাকে একটুও পিছনে যেন না টানে। তেমনি নীতুর চলে যাওয়ার কথা যখন শুনলুম তখন অনেকদিন ধরে বারবার বলেছি, আর তো আমার কোন কর্ত্তব্যই নেই, কেবল কামনা করতে পারি এর পরে যে বিরাটের মধ্যে তার গতি, সেখানে তার কল্যাণ হোক্। যেখানে আমাদের সেবা পৌছায় না, কিন্তু ভালবাসা হয়তো বা পৌছয়—নইলে ভালবাসা এখনও টিঁকে থাকে কেন?.................................. . ...

এ চিঠি মুক্ত পুরুষের লেখা চিঠি নয় কারণ গীতায় আছে মুক্ত পুরুষ দুঃখে অনুদ্বিগ্নমনা। রবীন্দ্রনাথ দুঃখে আমাদের মতই কাতর হতেন হয়তো আরও বেশী; কারণ তাঁর দিলের দরদ, হৃদয়ে স্পর্শকাতরতা ছিল আমাদের চেয়ে লক্ষ্যগুণ বেশী—কিন্তু তিনি পরাজয় মানতেন না। আমরা পরাজয় মেনে নিই।" (বড়বাবু—মৃত্যু-সৈয়দ মুজতবা আলী-২২৯-২৩০ পৃঃ, ১ম সংস্করণ-মিত্র-ঘোষ।)

আমরা কবির সূক্ষ্ম অনুভূতি, দরদ, প্রেম ও মানবধর্মের পরিচয় পেয়েছি বারবার। তাঁর শান্ত ধৈর্য অনেক সময় সাধারণের চোখে অন্য রূপ পেয়েছে। কারণ তিনি সাধারণের বুঝবার অনেক উপরের স্তরে ছিলেন। এখানেও কবি পিতৃপ্রভাবে প্রভাবান্বিত। মহর্ষির স্ত্রীর মৃত্যুর সময় তাঁর শান্তভাবের কথা জানা যায়। তৃতীয় পুত্র হেমেন্দ্রনাথ ও বড় জামাতা সারদাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়ের অকাল মৃত্যুও মহর্ষি অত্যন্ত ধৈর্যের সঙ্গে গ্রহণ করেছিলন।

"আমাদের সব থেকে বড় কবি রবীন্দ্রনাথ। তিনি আর পাঁচটা রসের সঙ্গে হাস্যরসও আমাদের পরিবেশন করেছেন, অথচ কেউ কি কখনও চিন্তা করে, তাঁর জীবনটা কি রকম বিষাদ বহুল ঘটনায় পরিপূর্ণ? আমার দৃঢ় বিশ্বাস অন্য যে-কোন সাধারণজন এ রকম আঘাতের পর আঘাত পেলে কিছুতেই আর সুস্থ জীবন যাপন করতে পারতো না। অথচ রবীন্দ্রনাথকে দেখলে বোঝা যেত না, কতখানি শোক তিনি বুকের ভিতর বয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছেন। তিনি ভেঙে তো পড়েনইনি, এমন কি তীব্র শোকাবেগে কখনও তাঁর 'ধর্ম' সেটি থেকে বিচ্যুত হননি। তাঁর সম্বন্ধে বলতে গিয়ে তাঁর ঋষি তুল্য জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বলেন — "আমাদের সকলেরই পা পিছলিয়েছে— রবির কিন্তু কখনও পা পিছলোয়নি।" (বড়বাবু-মৃত্যু-সৈয়দ মুজতবা আলী—২২২ পৃঃ। ১ম সংস্করণ —মিত্র ঘোষ)।

রবীন্দ্রনাথের ধর্ম সম্বন্ধে মোটামুটি একটা আলোচনা হলেও তাঁর নিজের কাব্য ধর্ম নিয়ে আলোচনা না করলে যেন আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যায়।

"রবীন্দ্রনাথ জীবনস্মৃতি গ্রন্থে সরাসরি দাবি করেছেন যে 'আমার তো মনে হয় আমার কাব্য-রচনার একটি মাত্র পালা, সে পালার নাম দেওয়া যাইতে পারে সীমার মধ্যে অসীমের সহিত মিলন সাধনের পালা'। পরবর্তীকালে কাব্যতত্ত্ব বিচার করিতে বসিয়া এই মন্তব্যকেই তিনি সমর্থন করিয়াছেন। আবার, জীবন স্মৃতি রচনার পূর্বে যখন তিনি কাব্যতত্ত্ব আলোচনা করিয়াছেন তখনও ইহাকেই সমর্থন করিয়াছেন। সব জায়গায় ভাষা যে এক তাহা নয়, কিন্তু ভাবটা ভিন্ন নয়। কাজেই রবীন্দ্রনাথ বিবৃত সূত্রটিকে তাঁহার কাব্যতত্ত্বের মূলসূত্র বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে।" (রবীন্দ্রায়ণ—পুলিনবিহারী সেন সম্পাদিত ১ম-তিন জগৎ প্রমথনাথ বিশী—পৃঃ ১—জন্ম শতবর্ষপূর্তি উৎসবে রচনার্থ)।

রবীন্দ্র কাব্যের মূলসূত্র এই সীমা অসীমের মিলন। প্রথম যুগের আকৃতির মধ্যেও যেন এর একটা আভাস বা পদধ্বনি ছিল, তারপর যখন অকস্মাৎ একদিন আবরণ উন্মোচিত হল সেদিন থেকে কবি অনেকখানি নিজের মতে সাবলীল।

রবীন্দ্রনাথ যে বলেছেন 'সীমার মধ্যে অসীমের মিলন সাধনের পালা আমার কাব্য সাধনার একমাত্র পালা', এই আদর্শও তিনি পিতার জীবন থেকে লাভ করেছেন। পিতার ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্বরূপ ও আধ্যাত্মিক জীবনের সঙ্গে বিরোধ ছিল না। তিনি সংসারকে কিছুমাত্র অবহেলা না করেও আধ্যাত্মিক সমুন্নতি

লাভ করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ বাল্যকাল থেকে এই আদর্শ দেখে তাকে অনুভব ও উপলব্ধি করে তাঁর সাধনার বিষয় করেছেন।

রবীন্দ্রনাথ পরিণত বয়সের রচনার মধ্যে এক জায়গায় বলেছেন—

"আমারে বলে যে ওরা রোমান্টিক
সে কথা মানিয়া লই
রসতীর্থ পথের পথিক।"

এই রোমান্টিক ধর্ম কবির শৈশব থেকেই লক্ষ্য করা যায়। জনকোলাহলপূর্ণ বাড়ীতে থেকেও মানুষেব থেকে তিনি বেশী আগ্রহী হয়েছিলেন জানালার ফাঁক দিয়ে দেখা প্রকৃতির হাতছানিতে। আবার যখন প্রকৃতির কোলের মাঝখানে বসে, তখন প্রকৃতির সঙ্গে তো একাত্ম ছিলেনই তার থেকেও বেশী মানুষেব কথাই ভেবেছেন। অর্থাৎ কাছের কথা বললেও দূরের ভাবনায় বিভোর হবার তাগিদ যেন ছিল শৈশবকাল থেকেই—আর এটা রোমান্টিকতার সব থেকে বড় একটি লক্ষণ।

রামমোহনকে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন তাঁর hero। এই দেখার চোখ তিনি পিতার কাছ থেকে পেয়েছিলেন। পিতার লেখায় পাই রাজার মুখের দিকে তিনি তাকিয়ে থাকতেন। তাঁর কাছ থেকে জেনে কবিও রামমোহনকে প্রত্যক্ষ করতেন বলে তাঁর মনে হত। রামমোহনকে আদর্শ করার পিছনেও পিতার প্রভাব কাজ করেছে।

সমগ্র রবীন্দ্র সাহিত্য পাঠ করে দেখা যায় তাঁর পরিচিত নানা চরিত্র জানিত বা অজানিতভাবে সাহিত্যে স্থান পেয়েছে। অধ্যাপক বিশীর মতে 'রাজর্ষী' উপন্যাসের গোবিন্দমাণিক্য চরিত্র দেবেন্দ্রনাথের আদর্শে রচিত। 'গোরা' উপন্যাসের পরেশবাবু চরিত্রেও তিনি দেবেন্দ্রনাথের চরিত্রের ছায়া লক্ষ্য করেছেন।

এই সব প্রভাব ছাড়াও আরও লক্ষ্য করলে দেখা যায় তাঁর জীবনের কর্মধারায় পিতার প্রভাব কি ভাবে কাজ করেছে। ৭ই পৌষ মহর্ষির দীক্ষা দিবস। এই দিনটির সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের নানা রচনায় শ্রদ্ধা প্রকাশ পেয়েছে। মনে হয় ঐ দিনের সান্নিধ্য পাবার জন্যই ৮ই পৌষে শান্তিনিকেতন আশ্রম প্রতিষ্ঠা।

"রবীন্দ্রনাথের শেষ জীবনের আবাস উত্তরায়ণ। এর মধ্যেও প্রচ্ছন্নভাবে

৭ই পৌষকে তিনি স্মরণ করে গিয়েছেন বলে মনে হয়। মাঘাদি ছয় মাস রবির উত্তরায়ণ হলেও বস্তুতঃ উত্তরায়ণের আরম্ভ ২২শে ডিসেম্বর বা ৭ই পৌষ। কবির ক্রান্তদর্শী চোখে যে এটি এড়িয়ে গিয়েছে মনে হয় না। যদি আমার অনুমান সত্য হয় তবে বুঝতে হবে যে ৭ই পৌষের মহিমাচ্ছায়ায় মণ্ডিত আবাসে শেষজীবন যাপন করেছেন রবীন্দ্রনাথ।" (বিশ্বভারতী পত্রিকা—রবীন্দ্র কাব্যপ্রকৃতি ও জীবন সাধনার উপরে দেবেন্দ্রনাথের প্রভাব। প্রমথনাথ বিশী, ২৬৭ পৃঃ)।

প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে পরিণত বয়সের রবীন্দ্রনাথ-এর চেহারা পরিণত বয়সের দেবেন্দ্রনাথের ছবির সঙ্গে অদ্ভুত সাদৃশ্যযুক্ত। দুইজনের মৃত্যুও হয়েছে একভাবে। দুজনেই সুপরিণত বয়সে অস্ত্রোপচারের পরে দ্বিপ্রহরে 'অসতো মা সদ্গমোদয় শুনতে শুনতে পরলোক গমন করেন। জীবনে ও মৃত্যুতে এমন প্রভাব বড় দেখা যায় না।

এ পর্যন্ত আমরা মহর্ষির সঙ্গে কবির সাদৃশ্য ও প্রভাব লক্ষ্য করেছি কিন্তু কবির উপর প্রভাব সম্পূর্ণভাবে মেনে নিলেও তাঁর স্বাতন্ত্র্য অস্বীকার করা যায় না। মহর্ষি ছিলেন ভক্তিমার্গের লোক, অদ্বৈতবাদ সহ্য করতে পারতেন না। রবীন্দ্রনাথের আদর্শ রামমোহন আর আদর্শ পিতা দেবেন্দ্রনাথ। তাত্ত্বিক রবীন্দ্রনাথ ও কবি রবীন্দ্রনাথে পার্থক্য পাওয়া যায়। তাত্ত্বিক রবীন্দ্রনাথ এক:র সাধক কিন্তু কবি রবীন্দ্রনাথ বলেন 'একাধারে তুমিই আকাশ তুমিই নীড়।' 'এই Contradiction-এর জন্য রবীন্দ্র সাহিত্য এত অকর্ষণীয়।

"অজিতকুমার চক্রবর্ত্তী বলিয়াছেন যে রবীন্দ্র সাহিত্যের মূল প্রেরণা বিশ্ববোধ। এখন, এই বিশ্ববোধ আর রবীন্দ্র-কথিত সীমা অসীম অর্থাৎ সীমার মধ্যেই অসীমের সহিত মিলন সাধন ভিন্ন নয়। রবীন্দ্রনাথের বিশ্ব সর্ব-ব্যাপক। তাহা একই সঙ্গে সীমা-অসীমে সমন্বিত, ভূমা ও ভূমিতে গঠিত। মানুষ প্রকৃতি ও ব্রহ্ম তাহার তিন চরম উপাদান। চতুর্থ আর কিই বা সম্ভব। এই জন্যই তাহাকে সর্ব ব্যাপক বলিয়াছি। মায়াবাদী শুধু ব্রহ্ম বলিবেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে এভাবে ভাগ করা চলিবে না, স্পষ্টতঃ বিশ্বকে তিনভাগে ভাগ করিয়া মানুষ প্রকৃতি ও ব্রহ্ম বলিতে হইবে।........................

ধরিয়া লওয়া যাক্ যে রবীন্দ্রসাহিত্যের মূল প্রেরণা যে বিশ্ববোধ, সে বিশ্বের মূল উপাদান তিনটি—মানুষ, প্রকৃতি ও ব্রহ্ম। তিনি যখন সীমার মধ্যেই অসীমের মিলন সাধনের পালা বর্ণনা করেন তখন এই তিনের লীলা ব্যাখ্যা

করিতে চেষ্টা করেন। তাঁহার দৃষ্টিতে মানুষ ও প্রকৃতি বিশ্বের সীমার কোটি, আর ব্রহ্ম বিশ্বের অসীমের কোটি। তিনি বলিতে চান যে, স্বভাবতঃ যিনি নির্গুন তিনি সেচ্ছায় সীমার মধ্যেই সৌন্দর্যরূপে ধরা দিতেছেন, আর স্বভাবতঃ যিনি নির্বিকার তিনি সীমার মধ্যে সৌন্দর্যরূপে ধরা দিতেছেন। কেন তাঁহার এমন খেয়াল হইল কেহই বলিতে পারে না - ইহাই তাঁহার লীলা। সীমা ও অসীমের এই বিচিত্র লীলার আসর রবীন্দ্রসাহিত্য"। (রবীন্দ্রায়ণ-১ম খণ্ড—তিন-জগৎ-প্রমথনাথ বিশী—পৃঃ ২। পুলিন বিহারী সেন সম্পাদিত।)

আমরা রবীন্দ্রজীবনী ও দেবেন্দ্রনাথের জীবন-সাধনা আলোচনা করে দেখতে পেলাম আর কোন মানুষের প্রভাবে কবি এতখানি প্রভাবান্বিত হননি। পিতার আদর্শ ও ভাবধারা তাঁর মধ্যে অনেকখানি এক হয়ে যায়। মহর্ষির ধর্মীয় পরিমণ্ডলে রবীন্দ্র-জীবন অনেকখানি প্রভাবিত হয়েছিল, তাঁকে তাঁর নিজের ধর্মমতের দিকে অগ্রসর করেছিল কিন্তু তাঁর ধর্মমত সম্পূর্ণ তাঁর নিজের। এর সঙ্গে একটি ধর্ম সম্প্রদায়ের যোগ নাই, আছে তাঁর নিজের মনের উপলব্ধি থেকে পাওয়া নতুন ধর্মবোধ। তাই তাঁর আধ্যাত্মিক রচনা পড়লে কোন সম্প্রদায় বিশেষের বলে মনে না হলেও ধর্মের মূল বক্তব্য পরিস্কার হয়ে যায়। সমস্ত সঙ্কীর্ণতার উর্দ্ধে বিশ্বমানবিকতার বাণীই রবীন্দ্রনাথের মূল ধর্ম, আর এই মূল ধর্মের প্রেরণাতেই তিনি পিতার মৃত্যুর পর সামাজিক মতে অনেকখানি সংস্কারশূন্য উদার ভাবের পরিচয় দিয়েছেন। তবে খানিকটা স্বাতন্ত্র্য থাকলেও একেবারে প্রভাবমুক্ত কখনও হননি।

॥ ১০ ॥

॥ "ত্রয়ী" রচনাকালে রবীন্দ্র-মানস ও পরিবেশের কথা ॥

সৃষ্টির সঙ্গে স্রষ্টার মন জড়িয়ে থাকে, আর সামাজিক রাষ্ট্রীয় ও পারিবারিক পরিবেশ তাঁকে অনেকখানি নিয়ন্ত্রিত করে। তাই শিল্প সম্বন্ধে আলোচনা করতে হলে শিল্পীর তৎকালীন পরিবেশ সম্বন্ধে বিশেষভাবে জানা দরকার। কারণ, সম্পূর্ণ নৈর্বক্তিক রচনার মধ্যেও শিল্পীর ইচ্ছা, আকাঙ্ক্ষা, আদর্শ ও প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন একজন কবি। গীতিকবিতার মূল কথা কবি মনের গভীর উপলব্ধির বাণীকে রূপ দেওয়া। অর্থাৎ কবির অন্তরের কথাটি জানান। তাই দেখা যায় সম্পূর্ণ নৈর্বক্তিক রচনা উপন্যাস ও নাটকেও তিনি নিজেকে সম্পূর্ণভাবে সরিয়ে রাখতে পারেননি। আমরা যেন তাঁকে এই সব সৃষ্টির মধ্যে অনুভব করি। সেইজন্য এই বইগুলি রচনার সময়ে তাঁর মনে কি ভাবাদর্শ কাজ করেছে আমাদের জানার আগ্রহ জাগে আরও বেশী।

কবির সঙ্গে সমাজের সম্বন্ধ খুব বেশী নয়। কারণ সময় ও স্থান ছাড়িয়ে স্বপ্নময় কাল্পনিক জগতে বিচরণই লিরিক রচনার মূল কথা। তবুও কবির মন ও পরিবেশের কথা জানতে হয়। আর উপন্যাসের আলোচনায় পরিবেশের প্রশ্ন আরও জোরালো। বিশেষ করে রবীন্দ্র জীবনের এই পর্ব খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সমগ্র রবীন্দ্রজীবনী ও রবীন্দ্র সাহিত্য আলোচনা করলে দেখা যায় এই পর্বের একটা স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য আছে। রবীন্দ্রনাথ প্রায় বালক বয়স থেকে ধর্ম-বিষয়ে অর্থাৎ ব্রহ্মসঙ্গীত রচনা করেছিলেন। সেই ভক্তিগীতি ভিন্ন তাঁর ধর্মীয় মতামত এই পর্বের আগে পাওয়া যায় না। এই সময়ের কিছু আগে থেকে তিনি হিন্দুত্বের আদর্শে ও প্রাচীন তপোবনের পরিমণ্ডলে নিমগ্ন হন; আবার এই পর্বেরই শেষের দিকে তাঁর এই ভাবাবেগের মুক্তি হয়, তিনি তাঁর মূল আদর্শ বিশ্বমানবিকতার দৃঢ় ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত হন। রবীন্দ্রনাথের ধর্মবোধ কোন লোকাচার, দেশাচার বা বিশেষ গণ্ডীতে আবদ্ধ নয়, তা চিরকালের ধর্মবোধের কথা। আমরা এই সময়ের বক্তৃতাবলীতে সে মত 'শান্তিনিকেতন' ও 'ধর্ম' গ্রন্থে পাই। 'নৈবেদ্য', 'উৎসর্গ', 'খেয়া' ও 'গীতাঞ্জলির' মধ্যে রবীন্দ্র-ধর্মের ক্রমবিকাশের ইতিহাস আছে। রবীন্দ্রনাথের 'ত্রয়ী' রচনার সময়েই তাঁর স্বদেশ চিন্তার সুপরিচ্ছন্ন স্পষ্ট মতামত পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথ প্রায় প্রথম যুগ থেকে স্বাদেশিকতাকে খানিকটা অপ্রসন্ন দৃষ্টিতে দেখে এসেছেন। 'বৌঠাকুরাণীর হাট'

তাঁর প্রথম যুগের উপন্যাস। সেখানেও তিনি স্বাদেশিকতার থেকে মানবিকতাকে বেশী মান্য দিয়েছেন। অর্থাৎ তাঁর মনে অল্পবয়সেও স্বাদেশিকতার মোহ ছিল না। এ বিষয়ে তিনি প্রথম থেকেই মুক্তদৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন। 'ত্রয়ী' পর্বে রবীন্দ্রনাথ একবার মাত্র নিজে প্রত্যক্ষভাবে রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগ দেন, জনসমাজের সঙ্গে হাত মেলান। এর আগে পারিবারিক সংগঠনে দাদার সঙ্গে যোগ দেন বটে তবে তাকে ঠিক রাজনৈতিক আন্দোলন বলা যায় না। অল্পদিন পরে তিনি এই আন্দোলনের দুর্বল দিকটা ধরতে পেরে তার প্রতিকারের জন্য সমালোচনা করেন কিন্তু রাজনীতিবিদ্‌দের সমর্থন না পাওয়ায় ধীরে ধীরে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ত্যাগ করেন। তবে দেশের কল্যাণমুলক অনুষ্ঠানের প্রতি তাঁর আগ্রহ ও উপদেশ বরাবরই ছিল তবু এই পর্ব তাঁর প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক আন্দোলনে অংশ গ্রহণের গৌরবে গুরুত্বপূর্ণ। 'ত্রয়ী' রচনার সময়ে রবীন্দ্র-জীবন ব্যক্তিগত ঘাত প্রতিঘাতে ক্ষত বিক্ষত। মহা সাধকের মত তিনি এই আঘাত সহ্য করেছেন তবুও খুব ভাল করে দেখলে তাঁর সংসার জীবনে সাময়িক ঔদাসীন্য লক্ষ্য করা যায়। 'ত্রয়ী' রচনার পটভূমি রচনা করেছে 'নৈবেদ্য'—'উৎসর্গ'তে তার রেশ থেকে গিয়েছে। 'খেয়া' থেকে 'গীতাঞ্জলি' তাঁর 'ত্রয়ী' পর্ব থেকে উত্তরণের বাণী। আমরা 'চোখের বালি', 'নৌকাডুবি' ও 'গোরা'—এই তিনটি উপন্যাসের সঙ্গে সমধর্মী ভাবের রচনা নিয়ে আলোচনা করব। তবু একথা স্বীকার করতেই হবে যে প্রধানতঃ তখন তিনি সাময়িকভাবে প্রাচীন ভারতীয় পরিবেশের ভাবনায় ভাবিত হলেও, নানা বিষয়ে নানা আলোচনা করেছেন; বিপুল গদ্য সম্ভারের প্রকাণ্ড এক অংশ (বিশেষ করে প্রবন্ধ) এই সময়েরই রচনা। নাটকের যেমন মূল ভাব ছাড়া সঞ্চারিভাব থাকে, রবীন্দ্র মানসেও তেমনি মূল ভাব প্রাচীন ভারতীয় পরিবেশে পরিভ্রমণ হলেও, নানা বৈচিত্র্যও পাওয়া যায়। আর এইখানেই তিনি রবীন্দ্রনাথ।

কল্পনায় চরিত্র ও কাহিনী সৃষ্টি করলেও উপন্যাস সম্পূর্ণভাবে মাটির ফসল। তার বাস্তবধর্ম ক্ষুণ্ন করার উপায় নাই। বিশেষ করে সামাজিক উপন্যাস সৃষ্টির পিছনে সামাজিক সমস্যা, দ্বন্দ্ব সংঘাত ও লেখকের বক্তব্য থাকে, তাই সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় পরিবেশের আলোচনা নিতান্ত প্রয়োজন।

'চোখের বালি', 'নৌকাডুবি' ও 'গোরা'—এই 'ত্রয়ী' রচনাপর্বে রবীন্দ্র-মানস ও পরিবেশের আলোচনা করা যাক্।

এই উপন্যাস তিনটি পর পর কয়েক বছরের মধ্যে রচিত হয়েছে। 'বঙ্গদর্শন' নবপর্যায়ে যে উপন্যাসধারা শুরু হয়—'চোখের বালি' ও 'নৌকাডুবির' পর 'প্রবাসীতে' 'গোরায়' তা পুর্ণ পরিণতি লাভ করে।

১৩০৮ সালের বৈশাখ মাসে বঙ্গদর্শন নবপর্য্যায়ে সম্পাদকরূপে রবীন্দ্রনাথের আত্মপ্রকাশ একটি বিশেষ ঘটনা। 'চোখের বালি' উপন্যাসও (এপ্রিল ১৯০১) ১৩০৮ সালের বৈশাখ থেকে বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হতে থাকে। ১৩০৭ (১৯০০) সালের গোড়ার দিকে এটি 'বিনোদিনী' নামে কবির খাতার মধ্যে খসড়ার আকারে ছিল। বৎসরের শেষ দিকে তিনি এটিকে প্রকাশযোগ্য করে তোলেন। তাঁর ইচ্ছা ছিল একসঙ্গে বইএর আকারে প্রকাশ করার। প্রিয়নাথ সেনকে লেখা চিঠি থেকে দেখা যায় মাসিক পত্রিকায় খণ্ড খণ্ড করে প্রকাশ করলে রস গ্রহণে অসুবিধা হবে বলে কবির মনে হয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত দেখা যায় 'চোখের বালি' বঙ্গদর্শন পত্রিকায় ১৩০৮ (এপ্রিল ১৯০১) এর বৈশাখ থেকে ১৩০৯ (অক্টোবর, ১৯০২) এর কার্ত্তিক পর্য্যন্ত বার হয়।

এই বইটি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় ১৩০৯ সালের ফাল্গুন চৈত্র মাসে (১৯০৩, ফেব্রুয়ারী—মার্চ্চ)। 'চোখের বালি' উপন্যাস 'নৌকাডুবি' ও 'গোরার' মত মাসে মাসে লেখা হয়নি; একসঙ্গে লিখে মাসে মাসে 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশ করা হয়।

'চোখের বালি' রচিত হবার আগের দিকে তাকালে আমরা দেখি ১৩০৭ সালের শ্রাবণে 'ক্ষণিকা' প্রকাশিত হয়েছে এবং তার অল্পদিন পরেই 'নৈবেদ্য' রচিত হতে আরম্ভ করেছে। ১৩০৭ সাল থেকে 'নৈবেদ্য'র এক একটি কবিতা রচিত হতে থাকে। 'বিনোদিনী' নামে কবির খাতায় 'চোখের বালির' পূর্বরূপও ঐ সালেরই প্রথম দিকে দেখতে পাওয়া যায়। জগদীশচন্দ্র বসু ও প্রিয়লাল সেনকে লেখা চিঠি থেকে বোঝা যায় ১৩০৭ সালের শেষের দিকে 'নৈবেদ্য'র শত কবিতা রচিত হয়েছে। 'বঙ্গদর্শনে' ১৩০৮ এর বৈশাখে 'চোখের বালি' আরম্ভ হয় এবং 'নৈবেদ্য'র ১২টি কবিতাও ঐ মাসে প্রকাশিত হয়। ১৩০৮ এর আষাঢ় মাসে 'নৈবেদ্য' পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথ এই বইটি মহর্ষিদেবকে উৎসর্গ করেন।

'নৈবেদ্য' ও 'চোখের বালি' একই সময়ের রচনা তাই 'নৈবেদ্য' সম্বন্ধে একটু বিষদ আলোচনার প্রয়োজন। 'নৈবেদ্য'র মধ্যে রবীন্দ্রনাথের অধ্যাত্ম চিন্তার পরিচয় আছে; আছে স্বদেশের গৌরবময় চিত্র ও আদর্শবাদ। প্রাচীন

ভারতীয় সাধনার মূল কথা সরল জীবন যাপন। আধুনিক জীবনের বিলাসিতায় তাঁর তীব্র বিতৃষ্ণা জেগেছিল। অতীতের গৌরববোধ 'নৈবেদ্য'র প্রধান সুর।

"অধ্যাপক প্রমথনাথ বিশী বলিয়াছেন নৈবেদ্য আইডিয়া প্রধান কাব্য। তখনই প্রশ্ন ওঠে, সে আইডিয়া কী। সামান্যভাবে বিচার করিলে বলিতে হয়—ঈশ্বর বিশ্বাস, সর্বভূতে ঈশ্বরের মহিমা সন্দর্শন" (রবীন্দ্র জীবনী ও রবীন্দ্রসাহিত্য, প্রকাশক—প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়—২য়খণ্ড, সংস্করণ ১৩৫৫ মাঘ, বিশ্বভারতী

রবীন্দ্রনাথের ধর্মীয় আদর্শ ও ঈশ্বরবোধের প্রেরণা ব্রাহ্মধর্ম ও উপনিষদ্। কবি 'নৈবেদ্য'র মধ্যে ব্রাহ্মধর্মের আদর্শ ও বাণীকে রূপ দিলেন। 'নৈবেদ্য' রচনার সময়ে তিনি ৭ই পৌষের উৎসবে শান্তিনিকেতনের মন্দিরে প্রথম তাঁর ধর্মীয় উপদেশ দেন (ব্রাহ্ম মন্ত্র—১৩০৭-৭ই পৌষ)। এর কয়েকদিন পরেই কলকাতায় 'ঔপনিষদ ব্রহ্ম'—১১ই মাঘ ১৩০৭য়ে পাঠ করেন। এই ভাষণ দুটি পরে 'ধর্ম' গ্রন্থের অন্তর্গত করা হয়।

তৎকালে খুব কম মণীষীই দেশের রাষ্ট্রনীতি, সমাজজীবন ও অধ্যাত্ম-জীবনকে সমন্বিত করে দেখেছিলেন। রাজনীতিবিদ্‌রা দেশের রাজনৈতিক আন্দোলন ও সমাজসেবীরা সামাজিক সংস্কার করেছিলেন কিন্তু সমগ্র জীবনের উন্নতির কথা খুব কম লোকই ভেবেছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দ জীবনকে খণ্ডিতভাবে দেখেননি। তিনি দেশের লোকের সামগ্রিক উন্নতি চেয়েছিলেন। তবে রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দের মধ্যে মতামতের আদান প্রদানের কথা বা কোন সম্মিলিত কাজের কথা জানা যায় না। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় ও রবীন্দ্রনাথের মধ্যে মতৈক্য দেখা যায়। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ থেকে বাংলা দেশে নতুন করে হিন্দুত্বের প্রতি আকর্ষণ জাগে। রবীন্দ্রনাথ, স্বামী বিবেকানন্দ, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ও হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এ বিষয়ে একমত ছিলেন।

'নৈবেদ্য' রচনার সময়ে এবং তার পরেও বেশ কিছুদিন কবি প্রাচীন ভারতীয় পরিমণ্ডলের স্বপ্নে মগ্ন ছিলেন। এই সময়ের থেকে তাঁর চিন্তাধারা নতুন পথে চলে। ছোট গল্পর সম্ভার তখন সবে শেষ হয়েছে। দীর্ঘদিন পরে কবি 'বঙ্গদর্শন' সম্পাদনা করতে গিয়ে নতুন করে উপন্যাস লেখা আরম্ভ করেন। এই পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের স্বদেশী চিন্তা, সামাজিক চিন্তা ও আধ্যাত্মিক চিন্তার ফল স্বরূপ বিপুল প্রবন্ধ সম্ভার নতুন গঠনমূলক বাণী বহন করে আনে।

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী সামাজিক সমস্যার উপর 'সামাজিক ব্যাধি ও তাহার

প্রতিকার' নামে এক প্রবন্ধ লেখেন। রবীন্দ্রনাথ সামাজিক ব্যাধিরই প্রতিকারের দরকার আছে বলে মনে করতেন না। ১৩০৮ এর বৈশাখের 'বঙ্গদর্শনে' রবীন্দ্রনাথ 'ব্যাধি ও প্রতিকার' নামে একটি প্রবন্ধ লেখেন, তাতে তিনি জাতির জীবনে যে সব ব্যাধির জীবাণু ঢুকেছে সে সম্বন্ধেও তার প্রতিকার সম্বন্ধে আলোচনা করেন। ঐ মাসেই 'হিন্দুর একনিষ্ঠতা, নামে ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় বঙ্গদর্শনে একটি প্রবন্ধ লেখেন। তাতে উভয় মণীষীর মতের মিল লক্ষ্য করা যায়।

১৩০৮ 'বঙ্গদর্শনে' জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতার আদর্শ' নামে রবীন্দ্রনাথের একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। এতে হিন্দুর বর্ণাশ্রম ধর্মের ত্রুটিও যেমন দেখান হয়েছে তেমনি পাশ্চত্যের রাষ্ট্রীয় স্বার্থের দিকও দেখান হয়েছে। এই মাসের 'বঙ্গদর্শনে' তীব্র স্বাদেশিকতার বাণী নিয়ে 'নকলের নাকাল' নামে আর একটি প্রবন্ধ বার হয়।

চীন দেশে ইউরোপীয় অত্যাচার ও বুয়র যুদ্ধে কবির মন উতলা হয়। তাই এই বিষয়গুলির উপর তিনি 'বঙ্গদর্শনে' ১৩০৮ এর আষাঢ় মাসে 'সমাজ ভেদ' নামে একটি প্রবন্ধ লেখেন।

এই সময় রবীন্দ্রনাথের সংসারের দিকে তাকালে দেখা যায় ১৩০৮ এর গোড়ার দিকে তিনি শিলাইদহের সংসার তুলে দেন। নানা কারণে কবির শরীর ও মন ভাল যাচ্ছিল না বলে গরমের সময়ে দার্জিলিং বেড়াতে যান। সেখান থেকে এসে জ্যেষ্ঠ কন্যা মাধুরীলতার বিবাহ দেন। কবি বিহারীলাল চক্রবর্তীর চতুর্থ পুত্র শরৎচন্দ্রের সঙ্গে আষাঢ় মাসে মাধুরীলতার (বেলা) বিয়ে হয়। শরৎচন্দ্র দর্শনে প্রথম হয়েছিলেন এবং আইন পাশ করে মজঃফারপুরে ওকালতি করতেন। কবি বেলাকে নিয়ে মজঃফারপুরে যান। সেখানে মুখার্জি সেমিনারীতে একটি সভা হয় (১৩০৮-১লা শ্রাবণ) এবং প্রবাসী বাঙালীদের তরফ থেকে তাঁকে মানপত্র দেওয়া হয়। বোধহয় এটি তাঁর প্রথম মানপত্র। রবীন্দ্রনাথের জগদীশচন্দ্রকে লেখা চিঠি থেকে জানা যায় এই সময়ই তাঁর 'মুক্তির উপায়' গল্পের হিন্দি অনুবাদ হয়।

মজঃফারপুর থেকে ফিরে শান্তিনিকেতনে আসেন। মৃণালিনী দেবীকে একটি চিঠিতে জানাচ্ছেন শান্তিনিকেতনে এসে কিরকম মানসিক শান্তি পেয়েছেন। ঐ সময় থেকে তাঁর মনে শান্তিনিকেতনে একটি বোর্ডিং স্কুল খুলবার আকাঙ্খা জাগে।

কলকাতায় ফিরবার কয়েকদিন পরে (২৪ শে শ্রাবণ ১৩০৮) মধ্যমা কন্যা রেণুকার বিয়ে হয়।

"প্রাচীন ভারত বড হইয়াছিল বহুকে এক করিয়া। এখন নিয়ম আছে, অন্ধ অভ্যাস আছে, প্রাণ নাই, চেতনা নাই। প্রাচীনের সেই সম্পদের সহিত বর্ত্তমান ভারতের সচেষ্ট যোগসাধন করিতে পারিলে যথার্থ হিন্দুত্ব রক্ষিত হইবে।" (রবীন্দ্র-জীবনী, প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়-২য়খণ্ড, ১৩৫৫ মাঘ সংস্করণ-২৯ পৃঃ, বিশ্বভারতী)। রবীন্দ্রনাথ 'নৈবেদ্য' কাব্যে এবং ''হিন্দুত্ব' নামে একটি প্রবন্ধে এইভাবটি ফুটিয়ে তোলেন। 'হিন্দুত্ব' প্রবন্ধটি ১৩০৮ এর শ্রাবণে প্রকাশিত হয়।

"১৩০৮ সালের আশ্বিন মাসে কবি সপরিবারে শান্তিনিকেতনে আছেন। বিলাত প্রবাসী জগদীশচন্দ্রকে লিখিতেছেন "তুমি এখানে কখনও আস নাই। জায়গাটি বড়ই রমণীয় .... কলিকাতায় আবর্ত্তের মধ্যে আমার আর কিছুতেই ফিরিতে ইচ্ছা করে না। পূর্বেই লিখিয়াছি এখানে একটি বোর্ডিং বিদ্যালয় স্থাপনের আয়োজন করিয়াছি। পৌষ মাস হইতে খোলা হইবে। গুটিদশেক ছেলেকে আমাদের ভারতবর্ষের আদর্শে মানুষ করিবার চেষ্টায় আছি" রবীন্দ্রজীবনী (২য় খণ্ড-প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়-১৩৫৫ মাঘ, সংস্করণ বিশ্বভারতী)।

শান্তিনিকেতনে মহর্ষিদেব দ্বারা প্রতিষ্ঠিত আশ্রমের কথা আগেই আলোচিত হয়েছে। এখানে ১৩০৬ সালে বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর একটি ব্রহ্ম বিদ্যালয় করার পরিকল্পনা করেন। কিন্তু তাঁর অকাল মৃত্যুতে তা কার্যকরী হয়নি। ১৩০৮ সালে রবীন্দ্রনাথ এই পরিকল্পনাকে রূপ দিলেন।

"১৩০৮ সালের অগ্রহায়ণ মাসে ব্রহ্মবান্ধব শান্তিনিকেতনে আসিলেন; ছাত্র অধ্যাপক তিনিই জুটাইলেন। তাঁহার সঙ্গে আসিলেন রেবার্চাদ নামে শিক্ষাব্রতী সিন্ধীযুবক। শিলাইদহের গৃহবিদ্যালয়ের জগদানন্দ রায়, শিবধন বিদ্যার্ণব ও নরেন্দ্র পুর্ব হইতেই ছিলেন, তাঁহারা সকলেই আসিলেন।" (রবীন্দ্র-জীবনী, ২য়-খণ্ড-প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়-২৯ পৃঃ, ১৩৫৫ মাঘ সংস্করণ-বিশ্বভারতী)।

১৩০৮ সালের পৌষ উৎসবের সময় অনুষ্ঠান করে শান্তিনিকেতন ব্রহ্ম বিদ্যালয় আরম্ভ হয়। শান্তিনিকেতন ব্রহ্ম বিদ্যালয় স্থাপনের কিছু আগে 'নৈবেদ্য' কাব্য শেষ হয়েছে। কিন্তু মনের মধ্যে সেই প্রাচীন পরিবেশের রেশ

মিলায়নি। হিন্দুর প্রাচীন রীতি ও ঐতিহ্য সম্বন্ধে নানা ব্যাখ্যা তাঁর মনে আসে, তাই স্কুলটি সম্পূর্ণভাবে এই প্রভাবের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়। তৎকালের চিঠি পত্রের মধ্যেও তাঁর এই তপোবন ভাবনার পরিচয় পাওয়া যায়। 'বঙ্গদর্শন' ১৩০৮ ফাল্গুন মাসে 'প্রাচীন ভারতে একঃ' নামে একটি প্রবন্ধ লেখেন। তাতে উপনিষদের বিস্তারিত ব্যাখ্যা আছে। ১৩০৯ এর জ্যৈষ্ঠ মাসে মজুমদার লাইব্রেরিব অলোচনা সভাতে 'ভারত বর্ষের ইতিহাস' নামে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন।

এই সময়ে বোম্বাই অঞ্চলে এক সাহেব তার ব্রাহ্মণ কর্মচারীকে পদাঘাত করে। তাতে দেশময় একটা হাহাকাব পড়ে যায়। ববীন্দ্রনাথ ওভাবটুন হলে এর উপর 'ব্রাহ্মণ' নামে একটি ভাষণ দেন। সেটি 'বঙ্গদর্শনে' ১৩০৯ এর আষাঢে প্রকাশিত হয়। এতে তিনি প্রাচীন ব্রাহ্মণেব লক্ষণ ও আদর্শের কথা বলতে চেয়েছিলেন। কঠোর ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ ধর্ম, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস, নির্লোভ নিরহংকার সংযত জীবন, সমস্ত কোলাহল ত্যাগ করে তপোবনের শান্ত জীবন যাপন—এসব যদিও সত্যিকাব ব্রাহ্মণেব আদর্শ তবু বর্ত্তমানে পালন করা অসম্ভব। কিন্তু এই প্রবন্ধে কবি সেইটাই কবতে বলেছিলেন।

'বিনোদিনী' নাম নিয়ে যখন 'চোখের বালি' উপন্যাসের খসড়া প্রস্তুত হয় তখন কবির বয়স ৪০ বৎসর। এই উপন্যাস প্রকাশের সময় থেকে কবির জীবনে দুঃসময়ের কালোছায়া দেখা যায়। ১৩০৯ সালের আষাঢ় মাস থেকে কবিপত্নী মৃণালিনী দেবী অসুস্থ হয়ে পড়েন। ভাদ্রমাসে তাঁকে চিকিৎসার জন্য কলকাতায় আনা হয়। দিন দিন রোগ গুরুতর হতে থাকে। তাই কবি শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের বিধিব্যবস্থা কলকাতা থেকে লিখে লিখে চালাতে থাকেন।

'নৈবেদ্য'র পরিমণ্ডলে কবি দীর্ঘদিন বিচরণ করেন। 'প্রাচীন সাহিত্যে'র অন্তর্গত প্রবন্ধের মধ্যে আমরা তাঁর তৎকালের এইরকম মনোভাবেরই পরিচয় পাই। ১৩০৯ এর আশ্বিন মাসের 'বঙ্গদর্শনে' 'শকুন্তলার' একটি দীর্ঘ সমালোচনা লিখলেন। এর আগে ১৩০৮ এর পৌষ মাসে 'কুমার সম্ভব ও শকুন্তলা' নামে একটি আলোচনা লিখেছিলেন; কিন্তু এই প্রবন্ধে তিনি যেন ঠিক খুসি হতে পারেননি তাই 'শকুন্তলা' প্রবন্ধটির অবতারণা। তবে 'কুমারসম্ভব ও শকুন্তলা' আগে লেখা হলেও বঙ্গদর্শনে পরে প্রকাশিত হয়েছিল (১৩০৯ ভাদ্র)। আরও আগে ১৩০৭ রে 'মেঘদূত' ও 'কাব্যে উপেক্ষিতা' রচিত হয়েছিল। এই প্রবন্ধ

-গুলি বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। প্রথম রচনা দুটিতে কেবল সৌন্দর্যতত্ত্বের বিচার ছিল। কিন্তু পরবর্তী প্রবন্ধ 'কুমারসম্ভব ও শকুন্তলায়' কবি অহেতুক সৌন্দর্য যে সাহিত্যের উদ্দেশ্য এই মতকে সরিয়ে রেখে কবি কালিদাসের নতুন ব্যাখ্যার মধ্য দিয়ে মঙ্গলকেই প্রেমের পরমলক্ষ্য বলে দেখিয়েছেন। 'শকুন্তলা' প্রবন্ধে তুলনামূলকভাবে বঙ্কিমচন্দ্রের 'শকুন্তলা, মিরাণ্ডা ও ডেসডিমোনা' প্রবন্ধের আলোচনা করেছিলেন এবং সমালোচনার গুণে তা সাহিত্যের মর্য্যাদা পেয়েছে। এই প্রবন্ধগুলি পরে 'প্রাচীন সাহিত্যে' স্থান পায়।

'চোখের বালি' উপন্যাস ধারাবাহিকভাবে 'বঙ্গদর্শনে' যখন প্রকাশিত হচ্ছিল তখন রবীন্দ্রনাথের এক অপূর্ব সৃষ্টি 'নষ্টনীড়' গল্পটিও 'ভারতী' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে বার হত। 'নষ্টনীড়' 'ভারতীতে' ১৩০৮ এর বৈশাখ থেকে অগ্রহায়ণ পর্য্যন্ত এবং 'চোখের বালি' ১৩০৮ এর বৈশাখ থেকে ১৩০৯ এর কার্ত্তিক পর্য্যন্ত 'বঙ্গদর্শনে' চলে।

এই সময়ে অসুস্থ হয়ে কবিজায়া ক্রমশঃ মৃত্যুর দিকে চলছিলেন। ৭ই অগ্রহায়ণ ১৩০৯ মৃণালিনী দেবীর মৃত্যু হয়।

মৃণালিনী দেবীর মৃত্যুর অল্প কদিন পরেই কবি ছেলেমেয়েদের নিয়ে শান্তিনিকেতনে চলে আসেন। এখানে এসে সাহিত্য সৃষ্টিতে মন দিলেন। এই সময়ে যে কবিতাগুলি রচনা করেন সেগুলি 'স্মরণ' ও 'উৎসর্গ' কাব্যের মধ্যে স্থান পায়। স্ত্রীর মৃত্যুতে রবীন্দ্রনাথের শোকের পরিচয় বহন করে 'স্মরণ' কাব্যগ্রন্থ। তার আগে মৃত্যু এসেছে বুঝতে পেরে তিনি 'স্মরণ' বলে যে কবিতাটি লেখেন সেটি 'বঙ্গদর্শনে' ১৩০৯ এর ভাদ্রতে প্রকাশিত হয়েছিল, পরে 'উৎসর্গ' কাব্যে স্থান পায়। 'স্মরণের' কবিতাগুলি খুব অল্পদিনের মধ্যেই রচিত হয়েছিল। এই কাব্যের বাইরে কোথাও কবি তাঁর স্ত্রীর জন্য শোক প্রকাশ করেননি।

'চোখের বালি' লিখবার আড়াই বৎসর পর রবীন্দ্রনাথের এই পর্যায়ের দ্বিতীয় উপন্যাস 'নৌকাডুবি' ১৩১০ এর বৈশাখ থেকে ১৩১২র আষাঢ় পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয়। 'গোরা' উপন্যাস আরম্ভ হয় ১৩১৪ এর ভাদ্রতে। 'চোখের বালি' ও 'গোরা'র মধ্যবর্ত্তী সময়ে 'নৌকাডুবি' রচিত হয়। তাই এই উপন্যাসে 'চোখের বালির' কিছুটা প্রভাব পড়েছে আর 'গোরা'র আভাসও পাওয়া যায়।

এই সময়ে কবির মনের অবস্থা সহজেই অনুমান করা যায়। স্ত্রীর মৃত্যুর পর সমস্ত সংসারটিকে যেন একসঙ্গে করে চালাতে পারছেন না। মধ্যমা কন্যা

রেণুকার অসুখের জন্য হাজারিবাগ হয়ে আলমোরায় যান। স্কুলের ভার মধ্যম জামাতা সত্যেন্দ্রনাথের উপর দিয়েছিলেন। দূর থেকেও তিনি বুঝেছিলেন যে সত্যেন্দ্রনাথ স্ফূর্তিবাজ লোক তাই কর্তৃত্ব করবাব শক্তি নাই। মোহিতচন্দ্র সেন নামে একজন দর্শনের অধ্যাপকের উপর তিনি শান্তিনিকেতন স্কুলের অধ্যাপনা বিধিব্যবস্থা ও তত্ত্বাবধানের ভার দেন। সাংসারিক অশান্তি ও স্কুল চালনার ব্যাপাবে কবি বড়ই বিব্রত থাকতেন।

রেণুকার একান্ত জেদে ৭ই ভাদ্র আলমোরা থেকে কলকাতা চলে আসেন। এর কদিন পরেই রেণুকার মৃত্যু হয়। এই কবির প্রথম সন্তান শোক। দারুণ শোকেও কবি স্থির। বাইরে তাঁকে বিচলিত দেখা যায় না। সাহিত্য সৃষ্টি সমানভাবে চলছে।' 'নৌকাডুবি' ও 'শিশুব' দুই একটি কবিতা রচিত হচ্ছে 'শিশু'র ৬১টি কবিতার মধ্যে ৩১টি এই পর্বের রচনা।

রবীন্দ্রনাথ যখন কলকাতায় ছিলেন তখন অজিত কুমার চক্রবর্ত্তী ও সতীশচন্দ্র রায় সর্বদা তাঁর কাছে আসতেন। তাঁরা তখন বি. এ. ক্লাসের ছাত্র। রবীন্দ্রনাথ এই ছাত্র দুটিকে বিশেষ স্নেহ করতেন। ১৩০৯ সালে সতীশচন্দ্র রায় আশ্রমের স্কুলে যোগ দেন। ১৩১ এর শীতের ছুটির সময় বসন্ত রোগে সতীশচন্দ্র মাঘী পূর্ণিমার দিন মারা যান। এই মৃত্যুতে রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত আহত হন।

মোহিতচন্দ্র সেন পণ্ডিত ও রসজ্ঞ ব্যক্তি ছিলেন। তিনিই বাংলা দেশে সর্বপ্রথম রবীন্দ্রসাহিত্য আলোচনা করেন। কাব্যগ্রন্থের সম্পাদনা তাঁর একটি উল্লেখযোগ্য কাজ। তিনি শান্তিনিকেতন স্কুলের সঙ্গে আগেই জড়িয়ে ছিলেন। এবাবে সর্বশক্তি দিয়ে এটিকে গঠন করতে চেষ্টা করেন এবং তাঁর চেষ্টায় ছাত্র সংখ্যা অনেক বেড়ে যায়।

এই পর্বেই রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত প্রবন্ধ 'আত্মশক্তি' ও 'স্বদেশীসমাজ' রচিত হয়।

১৩১১র ৬ ই মাঘ (১৯০৫ জানুয়ারী ১৯) ৮ বৎসর বয়সে মহর্ষির মৃত্যু হয়।

এই সময়ের দেশের অবস্থা আলোচনাব যোগ্য। ১৯০৩ সালের ৩রা ডিসেম্বর (১০ই অগ্রহায়ণ ১৩১০) ক্যালকাটা গেজেটে বঙ্গদেশকে খণ্ডিত করবার সরকারী প্রস্তাব প্রকাশিত হয়েছিল। লর্ড কার্জন ভারতের বড়লাট হয়ে আসার পর থেকেই হিন্দু মুসলমানের মিলিত কোন কাজকে সমর্থন করেননি। আর এই ভেদনীতির প্রকাশ বঙ্গভঙ্গ। মুসলমানদের নতুন মুসলীম

প্রদেশ গড়ে দেবার কথায় প্রলুব্ধ করে ঢাকার নবাব ও অন্যান্য মুসলমান নবাবদের স্বপক্ষে আনেন। এর পরই ১৯০৪ সালে ভারত গভর্ণমেন্টের শিক্ষানীতি সংস্কার সম্বন্ধে একটি পরিকল্পনা প্রকাশিত হয়। গ্রাম্য লোকেদের সুবিধার জন্য আঞ্চলিক ভাষায় পাঠ্য পুস্তক রচনার ইচ্ছা প্রকাশ যে গভর্ণমেন্টের ভেদনীতিরই একটা চতুর চাল একথা শিক্ষিত বাঙালীর বুঝতে অসুবিধা হয়নি। ১৩১১র ২৭শে ফাল্গুন জেনারেল এসেম্বলিতে (স্কটিশচার্চ কলেজে) রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদীর সভাপতিত্বে এই ভেদনীতির বিরুদ্ধে এক জনসভা হয় এবং রবীন্দ্রনাথ সেখানে 'সফলতার সদুপায়' নামে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। ভাষা সংস্কার আন্দোলনের তীব্র সমালোচনা করেই তিনি ক্ষান্ত থাকেননি। বঙ্গচ্ছেদের যে প্রস্তাব উঠেছিল তারও যুক্তিপূর্ণ চিন্তাশীল আলোচনা করেছিলেন।

১৩১০ সালে বঙ্গভঙ্গের কথা ক্যালকাটা গেজেটে প্রকাশিত হলে সারা বাংলা দেশে একটা আলোড়নের সৃষ্টি হয়। এই সময়ই লর্ড কার্জন য়ুনিভারসিটির বিল পেশ করেন। দেশশুদ্ধ লোকের প্রতিবাদ উপেক্ষা করে জবরদস্ত লাট আইন পাশ করলেন। কিন্তু আইন পাশ হয়ে যাবার পর দেশের লোকের নিশ্চেষ্টতা দেখে রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত আহত হয়ে 'বঙ্গদর্শনে' লিখেছিলেন— "আন্দোলন সভায় আমরা যে পরিমাণ সুর চড়াইয়া কাঁদিয়াছিলাম, রং ফলাইয়া ভাবী সর্বনাশের ছবি আঁকিয়াছিলাম, আমাদের বর্তমান নিশ্চেষ্টতা কি আমাদের সে পরিমাণ লজ্জার বিষয় নহে।" (.রবীন্দ্র জীবনী, ২য় খণ্ড, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, ১১১ পৃঃ, ১৩৫৫ মাঘ, বিশ্বভারতী)।

কবি স্বাদেশিকতাকে মনুষ্যত্বের উপরে স্থান দেননি। তিনি বরাবর বলেছেন জাতীয় স্বার্থেরও উপরে ধর্মকে রাখতে হবে। মনুষ্যত্ব ন্যাশন্যালত্বের অনেক উপরে।

দেশের রাষ্ট্রনৈতিক চেতনা উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিল তাই রবীন্দ্রনাথ তাকে সফল করার জন্য দেশের সামনে গঠণমূলক কাজের পরিকল্পনা উপস্থিত করেন। তাঁর বিখ্যাত প্রবন্ধ 'স্বদেশী সমাজ' ১৩১১ র ৭ই শ্রাবণ (১৯০৪ জুলাই ২২শে) মিনার্ভা রঙ্গমঞ্চে চৈতন্য লাইব্রেরির উদ্যোগে বিশেষ অধিবেশনে পাঠ করেন। প্রবন্ধটি কিছু পরিবর্তন করে আবার কর্জন রঙ্গমঞ্চে ১৬ই শ্রাবণ পাঠ করেন। 'বঙ্গদর্শনে' ১৩১১ র ভাদ্র মাসে প্রকাশিত হয়। 'আত্মশক্তি' গ্রন্থে এই প্রবন্ধ স্থান পায়।

'স্বদেশী সমাজে' যে আদর্শ ব্যক্ত হয়েছে তা অনেকটা 'হিন্দু মেলার' সঙ্গে সাদৃশ্যযুক্ত। তবে এই প্রবন্ধে তিনি প্রথম গঠনমূলক কাজের জন্য আহ্বান জানান ও পল্লী সংস্কার করার আলোচনা করেন। এই জন্য 'স্বদেশী সমাজ, প্রবন্ধের ঐতিহাসিক মূল্য অপরিমেয়। কিন্তু তখনকার বাংলাদেশ তাঁর সেই গঠনমূলক আহ্বানে সাড়া তো দেয়ইনি উপরন্তু হিন্দু মতের সমর্থক সাপ্তাহিক 'বঙ্গবাসী'র সম্পাদক বলাই গোস্বামী ব্রাহ্ম রবীন্দ্রনাথের এ একটা কুটনীতি বলে আভাস দেন। রবীন্দ্রনাথ ঐ সাপ্তাহিকেই 'স্বদেশী সমাজের পরিশিষ্ট' নামে উত্তর প্রকাশ করেন। পরে ঐ প্রবন্ধটি আবার ১৩১১ আশ্বিনের 'বঙ্গর্শনে' প্রকাশিত হয়। এই প্রবন্ধটিও 'আত্মশক্তির' অন্তর্গত।

তখনকার একজন বিখ্যাত রাজনীতি ও অর্থনীতির পণ্ডিত পৃথ্বীশচন্দ্র রায় বলেছিলেন যে রবীন্দ্রনাথের ঐ সব রাজনৈতিক ও সমাজনৈতিক মতামত আমাদের দেশের পক্ষে ক্ষতিকর এবং এই মতের মধ্যে নানা দোষ রয়েছে। রবীন্দ্রনাথ দেশবাসীকে ভুলপথে আহ্বান জানিয়েছিলেন কিনা আজ তা প্রমানিত হয়েছে। গান্ধিজী দেশবাসীকে এর অনেকদিন পরে সেই গঠনমূলক কাজের মধ্যে দিয়ে দেশ সেবার কথা বলেছিলেন।

আমরা যে সময়ের কথা বলছি সে সময়ে দেশের কাজে লাগবার জন্য দেশবাসী ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল। 'বীরপূজা' এই নব জাতীয়প্রেমেব একটা প্রকাশ। ১৮৯৭ শ্রী মহাবাষ্ট্র দেশে শিবাজী উৎসব প্রবর্ত্তিত হয়েছিল। এই উৎসব এতদিন মহারাষ্ট্রেই সীমাবদ্ধ ছিল। সখারাম গণেশ দেউস্কর বাংলাদেশে এই উৎসব প্রবত্তনের জন্য 'শিবাজীর দীক্ষা' নামে একখানি বই লেখেন। রবীন্দ্রনাথ ভূমিকা স্বরূপ 'শিবাজী উৎসব' নামে একটি কবিতা লেখেন। পরে জাতীয় কবিতা হিসাবে এর দুর্বল দিকটা বোধহয় তাঁর নজরে পড়ে। তাই কাব্যগ্রন্থে এর স্থান দেননি। কারণ শিবাজী হিন্দুদের গৌরব বোধের প্রতীক, মুসলমান দেশবাসীর এতে ততখানি আগ্রহ না হওয়াই স্বাভাবিক।

শিবাজী উৎসবের জন্য কবিতা লিখলেও অন্তরের সুর মিলল না, যেন ঠিক খুসি হতে পারলেন না। তাই ৭ ই পৌষের ধর্মীয় ভাষণের মধ্যেও যেন দেশের সমস্যার কথা এসে গেল। ১৩১১ 'বঙ্গদর্শনে'—'উৎসবের দিন' প্রকাশিত হয়। এটি পরে 'ধর্ম' গ্রন্থে স্থান পায়। এই প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ আমাদের জাতীয় জীবনের মূলমন্ত্র যে বিশ্বমানবিকতা সে সম্বন্ধে আলোচনা করেন। আমাদের উৎসবে, শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠানে সর্বত্র সকলের আহ্বান। কেবল ব্যক্তিগত সুখে আমাদের

জীবনের কোন কাজই হয় না। কিন্তু ক্রমশঃ আমাদের এই সমবেত হবার চেষ্টা যেন কমে যাচ্ছে, কৃত্রিমতা আসছে। দেশের সর্বসাধারণের মনুষ্যত্ব, শক্তি ও মর্য্যাদা জাগ্রত করা যে একান্ত প্রয়োজন তা কবি উপলব্ধি করেন ও বার বার বলেন। তাঁর গ্রামসংস্কার ও গঠনমূলক কাজের হিসাবে তাঁর জমিদারিতে নানারকম উন্নতির চেষ্টা করেন। উৎসবে আদর্শের পরিচয় শ্রীনিকেতনের উৎসবের মধ্যে খানিকটা পাওয়া যায়।

'নৌকাডুবি' রচনাকালে কবির পারিবারিক অবস্থার মত দেশের অবস্থাও আলোচনার মত। বিশ শতকের গোড়ার দিকে বঙ্গভঙ্গ ও নানা বিল পাশের নির্দেশ থেকে ইংরেজের ইম্‌পিরিয়ালিজমের নগ্নতা ধরা পড়ে। তাই তাদের উপর ভারতীয়দের আস্থা কমতে থাকে। আদর্শবাদী জাপানী মনীষী কাকুজে ওকাকুরা এদেশে আসেন স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে। তাঁর সঙ্গে ঠাকুরবাড়ীর ঘনিষ্ঠতা হয়। তাঁর বাণী Asia is one এই মতের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দর মত মেলে ; এই বাণী সমগ্র এশিয়াবাসীকে নাড়া দেয়।

১৩১২ সালের বৈশাখ মাসে (১৯০৫ এপ্রিল) 'ভাণ্ডার' নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথ এর সম্পাদক হন। এই পত্রিকায় বিখ্যাত লোকরা লিখতেন।

'খেয়া'র প্রথম কবিতা 'শেষ খেয়া' প্রকাশিত হয় ১৩১২ র আষাঢ়ের 'বঙ্গদর্শনে'। ১৩১২ আষাঢ় মাসে 'বঙ্গদর্শনে' 'নৌকাডুবি' উপন্যাস শেষ হয়। এই সময়টার দিকে তাকালে দেখা যায় কন্যা রেণুকার মৃত্যু, মহর্ষির মৃত্যু ও সংসারে নানা গোলযোগ ও অশান্তি। দেশের রাষ্ট্রনৈতিক আন্দোলন গুরুতর আকার ধারণ করেছে। এই পর্বে কবির 'কাব্যগ্রন্থ' প্রকাশিত হয়েছে। 'বঙ্গদর্শন' তো ছিলই আবার 'ভাণ্ডার' সম্পাদনা করছেন। কবি রবীন্দ্রনাথের থেকে দেশের চিন্তাশীল মনীষী হিসাবেই বেশী প্রকাশিত। তাঁর বিখ্যাত প্রবন্ধ 'সফলতার সদুপায়' ও 'স্বদেশী সমাজ' এই পর্বের রচনা। তাই 'চোখের বালির' পর থেকে 'নৌকাডুবি'র রচনাকাল পর্যন্ত এই পর্বের ঐতিহাসিক মূল্য অপরিসীম। 'নৌকাডুবি' উপন্যাসে কিন্তু আমরা রাজনৈতিক আন্দোলনের বা সমসাময়িক তিক্ততার আভাস পাইনা। বরং 'চোখের বালি' পর্বের হিন্দুত্বের গৌরব বোধের কথা, নারীর ব্যক্তিত্ব ও স্বাধীন মনের কথা পাই। সর্বোপরি প্রেমের মধ্যে মুক্তির কথা যা 'গোরা'য় গিয়ে একেবারে স্থিরভাবে বলেছেন, এখানেও তা আছে।

১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই আগষ্ট (১৩১২শ্রাবণ ২২) বাঙালি বঙ্গভঙ্গ রদ না হওয়া পর্যন্ত বৃটিশ পণ্য ব্যবহার করবে না বলে প্রতিজ্ঞা করে। এই বর্জন নীতিতে রবীন্দ্রনাথের সম্মতি ছিল না। তিনি সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মশাইকে বোঝাতে চেয়েছিলেন। কিন্তু কেউই তাঁর কথায় কান দিলেন না।

এই সময় কবি অসুস্থ হন। একটু ভাল হয়েই 'অবস্থা ও ব্যবস্থা' নামে প্রবন্ধ লিখে টাউন হলে পাঠ করেন (৯ ভাদ্র)। 'বঙ্গদর্শনে' ঐ প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় ১৩১২ আশ্বিন। বয়কট আন্দোলনের সিদ্ধান্ত নেবার তিন সপ্তাহ পরে কবি গঠনমূলক ভাবাত্ম পরিকল্পনা উপস্থিত করেন। 'নৌকাডুবি' পর্বে 'স্বদেশী সমাজ' ও 'সফলতার সদুপায়' ইত্যাদি প্রবন্ধে যে গঠনমূলক কথা বলতে চেয়েছেন তাই আবার 'গোরা' রচনার অব্যবহিত পুর্বে বললেন।

বঙ্গবিচ্ছেদের কথায় এই একবারই কবি প্রত্যক্ষভাবে রাজনৈতিক আন্দোলনের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়েন। ভারত গভর্ণমেণ্টের ইস্তাহার অনুযায়ী ১৯০৫ খ্রীঃ ১৬ই অক্টোবর (১৩১২ আশ্বিন ৩০) থেকে বঙ্গচ্ছেদ ঘোষিত হয়েছিল। দেশের গণ্যমান্য অনেক লোকের মিলিত আপত্তিতে লর্ড কার্জন কর্ণপাত করা দরকার মনে করেননি, যদিও পুর্ববঙ্গের সামান্য কয়জন জমিদার মুসলমান ছাড়া এই ব্যবস্থায় দেশের আর কারও সমর্থন ছিল না।

বাঙালির জনমতকে অগ্রাহ্য করায় জাতীয় জীবনে নতুন এক পরিচ্ছেদের সূত্রপাত হয়। ৩০শে আশ্বিনের জন্য রবীন্দ্রনাথ 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় লিখলেন— "আগামী ৩০ শে আশ্বিন (১৩১২) বাংলাদেশ আইনের দ্বারা বিভক্ত হইবে। কিন্তু ঈশ্বর যে বাঙালিকে বিচ্ছিন্ন করেন নাই তাহাই বিশেষ রূপে স্মরণ ও প্রচার করিবার জন্য সেই দিনকে আমরা বাঙালিরা রাখিবন্ধনের দিন করিয়া পরস্পরের হাতে হরিদ্রাবর্ণের সূত্র বাঁধিয়া দিব। রাখি বন্ধনের মন্ত্রটি এই "ভাই ভাই এক ঠাঁই"। (রবীন্দ্রজীবনী—প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, ২য় খণ্ড, ১৩৫৫ মাঘ-১২৬পৃঃ, বিশ্বভারতী)।

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী অরন্ধনের কথা বলেন এবং ব্রতকথা লিখে তা পাঠ করার প্রস্তাব করেন। রবীন্দ্রনাথ ঐ উপলক্ষে গান করার জন্য 'বাংলার মাটি বাংলার জল' এই মন্ত্রগানটি রচনা করেন।

রবীন্দ্রজীবনীকার এই আন্দোলনের প্রতি মন্তব্য করে বলেছেন যে বঙ্গচ্ছেদ আন্দোলনের ভাবোচ্ছাসের একমাত্র চৈতন্য যুগের সঙ্গে তুলনা চলে। সে যুগে

যেমন চৈতন্যকে কেন্দ্র করে বিপুল সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছিল এই স্বদেশী আন্দোলনও তেমনি বাঙালি মনের স্থায়ী সৃষ্টির স্বাক্ষর বহন করছে।

৭ই আগষ্টের বৃটিশ পণ্য বর্জন দেশের সর্বত্র অল্পদিনের মধ্যে সেচ্ছাব্রতীদের চেষ্টায় ছড়িয়ে পড়ে। দেশের সবশ্রেণীর মধ্যে যে উত্তেজনা ও উৎসাহ দেখা যায় তা কল্পনা করা যায় না। দেশজোড়া বিরাট আন্দোলনে কবি রবীন্দ্রনাথ স্থির থাকতে পারলেন না। তাঁর ভাবুক চিত্ত দেশের এই আলোড়নে সঙ্গীত-অর্ঘ্য দান করে সাড়া দিল।

যদিও চিন্তাশীল রবীন্দ্রনাথ দেশের কাজ বলতে গঠনমূলক কাজকেই সম্মান করেছেন, উচ্ছ্বাসকে মূল্য দেননি তবুও দেখা যায় ভাবুক কবি রবীন্দ্রনাথের চিত্তে দেশের আলোড়ন সাড়া জাগাতে পেরেছিল আর তার নিদর্শন স্বরূপ তাঁর দেশ বন্দনার স্তবগীতির সৃষ্টি। প্রথমে এই গানগুলি (১৩১২) 'ভাণ্ডার' পত্রিকায় ভাদ্র ও আশ্বিন সংখ্যায়, 'বঙ্গদর্শনে'র আশ্বিন সংখ্যায় ও 'বাউল' নামে বইয়ে প্রকাশিত হয়। দুই একটি স্বদেশী সংগীত এর আগে লিখলেও, এমন স্বতঃ উৎসারিত ধারার মত আর কখনো ঝরে পড়েনি।

এদিকে ৭ই আগষ্টের আন্দোলন ক্রমেই ব্যাপ্ত হয়ে পড়ে। ছাত্ররা বিলাতি জিনিস বর্জন, পিকেটিং ও স্বদেশী জিনিস মাথায় করে ফেরি করতে চায়। তাদের এই উদ্যম দেখে বঙ্গচ্ছেদের এক সপ্তাহ পরে গভর্ণমেণ্ট স্কুল কলেজে এই নির্দেশ পাঠায় যে ছাত্রদের এই আন্দোলনে যোগ দেওয়া অপরাধ বলে গণ্য হবে। এই সার্কুলার জারি হবার দুদিন পরে ৭ই কার্ত্তিক (২৪ শে অক্টোবর) একবার একাডেমির ভবনে দেশের গণ্য মান্য ব্যক্তিরা মিলিত হয়ে স্থির করেন ইংরেজ গভর্ণমেণ্টের বিশ্ববিদ্যালয় ও চাকুরী দুইই ছেড়ে দিতে হবে। অসহযোগ ভিন্ন নিজেদের সম্মান রক্ষার আর কোন উপায় নেই। এই দুটি সভায় রবীন্দ্রনাথ অনুপস্থিত ছিলেন। তবে ১০ই কার্ত্তিক পটলডাঙার মল্লিক বাড়ীতে যে সভা হয় তাতে রবীন্দ্রনাথই সভাপতি ছিলেন। তিনি ছাত্রদের স্পষ্টভাবেই জাতীয় বিদ্যালয়ে যোগ দেবার কথা বললেন।

এরপর আবার পুজোর ষষ্ঠীর দিন বহু বিশিষ্ট লোকের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথও ছাত্রদের সভায় যোগ দেন। ডন সোসাইটির সদস্যরা এই আন্দোলনে প্রধান অংশ গ্রহণ করেন। সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, প্রমথনাথ মুখোপাধ্যায়, হারাণচন্দ্র

চাকলাদার, কিশোরীমোহন গুপ্ত, অরবিন্দ প্রকাশ ঘোষ, রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ ও বিনয় কুমার সরকার প্রভৃতি একদল আত্মত্যাগী বিদ্বান জাতীয় পরিষদ স্থাপিত হলে সেখানে অধ্যাপনা করেন।

তখন যেন বাঙালি জীবনের সমস্ত কাজ কর্মের সঙ্গেই বঙ্গচ্ছেদের বেদনা এসে পড়ছিল। তাই দেখা যায় ময়মনসিংহের মহারাজা সূর্যকান্ত আচার্য, নাটোরের মহারাজা জগদীন্দ্রনারায়ণ রায়, গগণেন্দ্রনাথ ঠাকুর ইত্যাদি বিশিষ্ট ব্যক্তিদের আগ্রহে বাগ্‌বাজারে পশুপতি বসুর বাড়ীতে যে বিজয়া সম্মিলনী হয় তাতেও যেন দেশপ্রেমের ভাবই প্রধান। কবি এখানে এই উপলক্ষে যে ভাষণ দেন তাতে তিনি হিন্দুদেব কেবল নয় 'বিজয়া সম্মিলনী'তে সমস্ত দেশবাসীকে আহ্বান কবেন। 'বঙ্গদর্শন' ১৩১২ কার্ত্তিকে এটি প্রকাশিত হয়। গভর্ণমেণ্টের সার্কুলাব অনুযায়ী মফস্বলেব স্কুলে ছাত্রদের দমননীতি একটু বেশী চাপ দিয়ে আরম্ভ হয়। রংপুর গভর্ণমেণ্ট স্কুলের ছাত্ররা দণ্ডিত হলে জুলুমের প্রতিবাদে ছাত্রবা স্কুলে যাওয়া ছেড়ে দেয়। কালিপদ দাশগুপ্ত ও ব্রজসুন্দর রায় নামে দুজন তরুণ অধ্যাপক ছাত্রদের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। সেখানে সর্বপ্রথম জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। সেইদিনই (২৩ শে কার্ত্তিক) কলকাতায় সুবোধচন্দ্র বসু মল্লিকের সভাপতিত্বে এক সভা হয় এবং তিনি জাতীয় শিক্ষা পরিষদের জন্য একলক্ষ টাকা দান করেন। ছাত্রনেতা শচীন্দ্র প্রসাদ বসুর নেতৃত্বে ছাত্ররা গভর্ণমেণ্টের বিরোধিতা করে সভা করে। তখন ছাত্রদের রাজনৈতিক সভায় যোগদান করাও অপরাধ বলে স্থির হয়। ইংরেজ রাষ্ট্রনীতির নগ্নরূপ প্রকাশ পেতে থাকে।

৩০ শে কার্ত্তিক (১৩১২) ল্যাণ্ড হোল্ডারস্‌ এসোসিয়েশনের সভায় রবীন্দ্রনাথ ও বাংলাদেশের গণ্যমান্য সমাজ উপস্থিত ছিলেন। এই সভায় জাতীয় শিক্ষা পরিষদের নাম দেওয়া হল Bengal council of Education। তারকনাথ পালিত, রাজা প্যারীমোহন মুখাপাধ্যায়, গণেশচন্দ্র চন্দ্র, কালিনাথ মিত্র ও সুবোধচন্দ্র বসু মল্লিক ট্রাষ্টি হন।

১লা অগ্রহায়ণ আর এক সভায় সুরেন্দ্রনাথের সম্বর্দ্ধনা দেওয়া হয়। এই সভায় রবীন্দ্রনাথের প্রস্তাবে 'জাতীয় শিক্ষা সমাজ প্রতিষ্ঠা' ঘোষিত হয়। এই সভাতেই হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ বলেন "আমাদের শিক্ষাকে স্বাধীন করিবার আন্দোলন নতুন নহে, বোধহয় সর্বপ্রথম বঙ্কিমবাবু এ আন্দোলন উপস্থিত করেন। তারপর ১২৯৯ সালে 'সাধনা'তে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবিষয়ে

আলোচনা করেন।" (রবীন্দ্রজীবনী, ২য় খণ্ড, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, ১৩৩পৃঃ, ১৩৫৫ মাঘ, বিশ্বভারতী)

২৪ শে অগ্রহায়ণ রবীন্দ্রনাথের উপস্থিতিতে জাতীয় শিক্ষা পরিষদেরসদস্য-দের সভা হয় এবং নীলরতন সরকার শিক্ষা পরিষদের সদস্য হন।

রবীন্দ্রনাথের গঠনমূলক চিন্তার সঙ্গে দেশ নায়কদের চিন্তার মিল হল না। সাময়িক উচ্ছ্বাস ও উত্তেজনা তাঁর কাছে সম্মানের বিষয় ছিল না। এই সময়ে নানা মতের কচ্‌কচিতে রাজনৈতিক আবহাওয়া খুবই অশান্তিকর হয়ে উঠেছিল। তাই রাজনৈতিক পট দ্রুতবেগে পরিবর্ত্তিত হচ্ছিল। রবীন্দ্রনাথ এদের সঙ্গে মিলিত হননি।

কর্মের সঙ্গে আদর্শের সমন্বয় করতে চেয়েছেন রবীন্দ্রনাথ সারাজীবন। অনেকে বলেন রবীন্দ্রনাথ ভারত সরকারের দলননীতিতে ভীত হয়ে রাজনীতি থেকে সরে আসেন। এ কথা সম্পূর্ণ ভুল। প্রত্যক্ষভাবে রাজনীতির সঙ্গে তাঁর যোগ ছিল মাত্র তিন মাস। ১৩১২ সালের আশ্বিন মাস থেকে অগ্রহায়ণ মাস পর্য্যন্ত। ১৩১২ সালের চৈত্র মাসে 'বিদায়' কবিতায়—

"বিদায় দেহ ক্ষম আমায় ভাই কাজের পথে আমি তো আর নাই।" এই লেখাটি যখন রচিত হয় বরিশালের যজ্ঞভঙ্গ ও ইংরেজের প্রচণ্ড রুদ্ররূপ তখনো প্রকাশিত হয়নি। তাই তিনি যে ভীত হয়ে রাজনীতির পথ ত্যাগ করেছিলেন বলা হয় তা সম্পূর্ণ ভুল।

বিদেশী জিনিস বয়কট করলেও দেশে তখন প্রয়োজনীয় অভাব মিটবার মত কাপড় উৎপন্ন হ'ত না। রবীন্দ্রনাথের সহায়তায় সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও গগণেন্দ্রনাথ ঠাকুর দেশের তাঁত শিল্পের পুনরুত্থানের জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করেছিলেন 'স্বদেশী সমাজ' বাংলা দেশের গ্রামের সমস্যা সমাধান সম্বন্ধে যে নির্দ্দেশ দিয়েছিলেন নিজের জমিদারিতে তিনি সে সব ব্যবস্থা করতে চেষ্টা করেন। সরকারী কো-অপারেটিভ আন্দোলনের আগেই তিনি গ্রামের প্রজাদের মধ্যে সমবায় ব্যাঙ্ক স্থাপন করেন। দেশের লোককে সত্যকার মানুষ হতে শিক্ষা দেওয়াই যে প্রকৃত দেশসেবা একথা কবি মনে প্রাণে বিশ্বাস করতেন। এই সময় তিনি শান্তিনিকেতন স্কুলের শিক্ষাব্যবস্থার আরও পরিবর্ত্তন করেন। হরিজন পল্লীতে ও আশ্রম ভৃত্যদের মধ্যেও সন্ধ্যাবেলা শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা হয়।

১৩১২-২০শে চৈত্র (১৯০৬—এপ্রিল ৩) রবীন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথের বন্ধু পুত্র

সন্তোষচন্দ্র বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে কৃষিবিদ্যা শিক্ষার জন্য আমেরিকাযাত্রা করেন।

রথীন্দ্রনাথ যাবার পর রবীন্দ্রনাথও পূর্ববঙ্গের উদ্দেশ্যে রওনা হন। ১৩১৩ ১লা বৈশাখ বরিশালে প্রাদেশিক সম্মিলনী ও সেই সঙ্গে একটি সাহিত্য সম্মিলনী হবার কথা ছিল। প্রাদেশিক সম্মিলনীর মনোনীত সভাপতি ছিলেন আবদুল রসুল। সাহিত্য সম্মিলনীর মনোনীত সভাপতি ছিলেন রবীন্দ্রনাথ।

আমাদের জাতীয় ঐক্য প্রচারের জন্য এই ধরনের সাহিত্য সম্মিলনের পরিকল্পনা প্রথম রবীন্দ্রনাথই করেছিলেন। ১৩১২ভাদ্র মাসে 'অবস্থা ও ব্যবস্থা' প্রবন্ধে তিনি এই মত প্রকাশ করেছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ যথাসময়ে নৌকাযোগে বরিশাল পৌছালেন কিন্তু নৌকা থেকে নামতে পারলেন না। কারণ পুলিশের তাণ্ডবলীলায় প্রাদেশিক সম্মিলনের অধিবেশন পণ্ড হয়ে যায়। দেশপূজ্য সুরেন্দ্রনাথকে অকথ্য অপমান করা হয়—সেচ্ছাব্রতীদের নির্দয়ভাবে আঘাত করা হয়। এই যজ্ঞভঙ্গের পর রবীন্দ্রনাথের কাছে বরিশালের নেতারা কর্তব্য স্থির করার জন্য যান। দীর্ঘকাল পরামর্শের পর স্থির হয় এরকম অশান্তি ও অপমানের মধ্যে সাহিত্য সম্মিলনের অধিবেশন হওয়া ঠিক নয়। রবীন্দ্রনাথের সভাপতির পদ গ্রহণে সম্মতির পর থেকে বরিশাল থেকে সভা না করে ফিরে আসা পর্যন্ত একদল সাংবাদিক সমালোচনায় মুখর হয়ে উঠেছিল।

বরিশাল থেকে ফিরে আসবার পর থেকে রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যে কাজকর্মের ধারা নিয়ে মতভেদ হয়। রবীন্দ্রনাথ কোন দলভুক্ত হননি তবুও নরমপন্থী ও চরমপন্থী দুই দলের মধ্যে শেষের দলটির প্রতি তাঁর অনুরাগ গোপন করতেও পারেন নি। বরিশাল থেকে ফিরে 'খেয়া'র কয়েকটি কবিতা লেখেন। 'বঙ্গদর্শনের' সম্পাদক পদ ত্যাগ করেন, তবে পরিচালনা থেকে বঞ্চিত করেননি।

রাজনৈতিক উত্তেজনা যে দেশের মঙ্গল আনতে পারছে না একথা রবীন্দ্রনাথ সর্বদা অনুভব করেছেন। 'ভাণ্ডার', দ্বিতীয় বর্ষ, ১৩১৩ জ্যৈষ্ঠতে তাঁর ডন সোসাটির বক্তৃতা 'স্বদেশী আন্দোলন' প্রকাশিত হয়। এই সমিতির ২য় বক্তৃতায় তিনি পল্লীসমিতির উন্নতির কথা বলেন।

১৩১৩ সালের আষাঢ় মাসে রবীন্দ্রনাথের 'খেয়া' কাব্য প্রকাশিত হয়। 'নৈবেদ্য' ও 'গীতাঞ্জলি'র মধ্যবর্তী সময়ে খেয়া রচিত হয়েছে। আগের

কাব্যগুলির থেকে এর স্বাতন্ত্র্য লক্ষ্য করা যায়। ভাষার সরলতায়, ছন্দের সাবলীলতায় ও ভাবের রহস্যময়তায় 'খেয়া' উল্লেখযোগ্য কাব্য।

'চোখেরবালি', 'নৌকাডুবি'ও 'গোরা' রচনাপর্বে বাংলা দেশের অবস্থা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। বিশেষ করে 'নৌকাডুবি' রচনার পর থেকে 'গোরা' রচনার পূর্বের যে জটিল রাজনৈতিক পরিবেশ দেখা যায়, যে উত্তেজনা ও আন্দোলন হয় তা আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রথম জোরালো প্রতিবাদ।

বঙ্গচ্ছেদের চার বছর আগে রবীন্দ্রনাথ বোলপুর শান্তিনিকেতনে নতুন ধরনের স্কুল খুলেছিলেন। জাতীয় শিক্ষা পরিষদের পক্ষ থেকে তাই রবীন্দ্রনাথের উপর স্কুল বিভাগের পঠন পত্রিকা রচনার ভার পড়ে। রবীন্দ্রনাথ 'শিক্ষা সমস্যা' নামে এক দীর্ঘ প্রবন্ধে তাঁর মতামত লিখে ওভারটুন হলে পাঠ করেন (২৩শে জ্যৈষ্ঠ ১৩১৩)।

'শিক্ষা সমস্যা' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ জাতীয় শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা নিয়ে সুদীর্ঘ আলোচনা করেন। প্রকৃতির মধ্যে বাস ছাত্র-জীবনের পক্ষে একান্ত প্রয়োজন বলে তিনি মনে করেন। প্রকৃতির মাঝে বসে শিক্ষা গ্রহণ করলে তাদের কাছে পড়াটা শাস্তি স্বরূপ না হয়ে আনন্দের হবে বলে তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস। যেখানে হৃদয়ের যোগ নেই সেখান থেকে মহান্ কিছু লাভ হয় বলে কবি মনে করতেন না। তাই শিক্ষাব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে দেশের লোকের হাতে আসাই তাঁর কাম্য ছিল।

'ভাণ্ডারে' প্রকাশিত সমসাময়িক আর একটি প্রবন্ধ 'শিক্ষা সংস্কার'য়ে তিনি দেখিয়েছেন আইরিশদের জাতীয় ভাষা ও সাহিত্যকে ইংরেজ কিভাবে ধ্বংস করেছিল। ভারতবর্ষেও তাই করতে ইংরেজ বদ্ধপরিকর। তারপর ডিসিপ্লিনের নামে স্বাধীন চিন্তায় হস্তক্ষেপ আর একটি গুরুতর ত্রুটি।

তবে একথাও সত্য রবীন্দ্রনাথ তখন তাঁর শিক্ষা সমস্যামূলক প্রবন্ধের মধ্যে যে আদর্শ আশ্রমের চিত্র তুলে ধরেছিলেন তা ছিল হিন্দুদের ব্রহ্মচর্যাশ্রমের আদর্শ, তাঁর শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়েরও আদর্শ। তখন শান্তিনিকেতনের আশ্রমে হিন্দু ভিন্ন অন্য কোন ধর্মের লোকের স্থান ছিল না। এমন কি হরিজনদেরও স্থান পাওয়া কঠিন ছিল। তাই রবীন্দ্রনাথের এই আদর্শ সর্বদেশ ও সর্বজাতি গ্রহণ করতে পারেনি। এই জন্যই এই আদর্শকে ঠিক জাতীয় আদর্শ বলা যায় না। রবীন্দ্রনাথের এই ত্রুটির দিকে নির্দেশ করে চট্টগ্রামের

কবি জীবেন্দ্রকুমার দত্ত লিখেছিলেন—কেবল হিন্দুদের জন্য তাঁর শিক্ষাব্যবস্থা, সমগ্র ভারতবাসীর জন্য এই শিক্ষাব্যবস্থা উপযোগী নয়।

এই সমালোচনার সত্য তৎকালে রবীন্দ্রনাথ স্বীকার করেন নি। তবে পরবর্ত্তীকালে প্রগতিবাদী রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়কে ব্রহ্মাচর্য্যাশ্রম থেকে নিখিল ভারতীয় করে একেবারে বিশ্বভারতী করে ফেলেন। অর্থাৎ হিন্দুর ব্রহ্মাচর্য্যাশ্রম সমস্ত ভারতীয়ের জাতীয় বিদ্যালয় ও পরে বিশ্বের সকলের হয়ে যায়।

জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার আয়োজন সম্পূর্ণ হয়। ১৫ই আগষ্ট, ১৯০৬ (১৩১৩ -৩০শে শ্রাবণ) কলকাতা টাউন হলে পরিষদ প্রতিষ্ঠার উদ্বোধন সভা হয়। ডঃ রাসবিহারী ঘোষ এই সভার সভাপতিত্ব করেন। বহু গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথও উপস্থিত ছিলেন। তিনি 'জাতীয় বিদ্যালয়' নামে একটি প্রবন্ধ পড়েন। জাতীয় শিক্ষা বা পরিষদ সম্বন্ধে এতে কোন সমালোচনা নাই। যে প্রতিষ্ঠানকে জাতি মাথা পেতে নিয়েছে তিনি তার বিরূপ সমালোচনা না করে অভিনন্দিতই করলেন। তবে তাঁর মনের মধ্যে যেন তপোবনের আদর্শ তখনও ঘুরছে। তাই সেই আদর্শের কথা বলতে ভুললেন না।

এরপর 'ততঃ কিম্' প্রবন্ধে তিনি আশ্রমধর্মকে সব থেকে বেশী মূল্য দেন। ব্রহ্মচর্য্য পালন, যৌবনে সংসারধর্ম, প্রৌঢ় বয়সে বানপ্রস্থ ও বার্দ্ধক্যে সন্ন্যাস গ্রহণ করাকেই সব থেকে ভাল বলে বলেছেন। চারিদিকের আন্দোলনের উত্তেজনা দেখে কবির মনে হয়েছে এর পর কি ? আর তাই তিনি এই প্রবন্ধে তাঁর আদর্শের কথা বলছেন।

নতুন বছরে স্কুল সম্বন্ধে আরও বেশী ভাবতে হয়। একখানি পত্রে লিখেছেন (১৩১৪ বৈশাখ ৪) স্কুল বড় হওয়ায় তার দায় দায়িত্ব বেড়ে গিয়েছে। নানা ব্যবস্থায় তিনি সর্বদাই বিব্রত।

১৩১৪ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে বরিশালের বামনদাস গাঙ্গুলীর পুত্র নগেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলীর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ছোট মেয়ে মীরার বিয়ে হয়। বিয়ের অল্পদিন পরে ছোট জামাতাকে তিনি কৃষিবিদ্যা শিক্ষার জন্য আমেরিকা পাঠিয়ে দেন।

'প্রবাসী'র সম্পাদক কবিকে গল্প লিখে দেবার জন্য একবার তিনশত টাকা দেন। কবি মেয়ের বিয়ের ব্যস্ততার মধ্যেও তাঁর কাজ ভোলেন নি। তিনি 'মাষ্টারমশাই' গল্পটি লিখে দেন। ছোট গল্প লিখে টাকা পাওয়া সম্বন্ধে কবি খুসি

হতে পারলেন না। তিনি পরের মাস থেকে 'গোরা' উপন্যাস লিখতে আরম্ভ করেন (১৩১৪ ভাদ্র)।

এই সময়ে নানা কারণে রাষ্ট্রনৈতিক অবস্থা অত্যন্ত জটিল আকার ধারণ করে। হিন্দু মুসলমানের দাঙ্গা আরম্ভ হয়। ইংরেজের ভেদনীতি, নিখিল মুসলিম জগতে আত্মসচেতনতার প্রভাব ও ভারতীয় বর্ণ হিন্দুদের মুসলমান ও অন্য ছোট জাতের প্রতি অবজ্ঞা তাদের আত্মসচেতন ও অসন্তুষ্ট করে। এই সময় মর্লি-মিন্টো শাসন সংস্কারের আয়োজনও চলতে থাকে। অর্থাৎ ভেদনীতিকে আরও বেশী করে স্থাপনের চেষ্টা চলে। ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে ভারতে মুসলিম লীগ গঠিত হয়।

কলকাতায় তখন নানা উত্তেজনা। নরমপন্থী ও চরমপন্থীদের বিরোধ স্পষ্টতর হয়ে উঠেছে। তাই নিজেদের মত প্রচারের জন্য কাগজের প্রয়োজন হয়। সুরেন্দ্রনাথ সম্পাদিত দৈনিক 'বেঙ্গালী' ও কালিপ্রসন্ন বিদ্যাবিশারদের সম্পাদনায় সাপ্তাহিক 'হিতবাদী'—এই দুটি নরমপন্থীদের মুখপত্র ছিল। চরমপন্থীদের মতিলাল ঘোষ সম্পাদিত 'অমৃতবাজার পত্রিকা, ও কৃষ্ণকুমার মিত্র প্রকাশিত 'সঞ্জীবনী' পত্রিকা। এঁদের মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা সম্পাদিত 'নবশক্তি' নামে আর একটি কাগজও প্রকাশিত হয়। কুমুদিনী মিত্রের 'সুপ্রভাত রুদ্রবাণী নিয়ে প্রকাশ পায়। এই মাসিক পত্রিকায় 'শিখের বলিদান' নামে একটি বীরত্বব্যঞ্জক কাহিনী খুব সমাদর পাওয়া সরকার পত্রিকাটি নিষিদ্ধ করে দেয়। বোধ হয় রবীন্দ্রনাথের 'সুপ্রভাত, কবিতাটি এই পত্রিকাটির জন্যই লেখা হয়েছিল।

ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের সঙ্গে যুক্ত 'যুগান্তর' ও 'সন্ধ্যা' পত্রিকায় সত্যকার বিপ্লবাত্মক প্রচার আরম্ভ হয়। 'বন্দেমাতরম' নামে আর একটি কাগজে প্রকাশিত India for Indians মন্ত্র গান্ধিজীর Quit Indiaর অগ্রবানী। অরবিন্দ ঘোষ বরোদা রাজ কলেজের অধ্যাপনা ত্যাগ করে জাতীয় শিক্ষা পরিষদের কলেজ বিভাগে যোগ দেন। পরে ইংরাজি 'বন্দেমাতরম' পত্রিকার ভার গ্রহণ করে দার্শনিক বিপ্লববাদ প্রচার করার জন্য শিক্ষকতা ত্যাগ করেন।

সরকার 'বন্দেমাতরম' পত্রিকায় রাজদ্রোহের ত্রুটি ধরে মামলা করে। বিপিনচন্দ্র পাল অরবিন্দ ঘোষের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে অস্বীকার করায় তাঁকে ছয়মাসের জন্য কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়।

রবীন্দ্রনাথ শান্তিকেতনে থেকেও প্রতিদিন আগ্রহের সঙ্গে মামলার তদারক

করতেন। ১৩১৪ ভাদ্র—'নমস্কার' কবিতায় অরবিন্দের প্রতি রবীন্দ্রনাথ শ্রদ্ধা নিবেদন করেন (বঙ্গদর্শন ১৩১৪ আশ্বিন)।

ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়কে 'সন্ধ্যা' কাগজের জন্য অপরাধী করে মামলা করা হয়। মামলা চলা সময়ে উপাধ্যায়ের মৃত্যু হয়।

দেশের অশান্তি চলছে। রবীন্দ্রনাথ ঠিকমত এসবের সঙ্গে যুক্ত নন। শান্তিকেতনে স্কুলের কাজ ও 'গোরা' লেখা নিয়ে তিনি ব্যস্ত থাকেন। ১৩১৪ র আরম্ভ থেকে আবার দুই একটি করে গান ও কবিতা লিখতে থাকেন।

১৩১৩ র নববর্ষে বরিশালে প্রথম বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের কথা ছিল কিন্তু আমরা আগেই দেখেছি যে সম্মিলন সম্ভব হয়নি। ঐ বছরের শেষের দিকে বহরমপুরের মহারাজা মনীন্দ্র নন্দীর আহ্বানে যে সভার কথা হয় তাও মহারাজাব পুত্রের মৃত্যুতে বন্ধ হয়ে যায়। ১৩১৪ সালের (কার্ত্তিক) পুজার ছুটিতে বহরমপুরে সাহিত্য সম্মিলন হয়। রবীন্দ্রনাথ সভাপতিত্ব করেন।

১৩১৪ সালেব পুজার ছুটিতে কনিষ্ঠপুত্র শমীন্দ্রনাথ কবির বন্ধুপুত্র সরোজ-চন্দ্রের সঙ্গে মুঙ্গেরে সরোজের মামার বাড়ীতে বেড়াতে যায়। সেইখানে কলেরায় শমীন্দ্রের মৃত্যু হয়। এই পাঁচ বছর কবিকে কেবল আঘাতের পর আঘাত পেতে হয়েছে। কিন্তু তাঁর শোকের বহিঃপ্রকাশ এক 'স্মরণ' ভিন্ন অন্য সাহিত্য কর্মে পাওয়া যায় না। শমীন্দ্র তার মার মৃত্যুর দিনটিতে মার মৃত্যুর ঠিক পাঁচ বছর পরে মারা যান। স্ত্রী ও রেণুকার মৃত্যুর জন্য তাঁর মন দীর্ঘ রোগ ভোগের সময়ে অনেকটা প্রস্তুত হয়েছিল কিন্তু শমীন্দ্রর আকস্মিক মৃত্যু তাঁকে শুম্ভিত করে দেয়। এই মৃত্যুর পরে মাঘোৎসবে 'দুঃখ' নামে যে ভাষণটি দেন তার মধ্যে অনেকখানি ব্যক্তিগত স্পর্শ পাওয়া যায়।

'চোখের বালি', 'নৌকাডুবি' ও 'গোরা' রচনা পর্বেই রবীন্দ্রনাথের সংসার জীবনের চরমতম দুঃখ একটার পর একটা নেমে এসেছে। সাংসারিক রবীন্দ্রনাথ যেন সমস্যায় ক্ষত বিক্ষত। একদিকে স্কুলের নানা সমস্যা, অন্যদিকে মাতৃহারা শিশুদের নানা দায়িত্ব। তবুও কবি অবিচলিত চিত্তে সমস্ত বিপদের সম্মুখীন হন। আর এখানেই তাঁর শিক্ষা সংস্কৃতির সব থেকে বড় প্রমাণ পাওয়া যায়।

শমীন্দ্রের মৃত্যুর আঘাতের পর বেলা ও মীরাকে নিয়ে দীর্ঘদিন শিলাইদহে ছিলেন। 'গোরা' নিয়মিত লিখে যাচ্ছেন, কয়েকটি গানও লিখেছেন। বর্তমান বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসকে তখন প্রাদেশিক সম্মিলন বলা হত। ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে কলকাতায় প্রথম প্রাদেশিক সমিতির অধিবেশন হয়। তারপর

থেকে ১৮৯৪ পর্য্যন্ত কলকাতাতেই হয়েছিল। ১৮৯৪ সালের অধিবেশনে বহরমপুরের উকিল বৈকুণ্ঠনাথ সেন বাংলা দেশের বিভিন্ন জিলায় এই সম্মিলনের প্রস্তাব করেন। তারপর থেকে বিভিন্ন জায়গায় এই অধিবেশন হ'ত।

১৩১৪ (১৯০৭) সুরাট কংগ্রেস নরমপন্থী ও চরমপন্থীদের মত বিরোধের ফলে লণ্ডভণ্ড হয়ে যায়, রবীন্দ্রনাথ এই খবর পেয়ে অত্যন্ত বিচলিত হয়েছিলেন। শিলাইদহ থেকে জগদীশচন্দ্র বসুকে বিলাতে এই খবর দিয়ে আক্ষেপ করে চিঠি লেখেন। পরে এই বিষয়ের উপর প্রবাসীতে 'দক্ষযজ্ঞ' নামে প্রবন্ধ লেখেন।

এই দক্ষযজ্ঞের পর সকলেরই মন খারাপ। পাবনায় প্রাদেশিক সম্মিলনের সভাপতি হবার জন্য শিলাইদহে কবির কাছে আশুতোষ চৌধুরীর ভাই সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জামাতা ব্যারিষ্টার যোগেশ চৌধুরী পাবনাবাসীর পক্ষ থেকে তাঁকে অনুরোধ করতে যান। কবিও স্বীকৃত হলেন। নানা দল থেকে বিদ্রূপ করে তাঁকে চিঠি পাঠায়। রবীন্দ্রনাথ সেসব গ্রাহ্য না করে সভাপতিত্ব করেন।

এই সময় রাজনৈতিক মতামতের জন্য কবি সকলের কাছে নিন্দিত হন। আবার কাব্যে অনির্বচনীয়তা, অস্পষ্টতা ইত্যাদি দোষ দেখিয়ে একদল সাহিত্যিকও তেমনি তাঁর সমালোচনায় পঞ্চমুখ হয়ে ওঠেন। এই সাহিত্যিকদের মুখপাত্র ছিলেন দ্বিজেন্দ্রলাল রায়। রবীন্দ্রনাথ যে সময়ে 'নৌকাডুবি' ও 'গোরা' লেখেন সে সময়ে তাঁর লাঞ্ছনার মাত্রা চরমে ওঠে। অবশেষে বাধ্য হয়ে কবি ১৩১২র বৈশাখে এক পত্রে কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের পত্রের উত্তর দেন। তাতে সামান্য পরিহাস সূচক ব্যঙ্গ থাকলেও কঠোরতা প্রকাশ পায়নি। দ্বিজেন্দ্রলাল এর পরেও দীর্ঘকাল কবির লেখার ত্রুটি, কাব্যে অশ্লীলতা ইত্যাদি নিয়ে জোর আলোচনা চালান। মাঝে মাঝে রবীন্দ্রভক্তরা অস্থির হয়ে উত্তর দিতে গিয়ে তাঁর লেখার সুন্দর সমালোচনা করেছেন। কবি তাঁদের এরকম উত্তর দেবার ব্যাপারে আপত্তি জানিয়েছেন এবং নিজেও নীরব থেকেছেন। দীর্ঘকাল ধরে কবিকে নানা ব্যঙ্গ বিদ্রূপেও যখন ক্রোধে অস্থির করতে পারলেন না তখন দ্বিজেন্দ্রলাল 'আনন্দ-বিদায়' নামে একটি ব্যঙ্গ নাটক রচনা করে অভিনয় করান। এতে দেশের লোক অভিনয়ের দিনই অত্যন্ত বিরক্ত হয়। দ্বিজেন্দ্রলাল নিজের ভুল বুঝতে পারলেন। এরপর 'ভারতবর্ষে'র সূচনায় তিনি কবিকে অভিনন্দিত করেছেন—বিরোধ মিটিয়ে ফেলেছেন।

'গোরা' রচিত হবার পর ডি. এল. রায় তাঁকে সমাদর দেখান এবং

সাময়িক ভাবে তাঁর বিরোধের ভাবটাও কেটে যায়। পরে অবশ্য তিনি কবির বিরুদ্ধে আবার অস্ত্র ধরেন।

পাবনার অধিবেশনে বিস্তারিতভাবে তিনি 'স্বদেশী সমাজে'র মতামতগুলিই আলোচনা করেন। এই অধিবেশনের এক বৈশিষ্ট্য ছিল। ১৮৯৭ খ্রীঃ নাটোর প্রাদেশিক সম্মিলনে বাংলায় সভাপতির ভাষণ দানের জন্য তাঁর নেতৃত্বে আন্দোলন হয়েছিল। সভাপতি সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ইংরাজিতে ভাষণ দিলেও রবীন্দ্রনাথ সেটি বাংলায় অনুবাদ করে পড়েন। এইবার রবীন্দ্রনাথ নিজে সভাপতি হয়ে বাংলায় ভাষণ দেন। এই প্রবন্ধটির নাম 'সভাপতির অভিভাষণ'। পাবনার কনফারেন্সে রবীন্দ্রনাথের অভিভাষণ নেতা জনতা কাউকেই খুসি করতে পারেনি।

এইসময় যুগান্তর পত্রিকায় নানারকম উদ্দীপনামূলক রচনা বার হলেও সাধারণ লোকে বিপ্লবীদের কাজ সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানত না। ১৩১৪, ১৮ই চৈত্র মজঃফারপুরে ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্লচাকীর বোমা ছোঁড়ার পর দেশ জোড়া এক বিরাট চাঞ্চল্য দেখা দেয়। এরপরই মানিকতলার বোমার মামলা হয়। দেশের লোকমান্য তিলক স্পষ্ট ভাষায় নিজের কথা বলেন বলে ছয়বৎসরের জেল হয়। লোকের মধ্যে একটা আতঙ্কের ভাব দেখা দেয়। রবীন্দ্রনাথ কলকাতায় চৈতন্য লাইব্রেরিতে 'পথ ও পাথেয়' নামে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। 'বঙ্গদর্শন' ১৩১৪র জ্যৈষ্ঠ মাসে ঐ প্রবন্ধটি 'রাজা ও প্রজা' নামে প্রকাশিত হয়। এই প্রবন্ধে রাজরোষে অত্যাচারিত অবজ্ঞাত মানবাত্মার এইরকম পরিণতি হয় এই কথাই কবি বলতে চেয়েছেন। দেশের লোককে কবি বোঝাতে চেয়েছেন যে বাঙালি ভীরু একথা অসহ্য ছিল তাই তার বীরত্বে এক ধরণের আনন্দ দিয়েছে তবু এপথ ঠিক নয়। স্বাধীনতা যত কাম্যই হ'ক মানবাত্মার অবমাননা কোন মতেই চলে না। তিনি বলেছেন ভারতবর্ষ যুগে যুগে বৈপরীত্যের মধ্যে ঐক্য এনেছে, মিলন সাধনই তার ধর্ম।

এই প্রবন্ধের সমালোচনা দেখে কবি বুঝলেন আরও পরিস্কারভাবে বিষয়টির অবতারণা দরকার। তাই 'সমস্যা' নামে একটি প্রবন্ধ লেখেন। হিন্দু মুসলমানের সমস্যা ও রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানের সব থেকে বড় উপায় যে ঐক্য, তা তিনি আরও ভাল করে বললেন।

পূর্ব অধ্যায়ে আমরা রবীন্দ্রনাথের আধ্যাত্মিক চিন্তা বা ধর্মমত নিয়ে আলোচনা করেছি। তবু 'গোরা' রচনার অব্যবহিত আগের ও সমসাময়িক

কালের ধর্মীয় ভাবের কথা অবশ্য আলোচ্য। অনেকের মতে রবীন্দ্রনাথের অধ্যাত্ম—ভাবনার ফসল 'নৈবেদ্য' কাব্য, কিন্তু নৈর্বক্তিক জ্ঞানমার্গী কাব্য রবীন্দ্রনাথের মত লিরিক্পন্থী রোমান্টিক কবিমনের জিনিস নয়। তাঁর অন্তর যেন এখানে অনুপস্থিত। 'খেয়া'র আধ্যাত্মিক ব্যাকুলতার মধ্যে রবীন্দ্রনাথের স্পর্শ আছে। পরে শোক সন্তপ্ত কবি 'শান্তিনিকেতনে'র উপদেশ মালার মধ্যে নিজ মনের অধ্যাত্মচিন্তাকে মুক্তি দিয়েছেন।

'গোরা' উপন্যাসের সঙ্গে সঙ্গে 'শান্তিনিকেতনের' উপদেশমালা চলছে। আবার শেষের দিকে 'গীতাঞ্জলি'র কিছু গানও রচিত হয়েছে। 'নৈবেদ্য', 'খেয়া' ও 'গীতাঞ্জলি' কাব্যতে রবীন্দ্রনাথের যে ভাব প্রকাশ পেয়েছে অধ্যাপক ক্ষুদিরাম দাসের কথায় তার উল্লেখ করা যায়—

"প্রথমতঃ জীবনদেবতার উপলব্ধির মধ্যে মধ্যে বিকাশ পরায়ণ কবি—আত্মার সাক্ষাৎকার লাভ এবং সেই সূত্রে ক্রমপরিণামের পথে ধাবমান ব্যক্তিত্বের সঙ্গে বিশ্বের যোগ আবিষ্কারের পরমতম বিস্ময়, এবং দ্বিতীয়তঃ প্রাচীন প্রাচ্য সাহিত্য—মূলতঃ কালিদাসের সঙ্গে কবির গভীর পরিচয়ের ফলে সংস্কৃত সাহিত্যাদর্শ, তপোবনাদর্শ ও প্রাচীন ভারতীয় ধর্মাদর্শের প্রতি কবির স্থির অনুরাগ-প্রতিষ্ঠা—এই দুটি ঘটনা কবির কাব্যজীবনকে দ্রুত পরিবর্তনের পথে নিয়ে গেছে এবং ধর্মাভিমুখী করেছে, নৈবেদ্য সেই ধর্মাভিভবের প্রথম প্রকাশ। (১৮ই পৃঃ)

"নৈবেদ্যের মত উৎসর্গও অরূপ সাধনায় প্রবেশের প্রস্তুতির বার্তা বহন করে, শুধু উৎসর্গ এক পদ অগ্রসর এই জন্যে যে নৈবেদ্যে অধ্যাত্মবোধ প্রাচীন ধর্মাদর্শের দ্বারা গ্রস্ত,উৎসর্গে তা স্বকীয় অনুভূতির প্রত্যক্ষে জীবন্ত।' (১৭৯ পৃঃ)

"কবির অরূপ উপলব্ধি তাঁর প্রকৃতি-ভাবুকতা বা প্রকৃতি-সৌন্দর্য-বিহ্বলতা থেকেই উৎপন্ন হয়েছে। প্রকৃতি-উদ্বোধিত রসোপলব্ধির এই নিবিড় মুহূর্তগুলি কী ভাবে কবিকে অসীমের উপলব্ধিতে নিয়ে গেছে তার আশ্চর্য পরিচয় খেয়া ও শারদোৎসবে বর্তমান। (১৭৯ পৃঃ)

"খেয়া ও শারদোৎসবে যে অরূপ প্রকৃতিগত বিস্ময়-ব্যাকুলতার মধ্যে কবির চোখে ধরা দিলেন তিনি গীতাঞ্জলিতে কবির হৃদয় জুড়ে বসেছেন দেখা যায়।" (১৯৯পৃঃ) (রবীন্দ্র প্রতিভার পরিচয়—ক্ষুদিরাম দাস। প্রথম প্রকাশ ১৩৬০—পুঁথিঘর)।

রবীন্দ্রজীবনীকার এই সময়ের অধ্যাত্মবাদ প্রসঙ্গে বলেছেন—

"'নৈবেদ্য'র দেবতা দূরে থাকিয়া পূজার্ঘ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন, 'খেয়ার নেয়ে' আলোছায়ার রহস্যালোকে অস্পষ্টভাবে ক্ষণে ক্ষণে দেখা দিয়াছেন, আর 'গীতাঞ্জলি'র দেবতা ভক্তের সম্মুখে আসীন। 'শান্তিনিকেতনে'র ধ্যানলব্ধ সাধনার মধ্যে 'গীতাঞ্জলি'র রসানুভূতির প্রতিষ্ঠা। কবির এই রসের ধর্ম 'গীতাঞ্জলি', 'গীতিমাল্য' ও 'গীতালি'তে স্তরে স্তরে গভীর হইতে গভীরে গিয়া পূর্ণতা লাভ করিয়াছে। 'গীতালি'র শেষ কবিতাটি পাঠ করিলে এই কথাটি স্পষ্ট হইবে।" (রবীন্দ্রজীবনী, ২য়খণ্ড—প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, ১৮৭ পৃঃ। ১৩৫৫ মাঘ, বিশ্বভারতী)।

'ত্রয়ী' রচনা সময়ে রবীন্দ্রকাব্যে তাঁর আধ্যাত্মিকতার বিকাশ ও প্রকাশ সম্বন্ধে আমরা দুজন বিচক্ষণ লেখকের মন্তব্য লক্ষ করলাম। এই সময়ে কবির অধ্যাত্ম উপলব্ধির পরম পরিণতি ও বিকাশ, আবার নানা প্রবন্ধ ও নতুন ধারার উপন্যাস রচনাও হয়।

১৩১৬র আষাঢ় মাসে 'গীতাঞ্জলি'র গানের প্রথম যাত্রা। ওদিকে 'গোরা' রচনার কাজ দ্রুত চলছে। একদিকে 'গীতাঞ্জলী'র গানের ডালা সাজাচ্ছেন, অন্যদিকে 'গোরা' সমাপ্তির পথে।

"আমাদের আলোচ্য পর্বে 'গোরা' উপন্যাসখানি লেখা শেষ করিলেন। (১৩১৬ শ্রাবণ) রবীন্দ্রনাথের ১৬ হইতে তিয়াত্তর বৎসর বয়সের মধ্যে যে সব উপন্যাস রচিত হয় তাহাদের ঠিক মধ্যখানে হইতেছে 'গোরা' উপন্যাস। ·····
......১৩১৪ সালের ভাদ্র মাসে প্রবাসীতে শুরু হইল 'গোরা', ধারাবাহিক মাসে মাসে বাহির হইয়া শেষ হইল ১৩১৬ সালের চৈত্র মাসে।" (রবীন্দ্রজীবনী-২য় খণ্ড, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, ২১৫ পৃঃ, ১৩৫৫ মাঘ বিশ্বভারতী)

অগ্রহায়ণ ১৩১৬র ১৫ই—রবীন্দ্রনাথ ওভারটুন হলে (Y.M C.A.) 'তপোবন' নামে বিখ্যাত প্রবন্ধ পাঠ করেন।

১৩১৬ সালে ১৪ই মাঘ রবীন্দ্রনাথ তাঁর পুত্র রথীন্দ্রনাথের সঙ্গে গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভগ্নী বিনয়নী দেবীর বিধবা কন্যা প্রতিমা দেবীর বিবাহ দেন। বিধবা বিবাহ ঠাকুর বাড়ীতে এই প্রথম, তাই এই বিবাহকে বিপ্লবাত্মকও বলা যায়।

'গীতাঞ্জলি'র দুই একটি করে গান তখনও লিখছেন। 'গীতাঞ্জলি' কাব্যের ১৫৭টি কবিতার মধ্যে ৫৭টি কবিতা 'গোরা' পর্বে রচিত। 'গীতাঞ্জলি'র প্রকাশ হয় অনেক পরে।

১৩১৬ মাঘোৎসবে কলকাতায় 'বিশ্ববোধ' নামে তাঁর বিখ্যাত প্রবন্ধ পাঠ করেন। এটি 'শান্তিনিকেতন' ১০ম খণ্ডে আছে।

'গীতাঞ্জলির' গান লেখা চলছে। অনেকের ধারণা কবি আধ্যাত্মিক ভাবনায় বিভোর ছিলেন, আই তুরীয় অবস্থায় ছিলেন। একথা সম্পূর্ণ ভুল। রবীন্দ্রনাথের মধ্যে যেন একই সঙ্গে বহু সত্তা কাজ করে যেত। তাই দেখা যায় পুত্র রথীন্দ্রনাথ ও বন্ধুপুত্র সন্তোষচন্দ্রকে জীবনে প্রতিষ্ঠিত করার জন্ম তিনি যেমন চিন্তাশীল, স্কুলের কাজকর্ম ও ব্যবস্থা, 'গোরার' সমাপ্তি, 'গীতাঞ্জলি' গান রচনা ও আধ্যাত্মিক ভাবনার দার্শনিক প্রবন্ধমালা একই সঙ্গে চলেছে। আর এইখানেই তাঁর বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্য। 'গোরা' রচনার আগে থেকে 'গোরা'র সমসাময়িক কালের রবীন্দ্রমানসের মোটামুটি নক্সা আঁকা গেল।

এই উপন্যাস তিনটি রচনার পর্বে রবীন্দ্র প্রতিভা বিচিত্ররূপে বিকশিত হয়ে নানা ধারায় ছড়িয়ে পড়ে। কবিতা গান তো ছিলই, সবচেয়ে বেশী বৈচিত্র্য দেখা যায় গল্প রচনার মধ্যে। অহেতুক আনন্দের খেয়ালে লেখা খেয়াল খুসির রচনা, 'প্রাচীন সাহিত্যের' রসঘন সমালোচনা তথা নবরূপ সৃষ্টি, সাহিত্যের তথ্যবহুল মনোজ্ঞ সমালোচনা, ধর্মের গভীর অনুভূতি ও উপলব্ধিসঞ্জাত ভাবনা, মনীষী চরিত্রের আলোচনা, স্বদেশ সম্বন্ধে নানা সমস্যা সমাধানমূলক আলোচনা, শিক্ষাবিষয়ক নব নব চিন্তা, বাংলা শব্দতত্ত্ব ও ভাষাতত্ত্বের আলোচনা, বিদ্যালয়ের জন্ম ইংরাজি সোপান লেখা, ব্যঙ্গ কৌতুক, হাস্য কৌতুক দুই একটি নাটক ও সামাজিক সমস্যা সমাকীর্ণ তিনখানি মনস্তত্ত্বমূলক উপন্যাস এই কয়বছরে রচিত হয়েছে।

এই পর্বে তাঁর জীবনে সব থেকে বেশী আঘাত আসে। আর এই সময়েই একবার কবি রবীন্দ্রনাথ তাঁর চিরকালের দেশবন্দনার ধ্যানরূপের জগৎ থেকে বেরিয়ে এসে রাজনৈতিক আন্দোলনে প্রত্যক্ষভাবে জড়িয়ে পড়েছিলেন।

এইসব কারণে এই পর্বের ঐতিহাসিক মূল্য অপরিসীম।

॥ 'ত্রয়ী' রচনা পর্বে রবীন্দ্রনাথের রচনা সম্ভার ॥

নৈবেদ্য (কবিতা) আষাঢ় ১৩০৮
ঔপনিষদ ব্রহ্ম—শ্রাবণ ১৩০৮
বাংলা ক্রিয়াপদের তালিকা-১৩০৮
চোখের বালি—১৩০৯
কাব্যগ্রন্থ—মোহিতচন্দ্র সেন সম্পাদিত—(১ম—৯ম খণ্ড)—১৩০৯-১৩১০
কর্মফল—(গল্প) ১৩১০
রবীন্দ্র-গ্রন্থাবলী। হিতবাদী উপহার। ১৩১১
আত্মশক্তি (প্রবন্ধ) ১৩১২
বাউল (গান) ১৩১২ ভাদ্র
ভারতবর্ষ (প্রবন্ধ) ১৩১২
খেয়া (কবিতা) ১৩১৩ আষাঢ়
নৌকাডুবি (উপন্যাস) ১৩১৩
বিচিত্র প্রবন্ধ (গদ্য—গ্রন্থাবলী) ১৩১৪ বৈশাখ
চরিত্রপূজা (প্রবন্ধ) ১৩১৪
প্রাচীন সাহিত্য (গদ্য-গ্রন্থ ২) ১৩১৪ আষাঢ়
লোকসাহিত্য (গদ্য-গ্রন্থ ৩) ১৩১৪ শ্রাবণ
সাহিত্য (গদ্য-গ্রন্থ ৪) ১৩১৪ আশ্বিন
আধুনিক সাহিত্য (গদ্য-গ্রন্থ ৫) ১৩১৪ আশ্বিন
হাস্যকৌতুক (গদ্য-গ্রন্থ ৬) ১৩১৪ পৌষ
ব্যঙ্গকৌতুক (গদ্য-গ্রন্থ ৭) ১৩১৪ পৌষ
প্রজাপতির নির্বন্ধ (গদ্য-গ্রন্থ ৮) ১৩১৪ মাঘ
পাবনা প্রাদেশিক সম্মিলনী সভাপতির অভিভাষণ
প্রহসন (গদ্য-গ্রন্থ ৯) ১৩১৫ বৈশাখ
রাজাপ্রজা (গদ্য-গ্রন্থ ১০) ১৩১৫ আষাঢ়
সমূহ (গদ্য-গ্রন্থ ১১) ১৩১৫ আষাঢ়
স্বদেশ (গদ্য-গ্রন্থ ১২) ১৩১৫ শ্রাবণ
সমাজ (গদ্য-গ্রন্থ ১৩) ১৩১৫ ভাদ্র
গান (সিটি বুক সোসাইটি) ১৩১৫ ভাদ্র

শারদোৎসব (নাটিকা) ১৩১৫ ভাদ্র

শিক্ষা—(গদ্য-গ্রন্থ ১৪) ১৩১৫ অগ্রহায়ণ

মুকুট—(নাটিকা) ১৩১৫ পৌষ

শব্দতত্ত্ব—(গদ্য-গ্রন্থ ১৫) ১৩১৫ মাঘ

ধর্ম (গদ্য-গ্রন্থ ১৬) ১৩১৫ মাঘ

শান্তিনিকেতন—(৮ খণ্ড) ১৩১৫ অগ্রহায়ণ হইতে ১৩১৬ বৈশাখ পর্য্যন্ত ভাষণ।

প্রায়শ্চিত্ত—(নাটিকা) ১৩১৬ আশ্বিন

চয়নিকা—১৩১৬

শান্তিনিকেতন—(৯ম—১১শ ভাগ) ১৯১০

গোরা—১৩১৬

(এই তালিকা—রবীন্দ্র জীবনী ২য় খণ্ড প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়—সংস্করণ ১৩৫৫ মাঘ বিশ্বভারতীর সাহায্যে রচিত)।

॥ ১১ ॥

॥ রবীন্দ্রনাথের "ত্রয়ী"র বিশ্লেষণ ॥

—ক—

—চোখের বালি—

উপন্যাস সম্পূর্ণভাবে আধুনিক কালের সৃষ্টি। পৃথিবীর সব দেশের সাহিত্যেই প্রায় উপন্যাসের পূর্ব-সূচনা মধ্যযুগ থেকে দেখা গেলেও উপন্যাস আধুনিক-কালের আগে সৃষ্টি হয়নি। তার কারণ উপন্যাস সৃষ্টির জন্য পরিবেশের প্রধান ভূমিকা আছে।

উপন্যাসের বহুবিধ রূপাঙ্গিক থাকা সত্বেও সাধারণভাবে বলা যায় উপন্যাস জীবনের শিল্প রূপায়ণ আর তাব মাধ্যম হল বর্ণনামূলক গদ্য।

বাংলা উপন্যাস সাহিত্যের ইতিহাস একশত বৎসরের। কিন্তু এই অল্প সময়ের মধ্যেই বাংলা উপন্যাসে কাহিনী-বিন্যাসেব প্রায় প্রতিটি সম্ভাব্যরীতিই অবলম্বিত হয়েছে।

আজ পর্য্যন্ত বাংলা উপন্যাসে কাহিনী বিন্যাসের যে রীতি সব থেকে বেশী অবলম্বন করা হয়েছে সেটাই প্রাচীনরীতি। এই রীতিটির সুবিধা হচ্ছে, এখানে লেখকই কাহিনী বিবৃত করতে পারেন। চরিত্রগুলির আত্মবিশ্লেষণে যদিও এই রীতিটির পক্ষে কিছু পরিমাণে বাধা আছে, তবু লেখক নিরপেক্ষভাবে চরিত্রগুলির মনের কথাকে পাঠকের সামনে বর্ণনার মাধ্যমে প্রকাশ করতে পারেন। নাটকে যেখানে স্বগতোক্তির ব্যবহার করা হয় এই রীতির উপন্যাসে সেখানে লেখকই চরিত্রগুলির মনের কথা বলে দেন।

রবীন্দ্রনাথ 'চোখের বালি' উপন্যাসে এই প্রাচীন রীতিরই অনুসরণ করেছেন।

রবীন্দ্রনাথের বিচিত্র প্রতিভা কাব্য, নাটক, ছোট গল্প, প্রবন্ধ ও উপন্যাসে আপন স্বাক্ষর চিহ্ন রেখে গিয়েছে। এই বিরাট সৃষ্টি সম্ভারের মধ্যে তাঁর উপন্যাসগুলি একদিকে কাব্য সৌন্দর্য্যে ও অন্যদিকে তীক্ষ্ণ মননধর্মী আধুনিক ব্যক্তিমানসের প্রতিফলনে সমুজ্জল। পর্ব থেকে পর্বান্তরে তিনি নব নব বৈচিত্র্য সাধন ও সত্য অনুসন্ধান করেছেন। লিরিক কবিতা সম্পূর্ণভাবে আত্ম উপলব্ধির থেকে সৃষ্টি হয়। নাটককে নৈর্বক্তিক শিল্প বলা যায়। উপন্যাস লিরিক কবিতার

তুলনায় নৈর্বক্তিক হলেও রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসও অনেক পরিমাণে তাঁর ব্যক্তিত্বের উপাদানে গঠিত।

কবি নিজেই নিজেকে রোমান্টিক বলে স্বীকার করেছেন। তাঁর সত্যিকার পরিচয় তিনি নিজেই দিয়েছেন। তিনি কবি, তিনি সৌন্দর্যের পূজারী। তাই প্রাত্যহিকের ধূলি মলিন ধরণী তাঁকে টানলেও সেখানে তিনি আবদ্ধ হয়ে থাকেন নি। মুক্তপক্ষ বিহঙ্গের মত সুদূর নভোনীলেও তাঁর বিস্তৃতি। রোমান্টিক কবিকে ছায়াচ্ছন্ন মন্ময়তা মগ্ন করে রাখে আবার বাস্তবের কঠিন সমস্যাসঙ্কুল পথেও তিনি নেমে আসেন।

উপন্যাস এমন এক শিল্প যার মধ্যে কল্পনাব রং লাগান গেলেও তাকে দাঁড়াতে হয় বাস্তবের মাটিতে শক্ত হয়ে। ঐতিহাসিক উপন্যাসে রূপ রং কল্পনার অবকাশ তবু আছে, কিন্তু সামাজিক উপন্যাসে এ সুযোগ কম, এ একেবারে গদ্যপন্থী। তাই সামাজিক উপন্যাস সৃষ্টিতে মনোযোগ দিতে হয় আরও বেশী কারণ যুক্তি তর্কের উচিত অনুচিতের আঘাত আসবার সম্ভবনা প্রতি পদক্ষেপেই।

এমন জন্ম রোমান্টিক কবির হাতে 'চো'খের বালি' উপন্যাস যেন ব্যতিক্রম। এখানে কল্পনার আবিলতা নেই, আছে বাস্তবের স্থির বিশ্বাস সম্পন্ন যুক্তিনির্ভর কাহিনী। সমগ্র রবীন্দ্রসাহিত্যে যে একটা সঙ্গতি দেখতে পাওয়া যায় এখানে এসে প্রথম যেন তার ব্যতিক্রম লক্ষ্য করা যায়। "সৃষ্টি পাগ্‌লামি এই—একান্ত কিছু হেথা নেই।" নিজের এই উক্তি তাঁর এই নতুন ধারার উপন্যাসগুলিতে বিশেষতঃ 'চোখের বালি'তে সার্থক হয়ে উঠেছে।

একটু চিন্তা করলেই বোঝা যায় সুন্দরের গভীরে যে সত্য আছে তাকে উপলব্ধি করতে হলে মনের মধ্যে ডুব দিতে হয়। সুন্দরকে অন্তর দিয়ে অনুভব করতে হয়, তাই যুক্তিতর্ক নয়, অনুভূতিই কাজ করে। কিন্তু যদি জীবনের মধ্যে সত্য খোঁজা যায় তবে নানা বাধা সরিয়ে লোক সমাজে সেই সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করতে হয় যুক্তি দিয়েই। তার জন্যে কাব্যের মনোরম আয়োজনের চেয়ে দরকার সহজ গদ্য ভাষা। রবীন্দ্রনাথ তাই অনেক প্রবন্ধ লিখেছেন। কিন্তু প্রবন্ধে মনোভাব প্রকাশ পায় শুষ্ক যুক্তির মাধ্যমে। জীবনসত্য আবিষ্কার করা যায় মানুষের মধ্যে, তার জীবনধারার মধ্যে। সেই বিচিত্র ঘটনা ও ঘাতপ্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে মানুষকে আবিষ্কার করার জন্য কবিকে উপন্যাস লিখতে হয়। প্রথম জীবনে রবীন্দ্রনাথ ইতিহাস কাহিনীর মধ্যে মানুষ খুঁজেছেন

কিন্তু যেন ঠিকমত পাননি। তাই আড়াল সরিয়ে একেবারে বাস্তবের সমস্যা সঙ্কুল সামাজিক উপন্যাস লেখেন। আর এই দ্বিতীয় পর্য্যায়ের উপন্যাসগুলির প্রথমা 'চোখের বালি'। রোজকার জীবনের নানা সমস্যা বিশেষতঃ নরনারীর প্রেম সমস্যাই সাহিত্যের অন্যতম উপাদান। এই 'চোখের বালি' উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ প্রধানতঃ নরনারীর এই প্রেমাবেগের সমস্যা ও সংগ্রামের বিবরণ ও বিশ্লেষণ দেখিয়েছেন। আমরা জানি এই পর্বে রবীন্দ্রনাথ প্রাচীন ভারতীয় ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। নব হিন্দুত্বের গৌরববোধ তাঁর 'নৈবেদ্য' কাব্যগ্রন্থে নানা প্রবন্ধে উপস্থিত করেছেন। কিন্তু ছন্দ বা শুষ্ক যুক্তি কোনটাতেই কবি তাঁর মতকে যেন রূপ দিয়ে খুসি হতে পারেন নি তাই উপন্যাসের প্রয়োজন বোধ করেছেন। জীবনের মধ্যে দিয়ে তাঁর মতবাদকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন।

প্রেমের শান্ত কোমল মঙ্গলময় রূপই রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন। এর দাহিকা শক্তি, এর যন্ত্রণা ও তীব্রতা খুব বেশী তিনি দেখান নি। তাই বলে একেবারেই দেখাননি বলা যায় না। 'চোখের বালি'র বিনোদিনীর প্রেম যেমন জ্বালাময় পরবর্ত্তী কালের চতুরঙ্গ উপন্যাসের দামিনী চরিত্রেও তেমনি আমরা এই দাহিকা শক্তির পরিচয় পাই। অসামাজিক প্রেমাবেগও রবীন্দ্রসাহিত্যে খুব বেশী নাই। 'চোখের বালি' উপন্যাসেই প্রথম অবৈধ প্রেমের কাহিনী দেখা যায়। অবশ্য ছোট গল্প 'নষ্টনীড়ে' এর কিছু ইঙ্গিত আছে। রবীন্দ্রসাহিত্যে এই দুটি ভিন্ন অবৈধ প্রেমের চিত্র বোধ হয় আর নাই।

'চোখের বালি' উপন্যাস বাংলা সাহিত্যে একটি নতুন ধারা বহন করে এনেছিল। স্বয়ং লেখকও এর বৈশিষ্ট্য অনুভব করতে পেরেছেন। এই উপন্যাসে ঘটনার ঘাতপ্রতিঘাতের চেয়ে মনের দ্বন্দ্ব নিবিড়ভাবে প্রকাশ পেয়েছে। এতবড় উপন্যাস কিন্তু অল্প কয়টি চরিত্রের অন্তর্দ্বন্দ্ব এর বিষয়বস্তু। এই উপন্যাস প্রকাশিত হবার পর রবীন্দ্রনাথ একশ্রেণীর সমালোচকদের দ্বারা নিন্দিত ও আর এক শ্রেণীর সমালোচকদের দ্বারা অভিনন্দিত হয়েছিলেন। প্রাচীনপন্থীরা প্রেম সম্বন্ধে এমন খোলাখুলি আলোচনা সমাজের পক্ষে ক্ষতিকর বলে ধারণা করেন। তেমনি নব্যপন্থীরা এই নতুন মনস্তত্বমূলক পদ্ধতির জন্য উপন্যাসখানির প্রশংসা করেন।

'চোখের বালি' উপন্যাসের প্রথম লক্ষণীয় এর নাম। নাম সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বরাবরই খুব সচেতন। কেবলমাত্র খেয়ালখুসি অনুযায়ী তিনি তাঁর কাব্য,

নাটক বা উপন্যাসের নামকরণ করেননি। নামকরণের পিছনে চিন্তাশীল কবির ভাবনাও কাজ করেছে। 'চোখের বালি' উপন্যাস হয়ে বার হবার আগে 'বিনোদিনী' নামে কবির খসড়ায় ছিল। উপন্যাসের নাম সাধারণতঃ নায়ক বা নায়িকার নাম থেকে হয়—অথবা কোন বিশেষ ঘটনা বা বিষয় থেকে হয়। আবার কাব্যময় নামকরণও প্রচলিত আছে। উপন্যাসের নাম নির্বাচনে এইভাবে স্বদেশ ও বিদেশে নানা নিয়ম প্রচলিত।

কবি কেন 'বিনোদিনী' থেকে উপন্যাসের নাম 'চোখের বালি' করলেন সে সম্বন্ধে কোনও সংবাদ পাওয়া যায় না। বোধহয় নায়িকার নামের চেয়ে এই পাতান নামটিতে উপন্যাসের বিষয়বস্তু পরিষ্কার হচ্ছে বলেই তিনি এরকম নামকরণ করেন। বাঙ্গালী পাঠক বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিষবৃক্ষের' পর আর একবার জ্বালাময় নামের এক জ্বালাময় কাহিনী হাতে পায়।

আশা বিনোদিনীর সঙ্গে বন্ধুত্বের নিদর্শন হিসাবে একটি নাম পাতাতে চায়। তাই একটি শ্রুতিমধুর নাম ঠিক করে। বিনোদিনী সে সব বাদ দিয়ে এই 'চোখের বালি' নামটি নির্বাচন করে। এখানে তার চরিত্রের বৈশিষ্ট্য এই নামকরণ থেকে খানিকটা আভাসে পাওয়া যায়। জীবনে মিষ্টি মধুর অনুভূতির পরিবর্তে ব্যথা বেদনা তার বেশী। বিশেষ করে আশার স্বামী তার সঙ্গে বিয়েতে আপত্তি করে, কিন্তু আশাকে সাগ্রহে বরণ করে। তার অবচেতন মনে এর জন্যে আশার বিরুদ্ধে একটা আক্রোশ ছিল। তাই নামকরণের সময় মিষ্টি মধুর মধুর নামগুলি বাতিল করে 'চোখের বালি' পছন্দ করে। চোখে বালি পড়লে চোখ জ্বালা করে, কষ্ট হয়। আশা তার কাছে সেই রকম, এটাই বোধহয় তার মনে ছিল। প্রধানতঃ এই ব্যাথা, জ্বালা ও সংগ্রামের কাহিনী এই উপন্যাসের বিষয়বস্তু বলে লেখক নায়িকার নামের পরিবর্তে এই তাৎপর্যপূর্ণ নামটি নির্বাচন করেছেন। সমস্ত উপন্যাসটি পড়ে মনে হয় মননশীল লেখকের উপযুক্ত নাম নির্বাচন হয়েছে।

এই উপন্যাসের আর এক উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য abrupt beginning। উপন্যাস আরম্ভ হয়েছে একেবারে যেন হঠাৎ, কোন ভূমিকা নেই, কোন আয়োজন নেই। আগে কোন পরিচয় দেননি, উপন্যাসের গতির সঙ্গে সঙ্গে পরিচয় দিয়ে গিয়েছেন।

অল্প কয়টি চরিত্র নিয়ে এই সুবৃহৎ উপন্যাস রচিত হয়েছে। আর যারা

এসেছে, একেবারে নামে মাত্র। গল্পের প্রয়োজনে এলেও তাদের সম্বন্ধে কিছুই বলা যায় না।

এই উপন্যাসে প্রথমে যে আমাদের সামনে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে সে হচ্ছে নায়িকা বিনোদিনী। বাংলা সাহিত্যে এরকম personality সম্পন্ন মেয়ে এর আগে এমন পরিস্ফুটভাবে আসেনি। বিনোদিনীর তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, পড়াশোনা ও রূপ ছিল, আব সে সম্বন্ধে অত্যন্ত সচেতন হওয়ায় কোনরকম অবহেলা তার অসহ্য ছিল। আত্মসচেতনতা থেকে তার মধ্যে একটা complex গড়ে ওঠে যার ফলে সে প্রতিহিংসায় হিংস্র হয়ে যায়। বিনোদিনী চরিত্রের মনস্তত্বের গভীর ও জটিল তত্বগুলি লেখক তুলে ধরেছেন। অবজ্ঞা তাকে হিংস্র করে তোলে কিন্তু যখন আয়ত্তে পায় তখন তার সহজ কল্যাণবুদ্ধি ফিরে আসে। অর্থাৎ তার কাছে নতী স্বীকার করলে সে ত্যাগ কবতে বাজী হয়। এ এক অদ্ভুত মানসিকতা, বিনোদিনীকে নিচে নামিয়েও মর্য্যাদা দিয়েছে। নারীর নীরব কান্না বাংলা সাহিত্যের একচেটে বিষয়। কিন্তু এমন হাহাকার খুব কম নারী চরিত্রের মধ্যেই প্রকাশ পেয়েছে। ভিতরে ভিতরে জলতে জলতে শান্ত বনভূমিতে আগুণ ধরে ওঠে, তেমনি কামনা ও প্রতিহিংসার আগুনে জলতে জলতে বিনোদিনীর অন্তরের আগুনও একদিন সংসার জ্বালিয়ে দিতে বসেছিল। আর এইখানে এসেই লেখক তার নায়িকার অন্তরেব আগুন নিবিয়ে দিয়েছেন। এটা সমালোচকদের সব থেকে আপত্তির কাবণ। শুভ বুদ্ধি সব মানুষের মধ্যেই থাকে। কোন কারণে স্বচ্ছ সহজ দৃষ্টি আচ্ছন্ন হয়ে গেলে মানুষের মধ্যে এরকম ধ্বংসবুদ্ধি কাজ করে কিন্তু সেই আবরণ আবার সরে গেলে মানুষ স্বাভাবিক অবস্থায় আসে, তার মধ্যের শুভবুদ্ধি সচেতন হয়ে ওঠে। রবীন্দ্রনাথ Pessimist ছিলেন না। তিনি ছিলেন আশাবাদী। দুঃখের মধ্যে দিয়ে একদিন পরম আসেন এই ছিল কবির কথা। এখানেও তিনি বিনোদিনীর মধ্যে তাই দেখাতে চেয়েছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের কুন্দনন্দিনী বড়ই শান্ত। তার মনের মধ্যে এতখানি প্রাপ্তির আকাঙ্খা ছিল না। তার প্রেমে বেদনা ছিল, এমন হাহাকার ছিল না। 'বিষবৃক্ষের' হীরা চরিত্রের মধ্যে ছিল প্রেমের যন্ত্রনাদায়ক রূপ। তবে হীরার হিংস্রতা আরও বেশী। তার মধ্যে বিনোদিনীর মত গুণও দেখা যায় না। তাছাড়া সে ছিল নিম্নশ্রেণীর মেয়ে। হীবা তার মূল্য ও স্বীকৃতি না পেয়ে পাগল হয়ে যায়। বিনোদিনীর শিক্ষা ছিল এবং সে বিহারীর কাছে স্বীকৃতি পেয়েছিল তাই পরিবর্ত্তন সম্ভব হয়েছে। বাংলা দেশের ঘরে ঘরে অল্প বয়সী বিধবাদের যে অর্ন্তজ্বালা সহ্য করতে

হয় তার পরিষ্কার চিত্র পাওয়া যায় এখানে। একজন সমবয়সী নারীর আহার, সজ্জা, ভোগের কোন বাধা নেই আর একজনকে দীর্ঘশ্বাস ফেলে মুখ ঘুরিয়ে বসে থাকতে হবে, এটা অনেকে মানলেও বিনোদিনীদের মত যুক্তিবাদীরা মানতে পারে না। তারা ভাগ্যের হাতে নিজেকে ছেড়ে না দিয়ে বিদ্রোহ করে। এরকম ত্রুটিপূর্ণ প্রথা যে সমাজের পক্ষে কতখানি ক্ষতিকর এটাই কবি দেখাতে চেয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথকে অনেকে প্রাচীনপন্থী বলেন। কিন্তু আমাদের চিন্তাধারা বোধ হয় তাঁর সাহায্যে সব থেকে পরিপুষ্টি লাভ করেছে। অন্ত:পুরের অন্তরালে নারীর ব্যর্থ বেদনার কথা তিনি তাই এমন স্পষ্টভাবে সাধারণকে তুলে দেখান। মানবিকতার এত বড় অবমাননা তাঁকে নাড়া দেয়। "ওরে ভীরু তোমার উপর নাই ভুবনের ভার"—এটাই ছিল সমাজের প্রতি কবির প্রচ্ছন্ন নির্দেশ।

নায়ক মহেন্দ্র চরিত্রের মধ্যে ঔপন্যাসিক আর একটা দিক দেখিয়েছেন। মানুষের চরিত্র গঠনে কেবলমাত্র আদর যে কতখানি ক্ষতিকর মহেন্দ্রকে দেখলে বোঝা যায়। মাতৃস্নেহ তার ভাল না করে খারাপই করেছে। আত্মনির্ভরতা ও পরিমিতিবোধ তার মধ্যে বেড়ে ওঠেনি। মা তার সুখকে সবার উপরে স্থান দেওয়ায় সে নিজেও তাই দিয়েছে। ফলে যদিও তার মধ্যে অনেক সৎগুণ ছিল, স্বার্থপরতায় তা আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছে। আশার অবারিত দানের মূল্য সে বোঝেনি, বিনোদিনীর ছলনার আকর্ষণ তার কাছে বড় হয়েছে। বিনোদিনীর সংযম, অবজ্ঞা ও বিশ্বাস তার ব্যক্তিত্বকে জাগ্রত করলে পরেই আবার সে মা ও স্ত্রীর কথা ভাবতে পারে। মহেন্দ্রর মত সহানুভূতি সম্পন্ন চরিত্র—যে একদিন কাকিমার প্রতি মার কঠোর ব্যবহারে ব্যথিত হয়ে কাকিমাকে সান্ত্বনা দিতে ছুটেছিল, সে মা ও স্ত্রীর দিকে ফিরেও তাকায় না। নারীর মোহ যে মানুষের মঙ্গলবুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করে কিভাবে নিচের দিকে নামায় তাই দেখিয়েছেন লেখক।

মানুষের মনস্তত্ত্ব এই যে সে যখন চরম অপরাধ করে তখনও তার বিবেকের তাড়নায় নিজেকে বোঝাতে হয় যে এই কাজটির একটা যুক্তি আছে। নিজের অন্যায়কে নিজের কাছে যুক্তি দিয়ে প্রতিষ্ঠিত না করে মানুষ শান্তি পায় না। মহেন্দ্র বিনোদিনী সম্বন্ধে যুক্তি দাঁড় করিয়ে নিজের মনের দ্বন্দ্বের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেতে চেয়েছে। এইখানে সূক্ষ্ম মনস্তত্ত্বের কাজ বড় সুন্দর ফুটে উঠেছে।

Inferiority Complex মানুষের চরিত্রের অনেক সৎগুণ নষ্ট করে।

মহেন্দ্রর চরিত্রের মধ্যে দিয়ে লেখক তাও দেখিয়েছেন। বিহারীর জন্য পাত্রী দেখতে গিয়ে সে নিজে বিয়ে করে। অবচেতন মনে তার এ জন্যে একটা লজ্জা ছিল, বাইরে তা প্রকাশ না করলেও। আর সেই থেকে অন্তরের গভীরে তার অজ্ঞানিতভাবে হীনমন্যতা দানা বাঁধতে থাকে। এর জন্য বিহারীর আচরণ তার কাছে ক্রটিপুর্ণ লাগে। নিজের মনের এই দৈন্যের জন্যই বিহারীকে আশা সম্বন্ধেই দোষী করে। বিহারী তার মার প্রতি কর্ত্তব্য করে, স্ত্রীর সামনে তাকে কর্ত্তব্য স্মরণ করায়, পিকনিকে গিয়ে বিহারীই সমস্ত সুব্যবস্থা করে—এই সব তাকে ক্রমশঃ অধীর করে। বিশেষ করে নারীদের চোখে বিহারীর Position তাকে অস্থির করে তোলে। তাই তারও যে একটা কলঙ্কের দিক আছে এটা দেখাতে তার মন ব্যাকুল হয়। এটাও মানব মনের চরম দুর্বলতা।

রাজলক্ষ্মীদেবীর মধ্যেও মনস্তত্ত্বের জটিল কাজ দেখা যায়। তবে তা সাধারণ বাঙালি গৃহিণী সুলভ। ছোট জার কাছে তিনি নিন্দার ছলে ছেলের প্রশংসা করতে চেয়েছিলেন। আমার ছেলে কত বড় মাতৃভক্ত যে যৌবনে বিয়ে করতেও চায়না এটাই ছিল তাঁর প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত। আমাদের দেশের অধিকাংশ মা ছেলেকে এই রকম দুগ্ধপোষ্য দেখতে ভালবাসেন। নিজের অধিকার থেকে ছেলে চলে যাবে ভাবতে ভাল লাগে না বলে এরকম মনের কাছে লুকোচুরি করে তাঁরা নিজেও আনন্দ পান। ছোট জার সম্বন্ধে কটু কথার মধ্যে যে মনটি কাজ করেছে তাও একেবারে আমাদের রোজকার চেনা ঘটনা। মহেন্দ্রর বিয়ের ব্যাপারে তাঁর আপত্তি, পরে ছেলের সঙ্গে না পেরে বিয়ে দিয়ে প্রতিবাদে ছোট জার উপর রাগ—এসবই যেন মুখস্ত পড়ার মত জানা ঘটনা। জায়ে জায়ে ভুল বোঝাবুঝি, ছেলে পর করে নেবার ভয়, পুত্রবধূর প্রতিবিরাগ সবই নিখুঁতভাবে লেখক তুলে ধরেছেন।

মার ভালবাসা যদি খুব তীব্র অধিকারবোধ সম্পন্ন হয় তবে পুত্রবধূর প্রতি আক্রোশ হয়। যে পুত্র মা ভিন্ন কাউকে জানতো না সে যে বিয়ের পর থেকে সব কিছু বধূকে বলে এটা মার সহ্য হয় না। মা তাঁর বধূকালের কথা ভুলে যান, ফলে অশান্তি হয়। রাজলক্ষ্মীদেবী ও মহেন্দ্র আশার মিলিত সংসারে অশান্তির আরও কারণ, মাতা পুত্র দুজনের চরিত্রের মধ্যেই সামঞ্জস্যবোধের অভাব ছিল।

আশা চরিত্রের শান্ত মধুর মূর্তি লেখকের সহানুভূতির আলোয় ঝলমল করছে। তার চরিত্রের দোষ ক্রটি তো বটেই এমন কি গুণও তার জীবনের দুর্ঘটনার জন্য কাজ করেছে দেখা যাচ্ছে। পরম বিশ্বাসে সে মাসির

কাছে মহেন্দ্রর সম্বন্ধে বলে "তাঁকে তো জানই মাসি, নিতান্ত ঘরের লোক ছাড়া আর কাউকে তাঁর পছন্দই হয় না। আমার বালিকে সকলেই ভালবাসে, কিন্তু তাঁর সঙ্গে তার আজ পর্যন্ত ভাল বনে নাই।" (চোখের বালি—২৮৭ পৃঃ জন্ম শতবার্ষিক রবীন্দ্র রচনাবলী ৮ম খণ্ড) —এইখানে dramatic irony হয়েছে। ভাগ্যের নির্মম পরিহাস এই যে, যে সময় সে তার মাসির কাছে এই কথা বলে সেই সময়ই তার চোখের আড়ালে তার স্বামী অবিশ্বাসীর কাজ করে। কোন রকম সন্দেহ না থাকা ও বিশ্বাস করাটা যেন সময় বুঝে তার দুর্গতির কারণ হয়েছে। উপন্যাসের বিষয়টিকে আরও জোরালো করেছে এই উক্তির বৈপরীত্য।

আশা অত্যন্ত শান্তিপ্রিয় মেয়ে ছিল। বিয়ের পর সে তার শাশুড়ীর বাড়ী ছেড়ে চলে যাওয়া চায়নি বরং ব্যথিতই হয়েছিল তবু নতুন পাওয়া স্বামীটির প্রতি এমনি অনুরক্ত হয়েছিল যে তার ত্রুটি দেখতে পায়নি। বিহারী তার স্বামীর দোষ দেখাত বলে তার মন তার প্রতি বিরূপ হয়ে ওঠে। আর এই একান্ত ভালবাসার ভাবটি বড় সুন্দর ফুটেছে।

নারী চরিত্রের চারটি রূপ লেখক আমাদের এই উপন্যাসে দেখিয়েছেন। প্রতিটি নারী তার ব্যক্তিসত্তায় সুপরিস্ফুট। রাজলক্ষ্মী দেবীর মধ্যে ধনী গৃহিণী সুলভ অধিকার প্রবণতা, অন্নপূর্ণাদেবীর মধ্যে শান্ত অনুগত বুদ্ধিমতী বিধবা নারী প্রকৃতি, আশার মধ্যে অপটু সংসার অনভিজ্ঞা সরলার কল্যাণীরূপ ও বিনোদিনীর মধ্যে আত্মসচেতন, প্রখর বুদ্ধিমতী ব্যর্থ নারী সত্তার ভীষণ মূর্ত্তি, অতি চমৎকারভাবে ফুটে উঠেছে।

পরবর্ত্তীকালে রবীন্দ্রনাথ তাঁর সাহিত্যে নানাস্থানে দুই নারী তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত করেন। মনে হয় অস্ফুটভাবে এই চিন্তা এই উপন্যাসের বিনোদিনী ও আশার চরিত্র সৃষ্টির সময়ও কাজ করেছে।

বলাকায় রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

"কোন ক্ষণে
সৃজনের সমুদ্র মন্থনে
উঠেছিল দুই নারী
অতলের শয্যাতল ছাড়ি।
এক জনা উর্ব্বশী, সুন্দরী,

বিশ্বের কামনা—রাজ্যে রাণী,
স্বর্গের অপ্সরী।
অন্যজনা লক্ষ্মী সে কল্যাণী
বিশ্বের জননী তারে জানি,
স্বর্গের ঈশ্বরী।"

(৫০০ পৃঃ, জন্মশতবার্ষিক রবীন্দ্র রচনাবলী)

'দুইবোন', উপন্যাসে বলেছেন -"মেয়েরা দুই জাতের, কোনো কোন পণ্ডিতের কাছে এমন কথা শুনেছি। এক জাত প্রধানতঃ মা, আর একজাত প্রিয়া। ঋতুর সঙ্গে তুলনা করা যায় যদি, মা হলেন বর্ষাঋতু। জলদান করেন, ফলদান করেন, নিবারণ করেন তাপ, উর্দ্ধলোক থেকে আপনাকে দেন বিগলিত করে, দূর করেন শুষ্কতা, ভরিয়ে দেন অভাব।

আর প্রিয়া বসন্ত ঋতু। গভীর তার রহস্য, মধুর তার মায়ামন্ত্র, তার চাঞ্চল্য রক্তে তোলে তরঙ্গ, পৌছয় চিত্তের সেই মণিকোঠায়, যেখানে সোনার বীণায় একটি নিভৃত তার রয়েছে নীরবে, ঝংকারের অপেক্ষায়, যে-ঝংকারে বেজে বেজে ওঠে সর্ব দেহে মনে অনির্বচনীয়ের বাণী।" (দুই বোন—৭৯১ পৃঃ, জন্ম-শতবার্ষিক রবীন্দ্র রচনাবলী—৯ম সংখ্যা)।

'চতুরঙ্গ' উপন্যাসের ননীবালা ও দামিনী, 'যোগাযোগ' উপন্যাসের কুমুদিনী ও শ্যামা, 'দুইবোন' উপন্যাসের শর্মিলা ও উর্মিলা চরিত্রের মাধ্যমে তাঁর এই দুই নারী তত্ত্ব সুপরিস্ফুট। 'চোখের বালি' উপন্যাসের সময় এই চিন্তা ঠিক পরিস্ফুট হয়ে ওঠেনি কিন্তু তার আভাস পাওয়া যাচ্ছে, আশা ও বিনোদিনী চরিত্রের মধ্যে।

মহেন্দ্র চরিত্রের দুর্বলতা, আকাঙ্ক্ষা ইত্যাদি তার জীবনের গতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেছে। কিন্তু এই উপন্যাসের বিহারী চরিত্রটি যেন একটু বেশী আদর্শ ঘেঁসা। এরকম রক্তমাংসের মানুষ বোধহয় হয় না। মহেন্দ্র তার জন্য ঠিক করা পাত্রীকে বিয়ে করার পরও সে সহজ ভাবে মিলতে পারে, বিনোদিনী তার কাছে সব খুলে বলা মাত্র দুবারই সব বিশ্বাস করে। অথচ তার পুরুষ সুলভ কোন দুর্বলতা নেই, শতপ্রলোভনেও স্থির থাকে, এসব খুব উঁচুদরের সৎগুণ হলেও একজন মানুষের পক্ষে ঠিক যেন স্বাভাবিক নয়। সমগ্র উপন্যাসের মধ্যে এই চরিত্রটিই যেন স্বাভাবিকত্ব একটু হারিয়ে ফেলেছে। বিনোদিনী চরিত্র সম্বন্ধে অধিকাংশ লোকের ক্ষোভ থাকলেও আমাদের মনে

হয়েছে যত জোরে সে বিদ্রোহী হয়ে উঠেছিল, মানুষের ভালবাসা পেয়ে ঠিক ততখানি জোরেই সে আত্মদমন করে নিজের মর্যাদা রক্ষা করতে চেয়েছে। আর সেইটাই তার মত শক্তিশালী চরিত্রের পক্ষে স্বাভাবিক হয়েছে।

এই উপন্যাসের কাহিনী বেশ সাবলীল গতিতে এগিয়েছে। উপন্যাসের কোনখানে বর্ণনা বাহুল্য বা সংলাপের দীর্ঘতা নেই। একটিমাত্র কাহিনীকে অবলম্বন করে উপন্যাসটি গড়ে উঠেছে—কোন উপকাহিনী নেই। দুটি চরিত্রের অল্প কিছুদিনের ঘটনা, তাদের মানসিক অবস্থা, অন্তর্দ্বন্দ্ব ও পরিবেশের পরিচয় নিয়ে এই উপন্যাস।

রবীন্দ্রনাথের গদ্যভাষা কাব্যের মতই সুললিত। এই উপন্যাসেও তার পরিচয় আমরা পেয়েছি। "একদিন নববর্ষার বর্ষণ মুখরিত মেঘাচ্ছন্ন সায়াহ্নে গায়ে একখানি সুবাসিত ফুরফুরে চাদর এবং গলায় একগাছি জুঁইফুলের গোড়ে মালা পরিয়া মহেন্দ্র আনন্দমনে শয়ন গৃহে প্রবেশ করিল। হঠাৎ আশাকে বিস্ময়ে চকিত করিবে বলিয়া জুতার শব্দ করিল না। ঘরে উঁকি দিয়া দেখিল, পূবদিকের খোলা জানালা দিয়া প্রবল বাতাস বৃষ্টির ছাঁট লইয়া ঘরের মধ্যেপ্রবেশ করিতেছে, বাতাসে দীপ নিবিয়া গেছে এবং আশা নিচের বিছানার উপরে পড়িয়া অব্যক্তকণ্ঠে কাঁদিতেছে।"(চোখের বালি—২২৬পৃঃ, জন্মশতবার্ষিক রচনা-বলী·৮ম খণ্ড) এরকম সুন্দর বর্ণনা উপন্যাসের বহুস্থানেই আছে। বর্ণনা নৈপুণ্যে ও ভাষার ছন্দ মাধুর্যে দৃশ্যটি যেন চোখের সামনে জেগে ওঠে। পরবর্ত্তী কালে কবি কথ্য ভাষায় গদ্য রচনা করেন। 'গোরা' উপন্যাসে আমরা লেখকের কথা সাধুভাষায় ও সংলাপ কথ্য ভাষায় পাই। 'চোখের বালি'তে পুরোপুরি সাধুভাষা ব্যবহার করেছেন, যেন বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষার প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ মুক্তি পাননি।

রবীন্দ্রনাথের মধ্যে রোমান্টিকের মগ্নতা ও তত্ত্ব তথ্যের গাম্ভীর্য্য যেমন ছিল, তেমনি ছিল মধুর পরিহাস প্রবণতা ও ব্যঙ্গ চাতুর্য। 'চোখের বালি' উপন্যাস স্বভাবতঃই Serious কিন্তু এই গম্ভীর উপন্যাসের মধ্যেও তাঁর পরিহাস প্রবণতা মাঝে মাঝে ফুটে উঠেছে।

প্রথম পরিচ্ছেদে—"মহেন্দ্র হাসিয়া কহিল—ভাগ্যে বিবাহ করি নাই, স্ত্রী বিধবা হইলে তো একদণ্ড টিকিতে পারিতাম না।"—আমাদের হাসায়। পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদ থেকে জটিল ঘটনার মধ্যে নিয়ে যাবার আগে লেখক যেন আমাদের মনে একটু স্ফূর্তির ভাব আনেন।

আশাকে বিয়ে করার পর থেকে মহেন্দ্রর সংসারে অশান্তি ক্রমশঃ বাড়তে

থাকে তাই লেখক আমাদের মনের চাপ যাতে বেশী না হয় লক্ষ্য রেখে মহেন্দ্র ও আশার পড়ার চিত্রটি তুলে ধরেছেন। "এমন গম্ভীরপ্রকৃতি শ্রদ্ধেয় মূঢ় থাকিতেও পারেন যিনি মনে করিবেন, মহেন্দ্র নিদ্রাবেশে পড়াইবার সময় নষ্ট করিয়াছে, বিশেষরূপে তাঁহাদের অবগতির জন্য বলা আবশ্যক যে মহেন্দ্রর তত্ত্বাবধানে অধ্যাপনকার্য যেরূপ নির্বাহ হয়, কোন স্কুলের ইনস্‌পেক্টর তাহার অনুমোদন করিবেন না।" ব্যঙ্গ চাতুর্য ধরা পড়ে—"জীবনের কবিত্ব—অধ্যায়ে মা খুড়ী যে এমন বিঘ্ন, তাহা মহেন্দ্র জানিত না।" এরকম ছোট ছোট বহু উক্তির মধ্যে কবির পরিহাসপ্রিয়তা মনন-শীলতা ও ব্যঙ্গ চাতুর্য ধরা পড়েছে। তাঁর ভাষার গুণে ও বর্ণনার গুণে 'চোখের বালি'র সমস্যাসঙ্কুল জটিল মনস্তত্ত্ব রমণীয় হয়ে উঠেছে।

সমগ্র উপন্যাসটি বিশ্লেষণ করে এই কথা বলা যায় যে রবীন্দ্রসাহিত্যে 'চোখের বালি' ব্যতিক্রম নয়। এর সঙ্গে লেখকের মানবিকতা ও ক্ষমাসুন্দর সহানুভূতি আছে, বিনোদিনীর মত বঞ্চিতার আর্তনাদ তাঁকে ব্যাকুল করে। এরকম মেয়েকে সমাজ বঞ্চিত করে আবার লাঞ্ছিতও করে। তাই কবি তার বেদনার মূল কোথায় দেখিয়েছেন।

প্রেম চিরদিনই কবির চোখে কল্যাণময় শুভরূপ নিয়ে ধরা দিয়েছে। তাই বিনোদিনীর প্রেমের ঐ বিকার ও বিভীষিকাময় রূপ প্রথমে দেখালেও তাকে সেইভাবে প্রতিষ্ঠিত করেননি। তার মনে যেন একটা অনুতাপের বেদনা এনে তাকে আবার কল্যাণময়ী করেছেন। 'কুমারসম্ভব ও শকুন্তলা' (প্রাচীন সাহিত্য) প্রবন্ধে তিনি বলেছেন যে কালিদাসকে একই কালে সৌন্দর্যভোগের ও ভোগারতির কবি বলা যায়। যেমন নাকি মহাভারতকে একইকালে কর্ম এবং বৈরাগ্যের কাব্য বলা যায়। নিজেও তিনি এই উপন্যাসখানিতে এই ভোগাকাঙ্ক্ষা ও ত্যাগের চিত্র তুলে ধরেছেন।

অনেক সমালোচক রবীন্দ্রনাথকে escapist বলেছেন। রোমান্টিক কবি বাস্তবের কঠোর বর্তমানে না থেকে অতীত ও ভবিষ্যতের স্বপ্নে মগ্ন থাকেন। রবীন্দ্রনাথও থেকেছেন। কিন্তু তাঁর বৈশিষ্ট্য এইখানেই যে তিনি বর্তমানকে একেবারে ভুলে যান নি। তাঁর তত্ত্ব ও তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধমালা সে সাক্ষ্য বহন করে। আর বহন করে তাঁর ২য় পর্বের উপন্যাসগুলি। এখানে রোমান্টিক কবি অন্তরালে সরে গিয়েছেন, পরিস্ফুট হয়েছেন যুক্তিনিষ্ঠ বলিষ্ঠ ঔপন্যাসিক। বিনোদিনীর অবৈধ প্রেমকে তিনি প্রতিষ্ঠিত না করে অনির্বচনীয় প্রেমে নিয়ে

গিয়েছেন romantic বলেই—একথা বেশীর ভাগ লোকেরই মত। কিন্তু কেবল এদেশে নয় বিদেশেও, ক্ষণিক মোহের ছবি দেখালেও স্থায়ী মূল্য দেখান হয়েছে দাম্পত্য প্রেমের। সেক্সপীয়ারে নানারকমের প্রেম থাকলেও স্থায়ী নির্ভরতা দাম্পত্য প্রেমেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। অতএব এটা যে কবির কল্পনার রং পেয়ে অন্যরকম হয়েছে তা নয়। তাঁর নিজের মতকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন ঠিকই। কিন্তু তাব পিছনে যুক্তি আছে। মত ও চরিত্র বেখাপ হয়নি। সবথেকে বড় কথা—তৎকালের মানব জীবনের সমস্যা এর প্রধান উপজীব্য হলেও এটি চিরকালের মানব জীবনের ব্যথা বেদনার কথা বলেছে। তাই শিল্প হিসাবে এর মূল্য অনস্বীকার্য।

'চোখের বালি' উপন্যাসের দুটি চরিত্র এর সমস্ত কাহিনীকে নিয়ন্ত্রিত করেছে। এর আঙ্গিকগত কোন ত্রুটি নেই। বক্তব্য ও শিল্পকে ঠিকমত বুঝতে হলে প্রতিটি চরিত্রের বিশ্লেষণ দরকার কারণ উপন্যাসের একটনা বড় কাজ চরিত্রের পরিস্ফুটন। বিশেষভাবে আলোচনা করলে দেখা যায় যে তাদের অন্তরের দ্বন্দ্ব সংঘাত কাহিনীর সঙ্গে ওতোপ্রতোভাবে জড়িত।

—খ—

—নৌকাডুবি—

"চোখের বালি' উপন্যাসের আড়াই বৎসর পব রবীন্দ্রনাথের এই পর্য্যায়ের দ্বিতীয় উপন্যাস 'নৌকাডুবি' 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত হয় (১৩১০ বৈশাখ —১৩১২ আষাঢ)। 'চোখের বালি' ও 'গোরা'র মধ্যবর্ত্তী সময়ে 'নৌকাডুবি' রচিত হয়, তাই এই উপন্যাসে 'চোখের বালির' কিছু প্রভাব পড়েছে, 'গোরা'র আভাসও যেন পাওয়া যায়। 'নৌকাডুবি'র সমালোচনায় সমালোচকরা মুখর হয়ে উঠলেও এর ঐতিহাসিক মূল্য অস্বীকার করবার উপায় নেই।

রবীন্দ্রনাথের এই দ্বিতীয় পর্য্যায়ের উপন্যাসগুলি প্রধানতঃ নরনারীর প্রেম ভাবনার উপরে প্রতিষ্ঠিত। 'চোখেব বালি'তে প্রেমের একরূপ দেখিয়েছেন আবার 'নৌকাডুবি'তে প্রেমের আর এক রূপ। 'চোখের বালি'র মধ্যে অবৈধ প্রেম নায়কের বিবেকবুদ্ধিকে একেবারে আচ্ছন্ন করে ফেলে। 'নৌকাডুবি'র নায়কেব দৃঢ়তা ও বিবেকবুদ্ধি আমাদের বিস্মিত করে। যে ঘটনার জন্য সে দায়ী নয় তারই ভার বহন কবে তাকে ত্যাগ স্বীকার করতে হয়। মানুষ বলেই তাকে প্রতি মুহূর্তে যুদ্ধ করতে হয়েছে।

এই বইখানি সম্বন্ধে লেখকের বক্তব্য হচ্ছে এই যে এটি প্রকাশকের তাগদায় রচিত। নিজের মনে তিনি এটি সৃষ্টির তাগিদ অনুভব করেননি। 'চোখের বালি'র ভূমিকায় বলেছিলেন—আধুনিক উপন্যাস সৃষ্টি হচ্ছে 'আঁতের কথা টেনে বার করা', অর্থাৎ মনস্তত্বেব আকর্ষণের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। 'নৌকাডুবি'তেও তিনি এই আঁতের কাজটি বেশ নিপুণভাবে করতে পেরেছেন। 'চোখের বালি'তে বঞ্চিতা নারীর হাহাকার। প্রতিহিংসাব চিত্র 'নৌকাডুবি'তে দুই ভিন্ন অবস্থার দুই নারী তাদের শিক্ষা সংস্কৃতির পার্থক্য সত্বেও ধৈর্যে ও মহিমায় স্থির। ধর্মবুদ্ধি ও সংস্কারকে এরা মান দিয়েছে, আত্মসুখ ও আকাঙ্খা মুহূর্তের জন্যও বিচলিত করেনি। ভারতীয় নারীর সনাতন আদর্শ ও আত্মত্যাগের মহিমাকে প্রতিষ্ঠিত করবার আকাঙ্ক্ষা লেখকের অবচেতন মনে কাজ করেছে বলে মনে হয়।

সমাজের ত্রুটি ও অব্যবস্থার প্রতি লক্ষ্য রেখে 'চোখের বালি' রচিত হলেও ঠিক সমাজের সঙ্গে যেন যোগ নেই, অর্থাৎ সামাজিক পরিবেশ ঠিকমত ধরা পড়েনি। এটির বিষময় ফলটি লেখক তুলে ধরেছেন। 'নৌকাডুবিতে'

মহেন্দ্রকে কেন্দ্র করে তার পারিবারিক ঘটনার মধ্যদিয়ে সামাজিক ত্রুটির বিষময় ফলটি লেখক তুলে ধরেছেন। 'নৌকাডুবি'তে তখনকার কালের সমাজব্যবস্থা ও পরিবেশ বেশ ধরা পড়েছে। অন্নদাবাবু, রমেশ ও রমেশের বাবা সকলেই ভিন্ন আদর্শ নিয়ে চলতেন। তৎকালীন সমাজব্যবস্থা, কলকাতার শিক্ষিত হিন্দু যুবার মনোভাব ও আচরন, গ্রাম বাংলার সমাজবব্যস্থা খুব বিস্তারিত ভাবে আলোচিত না হলেও আমাদের বুঝবার মত করে এঁকেছেন। আনাত্মীয় পুরুষ ও নারীর মেলামেশা হিন্দু পরিবারে প্রচলিত ছিল না। রমেশ পড়তে এসে তার ব্রাহ্ম বন্ধু যোগেন্দ্রর সঙ্গে তার বাড়ীর অন্দরেও যাবার সুযোগ পায়। নিজেদের সমাজে শিক্ষিতা মেয়ের সঙ্গে মেশার সুযোগ ছিল না, তাই রমেশ স্বভাবতঃই হেমনলিনীর প্রতি আকৃষ্ট হয়। গ্রামের নিষ্ঠাবান হিন্দু পিতার নির্দেশ অমান্য করে ব্রাহ্ম মেয়েকে গ্রহণ কববার মত জোর আজকের সমাজে বিরল নয়, কিন্তু সেই তখনকার সমাজে সেটা প্রায় অসম্ভব ছিল।

আকস্মিক ঘটনা মানুষের জীবনকে কতখানি নিয়ন্ত্রিত করে 'নৌকাডুবি' পড়লে বোঝা যায়। মানুষ তার সংস্কার, ধর্মবোধ ও বিবেকের কাছে বাঁধা পড়ে আছে, তাকে অস্বীকার করা প্রায় অসম্ভব। রমেশের অন্তর্দ্বন্দ্বের মধ্যে দিয়ে লেখক খুব ভালভাবে তা বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন। রমেশ হিন্দুর ছেলে হয়েও ব্রাহ্ম হেমনলিনীকে বিয়ে করবে বলে স্থির করেছিল কিন্তু কমলাকে নিজের স্ত্রী হিসাবে যখন নদীতীরে পায় তখন গ্রহণ করে, বিরূপতা কেটে যায়। আবার যখন সে জানতে পারে যে কমলা তার স্ত্রী নয় তখন থেকে তাকে কমলার সঙ্গে দূরত্ব রক্ষা করে চলতে দেখা যায়। সকলের সামনে স্পর্দ্ধা দেখিয়ে সামাজিক নিয়মকে অস্বীকার করে প্রেমকে স্বীকার করে নেবার মধ্যে পৌরুষ আছে। তাতে একদল প্রাচীনপন্থীর কাছে নিন্দাবাদ শুনতে হলেও নিজের ধর্মবোধের কাছে কোন জবাবদিহি করতে হয়না। কিন্তু যে অসহায় মেয়েটি আত্মীয় বন্ধু হারিয়ে একান্তভাবে তারই আশ্রয়ে এসে পড়েছে তাকে অন্যের স্ত্রী জেনেও গ্রহণ করার মধ্যে যে হীনতা তা রমেশ স্বীকার করতে পারেনি।

নব্য হিন্দুত্বের আদর্শ লেখকের কলমকে অনেকখানি নিয়ন্ত্রিত করেছে। ভারতীয় নারী যে নিজের মনকে সর্বদা ধর্মবোধ দিয়ে বেঁধে রাখেন এই ভাবটা লেখকের মনে দৃঢ়ভাবেই ছিল। তবে এতে গল্পরস ক্ষুণ্ণ হয়নি। রমেশের

প্রতি কমলার মনে বেদনাবোধ জাগিয়ে আবার তারপর বিরূপভাব এনে নিপুণভাবে লেখক তাকে পরবর্তী ঘটনার জন্য প্রস্তুত করেন।

'নৌকাডুবি' উপন্যাসের নারীচরিত্রগুলিকে কবি অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে শ্রদ্ধা ও সমাদর দিয়ে এঁকেছেন। হেমনলিনী, কমলা, শৈলজা, ক্ষেমঙ্করী প্রতিটি চরিত্র শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে। খুড়োর স্ত্রী হরিভাবিনীর চরিত্রে সাধারণ নারী সুলভ কিছুটা দুর্বলতা দেখিয়ে উপন্যাসের গল্পরসকে আরও সমৃদ্ধি দান করেছেন। কমলার আশ্রয়দাত্রী নবীনকালীও তার স্বভাবে নীচতা ও স্বার্থপরতা সত্ত্বেও হাসাতে পেরেছে, লেখকের উপস্থাপনার গুণে। এরকম সমস্যামূলক উপন্যাসে এই দুটি চরিত্র আমাদের খানিকটা অন্যমনা করেছে—রিলিফ্ দিয়েছে।

'নৌকাডুবি'র পুরুষ চরিত্রগুলি নিপুণ হস্তে রচিত। নায়ক রমেশের অন্তর্দ্বন্দ্ব, তার পিতার গোঁড়া ক্ষমতাবানভাব, অন্নদাবাবুর কন্যাস্নেহাতুর হৃদয়ের কথা, অক্ষয়ের অনুসন্ধানী পরশ্রীকাতরভাব, যোগেন্দ্রর অসহিষ্ণুতা ও খুড়োর রহস্যমধুরচ রিত্র সবই এখানে সমান সমাদরে চিত্রিত। খুব অল্প একটু এলেও খুড়োর জামাই বিপিন ও বালক ভৃত্য উমেশও জীবন্ত। একমাত্র নলীনাক্ষ চরিত্র আদর্শবাদের দ্বারা খানিকটা আচ্ছন্ন।

'চোখের বালি'র মত 'নৌকাডুবি' উপন্যাসও আকস্মিকভাবে আরম্ভ হয়েছে। আগে কোন ভূমিকা নেই। নায়ক রমেশের কথা দিয়ে প্রথম আরম্ভ। প্রথম থেকেই গল্পের আকর্ষণ সৃষ্টি হয়েছে। 'নৌকাডুবি'র শেষের দিকটায় যেন কিছুটা গল্পরস ক্ষুণ্ণ হয়েছে। সকলের কাশী যাওয়া আর সব কেমন সহজে মিল হয়ে যাওয়ায় একটু খট্‌কা লাগে। তবে সমালোচকরা ত্রুটি ধরলেও সাধারণ মানুষের মন জয় করবার ক্ষমতা এর আছে। বোধ হয় রবীন্দ্রনাথের সমস্ত উপন্যাসের মধ্যে এদিক দিয়ে 'নৌকাডুবি'র স্থান সবার উপরে।

'চোখের বালি'র মত 'নৌকাডুবি'রও কাহিনী বিন্যাসের রীতি হচ্ছে সর্বাধিক প্রচলিত বিবৃতিমূলক রীতি। এতে লেখককে ভাষ্যকারের ভূমিকা নিতে হয়। এই উপন্যাসের চরিত্রগুলির ক্রমবিকাশ, পরিণতি ও বিশ্লেষণে যেমন ত্রুটি নেই, তেমনি অনেকগুলি আকস্মিক ঘটনা কাহিনীতে স্থান পেলেও লেখকের সুষ্ঠু নিয়ন্ত্রণে অসামঞ্জস্য হয়নি। 'চোখের বালি'র মত 'নৌকাডুবি'ও সম্পূর্ণভাবে সাধুভাষায় রচিত।

রবীন্দ্রনাথ কবি তাই তাঁর সৃষ্টিতে কাব্যগুণ থাকেই। প্রবন্ধের ভাষাও কবির হাতে কখনও নিরস কঠিন রূপ পায়নি। তারও রসমাধুর্য লক্ষ্য করার মত। উপন্যাসের সর্বত্র, বিশেষ করে যে কোন বর্ণনার স্থানে, কবির ভাষা যেন গদ্য কাব্যের মত মধুর হয়েছে। ঝড়ের পর প্রকৃতির স্তব্ধ শান্তরূপ বর্ণনা করে কবি লিখেছেন—"কুহেলিকা কাটিয়া গেছে। বহুদূরব্যাপী মরুময় বালু-ভূমিকে নির্মল জ্যোৎস্না বিধবার শুভ্রবসনের মতো আচ্ছন্ন করিয়াছে। নদীতে নৌকা ছিল না, ঢেউ ছিলনা, রোগযন্ত্রনার পরে মৃত্যু যেরূপ নির্বিকার শান্তি বিকীর্ণ করিয়া দেয়, সেইরূপ শান্তি জলে স্থলে সর্বত্র বিরাজ করিতেছে।" (নৌকাডুবি-৫০২ পৃঃ, জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ, ৮মখণ্ড)। ষ্টীমারে যাবার সময়কার আর একটি বর্ণনার উল্লেখ না করে থাকা যায় না।—"তীরের বনরাজি অবিচ্ছিন্ন মসীলেখায় সন্ধ্যাবধূর সোনার অঞ্চলে কালোপাড় টানিয়া দিল। গ্রামান্তরে বিলের মধ্যে সমস্ত দিন চরিয়া বন্যহংসের দল আকাশের ম্লানায়মান সূর্যাস্তদীপ্তির মধ্য দিয়া ওপারের তরুশূন্য বালুচরে নিভৃত জলাশয়গুলিতে রাত্রিযাপনের জন্য চলিয়াছে। কাকেদের বাসায় আসিবার কলরব থামিয়া গেছে। নদীতে তখন নৌকা ছিল না; একটি মাত্র বড়ো গাঢ় সোনালি-সবুজ নিস্তরঙ্গ জলের উপর দিয়া আপন কালিমা বাহিয়া নিঃশব্দে গুণ টানিয়া চলিয়াছিল।" (নৌকাডুবি—৫৫৭ পৃঃ, জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ—৮ম খণ্ড) আর এক জায়গায় আছে—"জ্যোৎস্না তখন জলে স্থলে ফুটিয়া উঠিয়াছে। তীরে গ্রাম নাই, ধানের খেতের ঘন-কোমল সুবিস্তীর্ণ সবুজ জনশূন্যতার উপরে নিঃশব্দ শুভরাত্রি বিরহিনীর মতো জাগিয়া রহিয়াছে।" (নৌকাডুবি-৫৬৯ পৃঃ, জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ-৮ম খণ্ড)।

রবীন্দ্রনাথের কাব্যময় ভাষা সম্বন্ধে বলবার কিছু নেই। তবু গদ্যের মধ্যে এরকম ভাষার দেখা পেলে উদ্ধৃতির লোভ সামলানো যায় না। ভাষার সংযত মাধুর্য ও নৈপুণ্য প্রেমের চিত্র আঁকবার সময় আরও লক্ষ্য করবার মত। সামান্য ইঙ্গিতের ব্যঞ্জনায় তার গভীরতা বেড়ে গিয়েছে। "আজ আহারান্তে হেমনলিনী যখন রমেশের সহিত মিলন প্রত্যাশায় উৎসুক-চিত্তে সাজ করিতেছিল, তখন সেঅনেক হাসিগল্প, অনেক নিভৃত পরামর্শ, অনেক ছোটখাট সুখের ছবি কল্পনায় সৃজন করিয়া লইতেছিল। কিন্তু এই যে অল্প কয় মুহূর্তে দুই হৃদয়ের মধ্যে বিশ্বাসের মালা বদল হইয়া গেল—এই যে চোখের জল ঝরিয়া পড়িল, কথাবার্তা কিছুই হইল না, কিছুক্ষণের জন্যে

দুইজনে পাশাপাশি দাঁড়াইয়া রহিল—ইহার নিবিড় আনন্দ, ইহার গভীর শান্তি, ইহার পরম আশ্বাস সে কল্পনাও করিতে পারে নাই।" (নৌকাডুবি -৫২৭ পৃ:)। হেমনলিনীর মত আমাদেরও মনে হয় এরকম সহজভাবে ছাড়া প্রেমের গভীরতা বোঝান বোধহয় সম্ভব ছিল না।

কমলা নলিনাক্ষর পদপ্রান্তে নিজেকে রেখে বলে—'আমি কমলা' (৫৯৭ পৃ:)। এছাড়া অন্য কোন রকমে আত্মনিবেদন তার পক্ষে সম্ভব ছিল বলে মনে হয় না।

রবীন্দ্রনাথের পরিহাস প্রবণতা 'নৌকাডুবি' উপন্যাসেও লক্ষ্য করা যায় সুরসিক লেখক অনেক জায়গায় সুন্দর হাস্য পরিহাস সৃষ্টি করেছেন। রমেশের হারমনিয়াম শিক্ষার চিত্রটি মধুর পরিহাস প্রবণতার চিত্র হিসাবে পাঠকের চিত্তে উজ্জ্বল হয়ে থাকে। চক্রবর্ত্তী খুড়োর হাস্য পরিহাস, তাঁর স্ত্রীর বড়লোকী গল্প, নবীনকালীর বড়মানুষা গল্প ও নানা সংকীর্ণতা—এই সমস্যামূলক উপন্যাসকে মাধুর্য দিয়েছে।

'চোখের বালি' উপন্যাস সম্পূর্ণভাবে একটি কাহিনীকে কেন্দ্র করে এগিয়েছে, এতে কোন উপকাহিনী নেই। কিন্তু 'নৌকাডুবি'তে একটি ছোট্ট উপকাহিনী আছে। চক্রবর্ত্তী খুড়োর বাড়ীর ঘটনা এই উপন্যাসের পাশে খুব অল্প একটু স্থান পেলেও মূল্যবান। কমলার অন্তর্দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করতে বিপিন শৈলজার অল্প সময়ের উপস্থিতিই অনেকখানি গুরুত্ব দিয়েছে। মূল কাহিনীর সঙ্গে এর প্রয়োজনীয়তা জড়িয়ে আছে। শৈলজার দাম্পত্য জীবনের আকর্ষণ কাছে থেকে না দেখলে কমলা রমেশের ত্রুটি অত অল্প বয়সে অত দ্রুত বুঝতে পারতো না। কোথায় একটা ফাঁক সেও অনুভব করেছে কিন্তু স্পষ্টতা এনে দিয়েছে এদের দ্বৈতজীবনের আকর্ষণের চিত্র। এই উপকাহিনার উপস্থাপনা অত্যন্ত নৈপুণ্যের দাবী রাখে। কমলার চরিত্র ও কাহিনী এই উপকাহিনীর দ্বারা অনেকখানি নিয়ন্ত্রিত।

'নৌকাডুবি' উপন্যাসের কয়েকটি ত্রুটি একটু লক্ষ্য করলেই নজরে পড়ে। ২০ পরিচ্ছেদে লিখেছেন—"অন্নদাবাবু পাশের ঘরে গিয়া বসিলেন। এই কন্যাটি ছয় মাসের শিশু অবস্থায় রাখিয়া ইহার মা মারা যায়, সেই হেমের মার কথা তিনি ভাবিতে লাগিলেন। সেই সেবা, সেই ধৈর্য সেই চিরপ্রসন্নতা মনে পড়িল। সেই গৃহলক্ষ্মীরই প্রতিমার মতো যে মেয়ে এতদিন ধরিয়া তাঁহার কোলের উপর বাড়িয়া উঠিয়াছে তাহার অনিষ্ট আশঙ্কায় তাঁহার হৃদয়

ব্যাকুল হইয়া উঠিল। (নৌকাডুবি, ৫৪৫ পৃঃ, জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ-৮ম খণ্ড)। আবার ৩৮ নং পরিচ্ছেদে আছে—"হেমনলিনী জিজ্ঞাসা করিল," "আচ্ছা বাবা, মা যখন মারা যান তখন আমি কত বড় ছিলাম?"

অন্নদা। তুই তখন তিন বছরের মেয়ে ছিলি, তখন তোর কথা ফুটিয়াছে। আমার বেশ মনে আছে, তুই আমাকে জিজ্ঞাসা করিলি, 'মা কোথা?' আমি বলিলাম, 'মা তাঁর বাবার কাছে গেছেন।' তোর জন্মাবার পূর্বেই তোর মার বাবার মৃত্যু হইয়াছিল, তুই তাঁকে জনিতিস্ না।" (নৌকাডুবি-৬০২ পৃঃ, জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ-৮ম খণ্ড)

আধুনিক অনেক লেখকের লেখায় এরকম ত্রুটি চোখে পড়ে। আমরা হয়তো তাকে বিশেষ প্রাধান্য দিই না। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মত লেখকের পক্ষে এরকম ত্রুটি উল্লেখ না করে পারা গেল না। এরকম আর একটি ত্রুটির কথাও লেখা চলে তবে সেটা গুরুত্বপূর্ণ নয় কারণ বয়স্ক লোকদের বলবার সময়ও এধরণের ভুল হয়।

চক্রবর্তী খুড়ো যখন তাঁর স্ত্রী হরিভাবিনী দেবীকে জিজ্ঞেস করলেন, 'চক্রবর্তী কহিলেন "আগে তো পরিচয় হউক তারপরে ঘরের কথা পরে হইবে। আমাদের শৈল কোথায়?' হরিভাবিনী। সে তাহার ছেলেকে স্নান করাইতেছে।"—আমরা জানি ত্রৈলোক্য চক্রবর্তীর ছোট কন্যা শৈলজার উমা নামে একটি মাত্র কন্যা ছিল।

এরকম দুই একটি ত্রুটি থাকলেও 'নৌকাডুবি' উপন্যাসের গল্পরস যে একটুও ক্ষুণ্ণ হয়নি একথা অবশ্যস্বীকার্য।

কবি এই উপন্যাসটির ক্ষেত্রেও নামকরণ সম্পর্কে বিবেচনা ও রসবোধের পরিচয় দিয়েছেন। উপন্যাসটির কাহিনীর মধ্যে সব থেকে উল্লেখযোগ্য ঘটনা থেকে নামকরণ করা হয়েছে। ঐ ঘটনাটি ঘটার পর থেকে কাহিনী সম্পূর্ণ অন্যরকম হয়ে গেল অর্থাৎ ঐ ঘটনাটি কাহিনাকে নিয়ন্ত্রিত করেছে বলে নামকরণ যথার্থ সার্থক হয়েছে।

সমগ্র 'নৌকাডুবি' উপন্যাসখানি পড়লে একথাই মনে হয়, গল্পটি তো অতি মনোরম কিন্তু বাস্তবে কি এমন সুসঙ্গত মিলন হয়? লেখকের চেয়ে বিধাতা পুরুষের মমত্ববোধ বোধ হয় কম। এমন নিটোল গল্প তাই একটু সংশয় আনে। 'নৌকাডুবি'তেও 'চোখের বালি'র মত একটি সমস্যা আছে ঠিকই তবুও সাধারণের মনে এই দ্বিতীয়টির স্থানই উপরে। 'চোখের বালি'র অবৈধ প্রেম নিয়ে আমাদের রক্ষণশীল সমাজে আন্দোলন ও বিরক্তি দেখা গিয়েছিল 'নৌকাডুবি'র সরস গল্প তাঁদের প্রসন্ন করে।

—গ—

—গোরা—

'গোরা' রবীন্দ্রনাথের দ্বিতীয় পর্বের শেষ উপন্যাস। এই উপন্যাসখানি রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রীয় ভাবনার স্থায়ী নিদর্শন হিসাবে অত্যন্ত মূল্যবান। রবীন্দ্রনাথ বরাবরই স্বাজাত্যবোধকে মানবিকতার নিচে স্থান দিয়েছেন। দেশে যখন স্বাদেশিকতার প্রচণ্ড প্লাবন তখনও কবি তাঁর নিজস্ব মতে স্থির। তখনও তাঁর কাছে নরনারীর প্রেমের স্থান সবার উপরে। 'গোরা' যেন স্বাদেশিকতার সঙ্কীর্ণ গণ্ডী থেকে বিশ্বমানবিকতার মহাতীর্থে যায় সুচরিতার প্রেমের মধ্যে দিয়ে।

সমগ্র 'গোরা' উপন্যাসের বিশ্লেষণ করতে গেলে মোটামুটিভাবে কয়েকটি ভাগে ভাগ করে নেওয়া যায়। প্রথমতঃ এই উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথের বিশ্বমানবিকতার পরিপূর্ণ বিস্তার হয়েছে। এতে nationalism সম্বন্ধে তাঁর নিজের মনের সুস্পষ্ট অভিব্যক্তিও পাওয়া যায়। তাই 'গোরা'র সাহিত্যিক মূল্য ছাড়াও ঐতিহাসিক মূল্যও অনস্বীকার্য।

'গোরা'র আর একটি উল্লেখযোগ্য বিশেষত্ব যে উপন্যাস হয়েও এটি মন্ময়তা গুণে সমৃদ্ধ। কবিতার মধ্যেই আত্মচিন্তা প্রতিফলিত হয়, নাটক ও উপন্যাস নৈর্বক্তিক রচনা বলে পরিচিত। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের গীতিকাব্যের মধ্যে যেমন তাঁর গভীর উপলব্ধিকে অনুভব করা যায়, নাটক ও উপন্যাসেও তাঁর ভাবনার স্পর্শ পাওয়া যায়। 'গোরা' উপন্যাস আকারে বৃহৎ, যুগের চেতনা ও পরিবেশ সৃষ্টিতে মহাকাব্যের সমধর্মী, কিন্তু এখানেও রবীন্দ্রনাথ তাঁর হৃদয়কে মেলে ধরেছেন। অনেকে অবশ্য বলেন উপন্যাসে লেখক ধরা দেনই। হয়তো খানিকটা সত্য। ঘটনার মিল থাকে না বোধ হয়—তবে লেখকের জীবন-সত্য অনেক সময় প্রকাশ পায়। যে উপন্যাসে লেখকের জীবন সত্য সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ পায় তাকে আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস বলা হয়। বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পথের পাঁচালী'তে, শরৎচন্দ্রের 'শ্রীকান্ত'তে এবং রবীন্দ্রনাথের 'গোরা'তে এরকম জীবনসত্য প্রতিফলিত হয়েছে।

'গোরা'র মধ্যে আর একটি বিষয় বিস্তারিত হয়েছে। 'গোরা' সাধারণ রোজকার ছোটখাট সুখ দুঃখ ভুলে গিয়ে বড় কিছু পাবার আকাঙ্ক্ষায় সর্বদা উত্তেজিত হয়ে থাকতো। রোজকার জীবনের মধ্যে দিয়ে বড় কিছুকে পাবার

আকাঙ্ক্ষা রবীন্দ্রনাথের কাছে বরণীয় কিন্তু আমাদের জীবনের ছোট সুখ সাধ বাদ দিয়ে আদর্শের পিছনে ছুটে বেড়াবার কথাকে তিনি সমর্থন করেননি। 'গোরা' যতক্ষণ idea র ফানুস ছিল তখন খালি চিৎকার। তারপর যখন idea-র বাঁধন কাটিয়ে উঠলো, মাটির পৃথিবীতে পা দিয়ে দাঁড়ালো, সুচরিতার প্রেমের মধ্যে মুক্তি পেয়ে গেল।

বৃহৎ আকৃতির জন্যও 'গোরা' রবীন্দ্র উপন্যাসের মধ্যে স্বতন্ত্র। আকৃতি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ সতর্ক ছিলেন কিনা বলা যায় না তবে তাঁর যে এবিষয়ে একটা নিজস্ব মতবাদ ছিল, তা জানা যায়।

"রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন যে, বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলির আয়তনই সাধারণভাবে উপন্যাসের আদর্শ আয়তন। তাঁহার মতে উপন্যাস ওর বেশি দীর্ঘ হইলে বাধ্য হইয়া বাজে মালে ভর্তি করিতে হয়, আবার ওর চেয়ে কম হইলে কাহিনী হাত পা মেলিবার অবসর না পাইয়া অন্ধকূপে পীড়িত হইতে থাকে। পরবর্ত্তী কালের ঔপন্যাসিকগণ রবীন্দ্রনাথের এ পরামর্শ গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। শরৎচন্দ্রের একাধিক উপন্যাস বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের তুলনায় গুরুতর। এমনকি রবীন্দ্রনাথের পক্ষেও সর্বত্র নিজের নির্দেশ মানা সম্ভব হয় নাই। চোখের বালি ও নৌকাডুবি বঙ্কিমী উপন্যাসের ওজনেই প্রস্তুত, কিছু ইতর বিশেষ হইতে পারে, কিন্তু গোরা সত্যিই গুরুভার ; বঙ্কিমচন্দ্রের কোন উপন্যাস গোরার আয়তনে পৌঁছায় নাই। কিন্তু এই একখানি ব্যতিক্রম ছাড়িয়া দিলে রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসগুলি অতিকায়িক নয়, সুস্থ ব্যক্তির দোহারা দেহের মতো ওদের গড়ন, ওজন আর একটু বেশি হইলে স্থূল বলা যাইত। ওজন আর একটু কম হইলে লোকে কৃশ বলিত।" (রবীন্দ্র বিচিত্রা—রবীন্দ্রনাথের খণ্ডোপন্যাস—প্রমথনাথ বিশী—২৮ পৃঃ। তৃতীয় প্রকাশ ১৩৬৮, ওরিয়েন্ট)।

এই পর্বের তিনটি উপন্যাস 'চোখের বালি', 'নৌকাডুবি' ও 'গোরা'—সর্বাধিক প্রচলিত বিবৃতিমূলক পদ্ধতিতে রচিত। 'চোখের বালি' ও 'নৌকাডুবির' ভাষা ছিল সম্পূর্ণ সাধু। কিন্তু 'গোরা'র সংলাপ কথ্য ভাষায় আর বিবৃতি সাধুভাষায়।

'চোখের বালি'র কাহিনী কয়েকটি লোকের মধ্যে সীমাবদ্ধ। অর্থাৎ পরিবারের গণ্ডী ছাড়িয়ে এর বিস্তৃতি ঘটেনি। সামাজিক অবিচারের জন্যে পারিবারিক শান্তি কিভাবে বিঘ্নিত হয় সেটাই লেখক যদিও দেখাতে

চেয়েছিলেন তবুও সমস্ত সমাজের কথা আনেননি। একটি পরিবারের কথা বলতে সমাজকে যতখানি আনা দরকার ততটাই এনেছেন। 'নৌকাডুবি'তে সমাজের চেহারা আরও একটু স্পষ্ট, আরও একটু বিস্তৃতি ঘটেছে। আর 'গোরা'য় তার চরম বিস্তৃতি। 'গোরা'য় সমস্ত বাংলা দেশের সামাজিক অবস্থার একটা আভাস পাওয়া যায়। পরিবার তথা সমাজ, ধর্মীয় সংস্কার তথা সমাজ আর সবশেষে রাজনীতি, পরিবার, ধর্ম ও সমাজ তাঁর আলোচনার মুখ্য বিষয়। তবে মূল বিষয় তিনটির এক। নর নারীর প্রেমকে অবলম্বন করে কাহিনী গড়ে উঠেছে।

নামকরণে প্রতিটি উপন্যাসের মধ্যে নতুনত্ব আছে। 'চোখের বালি'— নায়িকার পাতান নাম থেকে এসেছে, 'নৌকাডুবি' নামটি উপন্যাসের প্রধান একটি ঘটনার থেকে এসেছে আর 'গোরা' নামটি উপন্যাসের নায়কের। নামকরণে বরাবরই রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত বিচার বিবেচনার পরিচয় দিয়েছেন। 'চোখের বালি' উপন্যাসের ঘটনাকে চরম পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছে বিনোদিনী। কিন্তু তার 'চোখের বালি'র জ্বালাময় সত্তাই উপন্যাসের উল্লেখযোগ্য অবস্থার জন্য দায়ী তাই বিনোদিনা নামের চেয়ে এই পাতান নামটি সার্থক। নৌকাডুবি না হলে 'নৌকাডুবি'র কাহিনী সম্পূর্ণ অন্যরকম হ'ত। এই দুটি উপন্যাসের কাহিনী নিয়ন্ত্রণে ঐ মহিলা ও ঘটনাটির ভূমিকা সব থেকে প্রয়োজনীয় তাই নামকরণ সম্পূর্ণ সার্থক। 'গোরা' উপন্যাসের কাহিনী নায়ক গোরার আত্মবিকাশের কাহিনী। উপন্যাসের প্রথমে তাকে নিজের মতবাদের দ্বারা আচ্ছন্ন গণ্ডীবদ্ধ অবস্থায় দেখি। পরে ক্রমশঃ তার মনের প্রসারতা দেখা যায়। সুচরিতার প্রেম তার কাঠিন্যকে সহজ করে আনে। তার জন্ম বৃত্তান্ত একেবারে সব বাধা সরিয়ে দেয়। গোরার এই মুক্তি, আত্মার উন্মোচনের কথা, বইটির প্রধান বিষয় বলে 'গোরা' নাম সার্থক।

'চোখের বালি' ও 'নৌকাডুবি' উপন্যাসের আরম্ভের আগে কোন ভূমিকা নেই। অকস্মাৎ আরম্ভ হয়েছে। কিন্তু 'গোরা' উপন্যাস আরম্ভের আগে লেখক সুন্দর একটু ভূমিকা করে নিয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথের গদ্যর ভাষাও কবিতার মত কাব্যগুণ সম্পন্ন। বর্ণনার উজ্জ্বলতায়, ভাবের বিস্তৃতিতে ও গভীরতায় অতুলনীয়। 'গোরা'য়—'চোখের বালি'রও 'নৌকাডুবি'র মত সর্বত্র অতখানি কাব্যগুণ নাই। সহজ মধুর ভাষা, ওজস্বিনী ভাষা আছে, সে তুলনায় বর্ণনা অল্প। তবু দুই একটি জায়গা অবশ্যই

উল্লেখযোগ্য। কাব্যগুণ তো আছেই, উপমার আধুনিকতা লক্ষ্য করার মত। —"বর্ষার সন্ধ্যায় আকাশের অন্ধকার ভিজিয়া ভারি হইয়া পড়িয়াছে। বর্ণনাহীন বৈচিত্র্যহীন মেঘের নিঃশব্দ শাসনের নিচে কলিকাতা শহর একটা প্রকাণ্ড নিরানন্দ কুকুরের মতো লেজের মধ্যে মুখ গুঁজিয়া কুণ্ডলী পাকাইয়া চুপ করিয়া পড়িয়া আছে।" (গোরা—৭ পৃঃ) আর এক জায়গায় লিখেছেন —"ভোরে উঠিয়া বিনয় দেখিল রাত্রির মধ্যেই আকাশ পরিষ্কার হইয়া গেছে। সকাল বেলাকার আলোটি দুধের ছেলের হাসির মতো নির্মল হইয়া ফুটিয়াছে। দুই-একটা সাদা মেঘ নিতান্তই বিনা প্রয়োজনে আকাশে ভাসিয়া বেড়াইতেছে।" (গোরা—২৬ পৃঃ, জন্মশতবার্ষিক সং, ৯ম খণ্ড)।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর সাহিত্যের বহু স্থানে মানব জীবনের উপর প্রকৃতির প্রভাবের কথা আলোচনা করেছেন। 'গোরা'তেও আমরা তাঁর সেই মতটি ব্যক্ত হতে দেখি। ২১ অধ্যায়ে গোরার উপর রাত্রির প্রকৃতির প্রভাব লক্ষণীয়। যে গোরা প্রকৃতি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন সেই গোরা প্রকৃতির মধ্যে তার নতুন অনুভূতিকে পায়।

"আজ এই বৃহৎ বিশুদ্ধ প্রকৃতি গোরার-শরীর-মনকে যেন অভিভূত করিয়া দিল। গোরার হৃদপিণ্ডের সমান তালে আকাশের বিরাট অন্ধকার স্পন্দিত হইতে লাগিল। প্রকৃতি এতকাল ধৈর্য ধরিয়া স্থির হইয়া ছিল—আজ গোরার অন্তঃকরণের কোন্ দ্বারটা খোলা পাইয়া সে মুহূর্তের মধ্যে এই অসতর্ক দুর্গটিকে আপনার করিয়া লইল। এতদিন নিজের বিদ্যা বুদ্ধি চিন্তা ও কর্ম লইয়া গোরা অত্যন্ত স্বতন্ত্র ছিল—আজ কী হইল! আজ কোন্খানে সে প্রকৃতিকে স্বীকার করিল এবং করিবামাত্রই এই গভীর কালো জল, এই নিবিড় কালো তট, ওই উদার কালো আকাশ তাহাকে বরণ করিয়া লইল! আজ প্রকৃতির কাছে কেমন করিয়া গোরা ধরা পড়িয়া গেছে।………… …
… ..ইহা কি তাহার বিরুদ্ধ? সংগ্রাম করিয়া ইহাকে কি পরাস্ত করিতে হইবে? এই বলিয়া গোরা মুষ্টি দৃঢ় করিয়া যখনই বদ্ধ করিল অমনি বুদ্ধিতে উজ্জ্বল, নম্রতায় কোমল, কোন্ দুইটি স্নিগ্ধ চক্ষুর জিজ্ঞাসু দৃষ্টি তাহার মনের মধ্যে জাগিয়া উঠিল—কোন্ আনন্দ্যসুন্দর হাতখানির আঙুলগুলি স্পর্শ সৌভাগ্যের অনাস্বাদিত অমৃত তাহার ধ্যানের সম্মুখে তুলিয়া ধরিল; গোরার সমস্ত শরীরে পুলকের বিদ্যুৎ চকিত হইয়া উঠিল। একাকী অন্ধকারের মধ্যে এই প্রগাঢ় অনুভূতি তাহার সমস্ত প্রশ্নকে, সমস্ত দ্বিধাকে একেবারে নিরস্ত

করিয়া দিল। সে তাহার এই নূতন অনুভূতিকে সমস্ত দেহ মন দিয়া উপভোগ করিতে লাগিল—ইহাকে ছাড়িয়া সে উঠিতে ইচ্ছা করিল না।" (গোরা—১০৩-১০৪ পৃ:)

এখানে লেখক খুব সন্তর্পনে গোরার মধ্যের যৌবনকে, তার প্রেম ব্যাকুলতাকে সামান্য ইঙ্গিতে অনুভব করিয়েছেন। প্রকৃতির মধ্যে এসে সে তার অন্তরের গভীর একটা ভাবকে যেন একটু স্পর্শ করতে পারে। প্রথম প্রেমানুভূতি ও অন্তর্দ্বন্দ্ব সামান্য সঙ্কেতে সুন্দর ব্যক্ত হয়েছে। এখানেই নিপুণ শিল্পীর নৈপুণ্য। বিশ্বপতি চৌধুরী মশাই এই অংশটুকু সম্বন্ধে বলেছেন।

"এইভাবে এই ভাবজগতের ধ্যানমগ্ন মানুষটির প্রথম চিত্তচাঞ্চল্যের চিত্র অঙ্কিত করিতে গিয়া রবীন্দ্রনাথ অতি সন্তর্পণে নিপুণ হস্তে সূক্ষ্ম তুলি চালাইয়াছেন, পাছে তাহার রসরূপ স্পষ্ট বিশ্লেষণের স্থূলত্বের দ্বারা ক্ষুণ্ণ হয়।" (কথা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ—বিশ্বপতি চৌধুরী—৬৮ পৃ:, মিত্র ও ঘোষ)।

রবীন্দ্রনাথের পরিহাস প্রবণতার প্রমাণ 'গোরা'র মত সিরিয়াস উপন্যাসেও পাওয়া যায়। মহিমের এক একটা মন্তব্য, তার ধারণা ও বলবার ধরণ থেকে লেখকের পরিহাস প্রবণতা ও ব্যঙ্গ চাতুর্য ধরা পড়েছে। বাঙালি চাকুরিয়ার বাঁধা চরিত্রের একটা ছক যেন তার মধ্যে দিয়ে দেখিয়েছেন। হরিমোহিনী দেবীর দেবর কৈলাশও গ্রামের লোকের type চরিত্র হিসাবে উল্লেখযোগ্য। তার মধ্যে দিয়েও লেখকের রসিক মনের পরিচয় মেলে।

'গোরা' উপন্যাসের চরিত্র চিত্রণ ও কাহিনীর গঠনে কোন ত্রুটি নেই। 'নৌকাডুবি'তে মিলন যেন অনেকটা মিলিয়ে দেওয়া ব্যাপার বলে মনে হয়। কিন্তু 'গোরা'র কাহিনীতে শৈথিল্য নেই, আপত্তিকর কোনত্রুটি নেই। তবে গোরার বক্তৃতার অংশ প্রথম দিকে আর একটু সংক্ষিপ্ত হলে বইটি আরও আকর্ষণীয় হ'ত সন্দেহ নেই।

'গোরা'র চরিত্র সৃষ্টিতে অভিজ্ঞতা ও বিশ্লেষণী শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। গোরা এই উপন্যাসের নায়ক। তার চরিত্রের ক্রমবিকাশ ও আত্মার মুক্তি দেখাতে নৈপুণ্য দেখিয়েছেন ঠিকই তার থেকেও উল্লেখযোগ্য যে এই বৃহৎ উপন্যাসের ছোট বড় প্রতিটি চরিত্রই লেখকের সম্পূর্ণ মনোযোগ পেয়েছে। প্রতিটি চরিত্র কি নারী কি পুরুষ অত্যন্ত যত্নের সৃষ্টি। পুরুষ চরিত্রের মধ্যে পরেশবাবুর চরিত্র ও নারী চরিত্রের মধ্যে আনন্দময়ীর চরিত্র আদর্শবাদের জন্য সমালোচকদের দ্বারা খানিকটা ত্রুটিপূর্ণ বলে আলোচিত। এঁদের কোথাও

কোন দুর্বলতা না দেখানোয় সাধারণ মানুষ না হয়ে মহামানবের মত হয়েছে। অন্য সমস্ত চরিত্র দোষে গুণে ও দুর্বলতায় আমাদের কাছের মানুষ। কাহিনীর পরিণতিতে সকলের প্রয়োজন অনস্বীকার্য।

'গোরা' উপন্যাসের একটি বিষয় নিয়ে সমালোচক ও পাঠকবর্গ অত্যন্ত চিন্তান্বিত—কেন কবি গোরাকে আইরিশম্যান করে তৈরী করলেন। এ সম্পর্কে বিখ্যাত সমালোচক ডঃ সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্তর লেখাতে পাই—"গোরার আলোচনায় গোড়ায় দুইটি বিষয়ের মীমাংসা করিয়া লইতে হইবে। প্রথমটি গোরার জন্ম, দ্বিতীয় তাহার তর্ক। গোরাকে কবি আইরিশম্যান করিয়া কেন সৃষ্টি করিলেন ইহা লইয়া প্রশ্ন উঠিয়াছে। কেহ কেহ মনে করেন যে রবীন্দ্রনাথ বুঝিয়াছেন যে বাঙালী চরিত্রের দৃঢ়তা ও শক্তি থাকিতে পারে না এবং এই দিক দিয়া দেখিতে গেলে ইংরেজেরা যে আমাদের অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ এই তথ্যের প্রতিপাদন করাই এই উপন্যাসের উদ্দেশ্য। আবার অনেকে এই বলিয়া আপত্তি করিয়াছেন যে রবীন্দ্রনাথের এই পক্ষপাতিত্ব স্বদেশদ্রোহিতার পরিচায়ক। অনেকদিন পূর্বে ৺জিতেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কবির সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া এই প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছিলেন। সাক্ষাৎকারের বর্ণনা দিয়া স্বর্গীয় বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় যে প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন তাহা অনেক দিন পূর্বে পড়িয়াছিলাম, এখন তাহার যথাযথ পুনরুক্তি করিতে পারিব কিনা বলিতে পারি না। যতদূর মনে হয় বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কবিকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন—গোরা ও বিনয় আবাল্য সুহৃৎ; বিনয় একজন কৃতবিদ্য বাঙালী-যুবক; গোরার সঙ্গে সে বহুকাল একত্রে রহিয়াছে এবং এক সঙ্গে কাজ করিয়াছে। অথচ উভয়ের চরিত্রে পার্থক্যের সীমা নাই। ইহা হইতে আমরা কি এই সিদ্ধান্ত করিব না যে বাঙালীর বিশ্বাসের দৃঢ়তা নাই? সে সমস্ত মন দিয়া দেশকে ভালবাসিতে পারে না? কবি উত্তর করিয়াছিলেন যে এইরূপ কোন উদ্দেশ্য তাঁহার ছিল না। গোরাকে যে তিনি আইরিশম্যান করিয়া সৃষ্টি করিয়াছিলেন তাহার মধ্যে কোন গভীর উদ্দেশ্য ছিল না: উহা শুধু গল্পের প্রয়োজনে করিতে হইয়াছিল, 'গোরা'য় যদি কোন বিশেষ তত্ত্ব তিনি প্রকাশ করিতে চাহিয়া থাকেন, তাহা হইতেছে গোরা ও পরেশের চরিত্রে পার্থক্য দেখান। গোরার মধ্যে উত্তেজনার আবেগ আছে,কিন্তু পরিপূর্ণ সত্যোপলব্ধির শান্তি নাই; তাহার পরিচয় পাই পরেশের জীবনে ও চরিত্রে। গোরার জন্ম রহস্য গল্পের গোড়ার কথা; কিন্তু চরিত্র সৃষ্টির সঙ্গে যে তাহার

কোন মৌলিক সংস্রব নাই, তাহা একটু অনুধাবন করিলেই অনুমিত হইবে। এই উপন্যাস যে সৌভ্রাতৃত্ববিস্তার তত্ত্বের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, এমন কোন ইঙ্গিত কোথাও নাই; গোরার রক্ত যে ভারতীয় রক্ত নহে তাহা কবি উপন্যাসের আরম্ভেই বলিয়াছেন, কিন্তু তাহার জন্মের সঙ্গে তাহার চরিত্রের সম্বন্ধ আছে এমন কথা কোথাও বলা হয় নাই। গোরার জন্মের দ্বারা শুধু একটি লোকের চরিত্রের পরিণতি প্রভাবান্বিত হইয়াছে। তিনি হইতেছেন আনন্দময়ী, অথচ তাঁহার সঙ্গে গোরার রক্তের সম্পর্ক নাই।" (রবীন্দ্রনাথ—সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত ৩০২—৩০৩ পৃঃ—এম, সি, সরকার অ্যাণ্ড সন্স লিঃ—তৃতীয় সংস্করণ)।

গোরাকে আইরিশম্যান করা সম্পর্কে মনে হয় কবির সচেতন মন কাজ করেনি। অবচেতনভাবে কবি প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন। আমাদের তখনকার বৃটিশের অধীনতা ও স্বাধীন হবার আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে আইরিশদের অবস্থা ও আকাঙ্ক্ষা এক ছিল। তাছাড়া তাদের দেশপ্রেম ও স্বাজাত্যবোধ তৎকালের ভারতীয় রাজনীতিবিদ ও দেশপ্রেমিকদের মুখ্য আলোচ্য বিষয় ছিল। রবীন্দ্রনাথ তাঁর দাদা জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নেতৃত্বে যে সঞ্জীবনী সভার সভ্য হয়েছিলেন সেখানেও আইরিশ দেশপ্রেমিকদের জীবনী ও কার্যকলাপ আলোচিত হত। মনে হয় তাই একজন দেশপ্রেমিক আঁকতে গিয়ে অজ্ঞানিত ভাবেই তিনি আইরিশম্যান এঁকেছেন। তাছাড়াও আইরিশ লেডী সিষ্টার নিবেদিতার শুদ্ধ তেজদীপ্ত চরিত্র তাঁকে নিষ্ঠা, ঐকান্তিকতা ও দেশপ্রেমের আদর্শ হিসাবে গোরাকে সৃষ্টি করতে উৎসাহ যুগিয়েছে মনে হয়।

তৎকালীন বৃটিশ সরকারের জুলুমবাজী শাসনবিধির দণ্ডাদেশ থেকে সরে থাকার জন্যেও গোরাকে এরকমভাবে সৃষ্টি করতে পারেন। কারণ সোজাসুজি তাকে ভারতীয় বাঙালী করে তার মুখ দিয়ে অতখানি জ্বলন্ত দেশপ্রেমের আদর্শ প্রচার করলে শাসকদের টনক নড়ার ভয় থাকে। কিন্তু আমাদের অবস্থা ও আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে সম্পূর্ণ সাদৃশ্যযুক্ত একটি ইউরোপীয় জাতকে বেছে নেওয়ায় একটা আবরণ দিয়ে বলা যায়, অথচ শাসকদের দৃষ্টিতে দোষনীয় বলে আক্রান্ত হবার ভয় নেই।

"রবীন্দ্রনাথ নিজেই শ্রীযুক্ত দিলীপকুমার রায়কে লিখিয়াছেন "আমার এই দুটি নভেলে (গোরা ও ঘরে বাইরেতে) মনস্তত্ত্ব, রাষ্ট্রতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়ের বিবিধ আলোচনা আছে সে কথা কবুল করতেই হবে। সাহিত্যের তরফ থেকে বিচার করতে হলে দেখা চাই য সেগুলি জায়গা পেয়েছে না জায়গা

জুড়েছে।" (রবীন্দ্রনাথ-সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত, ৩০৩ পৃঃ—তৃতীয় সংস্করণ—এম, সি, সরকার অ্যাণ্ড সন্স লিঃ)।

রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রীয়, সামাজিক ও ধর্মবোধের এক পরিণত চিন্তার বাহন 'গোরা'। তাই এর ঐতিহাসিক মূল্য আছে। সাহিত্যিক বিশ্লেষণে দেখা যায় 'গোরা'—চরিত্র চিত্রনে, কাহিনী বিন্যাসে,' পরিহাস প্রবণতায়, ভাষার ওজস্বিতায়—সার্থক রচনা। তবে গোরার বক্তৃতা আর একটু সংক্ষিপ্ত হলে উপন্যাসের সংহতরূপ প্রকাশ পেত ও আরও আকর্ষণীয় হত বলে মনে হয়।

॥ ১২ ॥

॥ "ত্রয়ী" নামকরণ ও বৈশিষ্ট্য ॥

১৮৬৫ সালে 'দুর্গেশনন্দিনী' প্রকাশের আগে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভার বিশেষ কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। এটি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গসাহিত্যে তাঁর স্থান নির্দ্দিষ্ট হয়ে যায়। 'দুর্গেশনন্দিনী,' 'কপালকুণ্ডলা' ও 'মৃণালিনী'— প্রথম পর্বের এই উপন্যাসগুলিতে কবি বঙ্কিমের সৌন্দর্য সৃষ্টির প্রেরণা দেখা যায়। অতীতের রোমান্সধর্মী কাহিনীর মধ্যে উচ্চ আদর্শপূর্ণ চরিত্র থাকলেও এগুলিতে সৌন্দর্য ভিন্ন অন্য উদ্দেশ্যের সন্ধান পাওয়া যায় না।

'বিষবৃক্ষ' ও অন্যান্য উপন্যাস তাঁর ২য় পর্বের রচনা (১৮৭৩—১৮৮২)। এর কিছু আগে ১৮৭২ থেকে বঙ্কিমের সম্পাদনায় 'বঙ্গদর্শন' প্রকাশিত হয়। বঙ্কিমচন্দ্র বুঝতে পেরে'ছলেন উপন্যাস রোজকার জীবনের উপর দাঁড়িয়ে আছে। তাই কেবল অতীতের দূরত্বে তাকে সরিয়ে রাখলে পরিপূর্ণতা আসতে পারে না। সমসাময়িক সমাজ ও সমস্যাকে এড়িয়ে না গিয়ে সেই পটভূমিকায় উপন্যাসকে দাঁড়াতে হবে। কাহিনীর মাধ্যমে সমস্যার আলোচনা প্রয়োজন। 'বিষবৃক্ষ' প্রথম সংখ্যা থেকে 'বঙ্গদর্শনে' ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হতে থাকে। এই পর্বের 'ইন্দিরা', 'রাধারাণী', 'রাজসিংহ (ছোট) ও 'যুগলাঙ্গুরীয়'কে ঠিক উপন্যাস বলা যায় না—বড় গল্প বলা যায়। পরে অবশ্য 'রাজসিংহ' পূর্ণ উপন্যাসের মর্য্যাদা লাভ করে। 'বিষবৃক্ষ', 'কৃষ্ণকান্তের উইল', 'চন্দ্রশেখর', 'রজনী' ও 'রাজসিংহ' (পরিবর্দ্ধিত) বঙ্কিমের উপন্যাস সম্ভারের শ্রেষ্ঠ সম্পদ।

তৃতীয় পর্বের উপন্যাস 'আনন্দমঠ', 'দেবীচৌধুরাণী' ও 'সীতারাম'। এই শেষ পর্বে কবি বঙ্কিম, সৌন্দর্যসাধক বঙ্কিমের সঙ্গে দেশের ও জাতির অভিভাবক যুক্তিনিষ্ঠ স্বদেশপ্রেমিক বঙ্কিম মিলিত হয়েছেন। এগুলির মধ্যে তিনি জাতি গঠনের উদ্দেশ্য নিয়ে এক তত্ত্ব প্রচার করেছেন। এই তিনটি উপন্যাসের বক্তব্যের ঐক্য লক্ষ্য করে এদের 'ত্রয়ী' বলা হয়। বেশীর ভাগ সমালোচক এই উপন্যাস তিনটিকে উদ্দেশ্যমূলক রচনা বলে ত্রুটিপূর্ণ বলেছেন। আবার অনেকে পরিণত লেখকের বক্তব্য হিসাবে বিশেষ মূল্য দিয়েছেন।

"প্রথমোক্ত দলে রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র এবং শেষোক্ত দলে শ্রীঅরবিন্দ,

পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় ও মোহিতলাল প্রভৃতি।" (সাহিত্য সাধক চরিতমালা—২২০—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—৬৬পৃঃ, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ)।

পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ই বোধ হয় প্রথম এই উপন্যাস তিনটিকে একত্রে 'ত্রয়ী' নামে সমালোচনা করেন। ('নারায়ণ'—বৈশাখ, ১৩২২)।

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর তৃতীয় উপন্যাস 'মৃণালিনী'তে প্রথম দেশাত্মবোধের কথা লেখেন, কিন্তু তখনও দেশাত্মবোধের কোন গভীর অনুভূতির দেখা পাওয়া যায় না। 'চন্দ্রশেখরে'ও দেশাত্মবোধকে ছাড়িয়ে উপন্যাসের কাহিনী বড় হয়েছে। 'কমলাকান্তর দপ্তরে' স্বদেশপ্রেমিক বঙ্কিম ও হাস্যরসিক বঙ্কিম এক হয়ে মিশে গিয়েছেন। 'কমলাকান্ত'র অসামাজিকতার মধ্যে তাঁর প্রতিভা পূর্ণ আত্মপ্রকাশের সুযোগ পেয়েছে। 'আমার দুর্গোৎসব' ও 'একটি গীত' প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের জাতীয় ভাবনার পরিচয় মেলে। 'আমার দুর্গোৎসব' কাহিনীর কাঠামোয় 'আনন্দমঠ'রূপে পরিপূর্ণ রূপ নিয়েছে। আনন্দমঠে তিনি বিদ্রোহকে প্রশ্রয় দেননি, স্বাভাবিক সহজ শান্ত অবস্থাকে স্থাপন করতেই চেয়েছেন। দেশের অরাজক অবস্থার বিরুদ্ধে সাময়িক বিদ্রোহ দেখিয়েছেন। বিদ্রোহের আসল উদ্দেশ্য যদিও হিন্দুরাজ্য স্থাপন কিন্তু তা সম্ভব হয়নি। কারণ সমাজ তখনও রাজ্য শাসনের উপযুক্ত নয়। তাই তিনি ইংরেজের হাতেই শাসনের ভার দিতে চেয়েছেন। অর্থাৎ তিনি বোঝাতে চেয়েছেন স্বাধীন রাজ্য স্থাপনের পূর্বে উপযুক্ত সমাজ ব্যবস্থা ও প্রস্তুতি প্রয়োজন।

সমস্ত জীবনভোর পাশ্চাত্য দর্শন, ভারতীয় দর্শন ও ধর্মশাস্ত্র পাঠ করে তাঁর মনে সামঞ্জস্যপূর্ণ এক নতুন ধর্মবোধ জেগেছিল। তিনি হিন্দুধর্মের গুঢ়তত্ত্ব সম্বন্ধে যা অনুভব করেছিলেন 'ধর্মতত্ত্ব' গ্রন্থে তা বিশ্লেষণ করে লিখেছেন—আর 'ত্রয়ী'তে সেটাই তিনি কাহিনীর মধ্যে দিয়ে উপস্থিত করেছেন।

"বঙ্কিম বলিয়াছেন ভগবদ্গীতায় যাহা উপদেশ, বিষ্ণুপুরাণে তাহা উপন্যাসচ্ছলে স্পষ্টীকৃত। (ধর্মতত্ত্ব ১৯, ৯৫ পৃঃ) তাঁহারই ভাষায় বলা যাইতে পারে যে, ধর্মতত্ত্বে যাহা উপদেশ, 'আনন্দমঠ' দেবীচৌধুরাণী' ও 'সীতারামে' তাহাই উপন্যাসচ্ছলে স্পষ্টীকৃত। 'ত্রয়ী'তে বঙ্কিম শুধু নীতিবেত্তা নহেন, তিনি ধর্মোপদেষ্টা" (উপন্যাস সাহিত্যে বঙ্কিম—শ্রীপ্রফুল্ল কুমার দাশগুপ্ত—প্রথম প্রকাশ—সান্যাল এণ্ড কোম্পানী—৩১ পৃঃ)।

প্রথম জীবনে বঙ্কিমচন্দ্র, কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য ও যোগেশ ঘোষের মত কোঁত্ ভক্ত ছিলেন। পরে পাশ্চাত্য মনীষীদের মতবাদের সঙ্গে গীতার বাণীর সামঞ্জস্য বিধান করে একটি নতুন মত—মানবধর্ম বা মনুষ্যত্ব ধর্ম প্রকাশ করেন। চরিত্রের বিকাশের জন্য শারীরিকী, জ্ঞানার্জ্জনী, কার্যকারিণী ও চিত্তরঞ্জনী—এই চাব বৃত্তির কথা বলেছেন। এগুলি অনুশীলন দ্বারা পাওয়া যায়। অনুশীলনতত্ত্বের মূল কথা সামঞ্জস্য রেখে অনুশীলন করতে হবে যাতে কোন একটি বৃত্তি প্রাধান্য না পায়। ঈশ্বরে ভক্তি আর ফলের আশা না রেখে নিষ্কাম কর্মসাধনাই সামঞ্জস্য। গীতার ধর্মের মূল কথা ভক্তি। 'ত্রয়ী'তে এই ভক্তিতত্ত্বই প্রচারিত হয়েছে। সত্যানন্দ সন্ন্যাসী হয়েও দেশের সেবার জন্য বিদ্রোহের নেতা। বঙ্কিমের দৃষ্টিতে তাঁর শিক্ষা অসম্পূর্ণ। সাধনায় সিদ্ধিলাভের জন্য 'জীবন সর্বস্ব' শেষ কথা নয়—ভক্তিই শেষ কথা। তাই মহাপুরুষের আহ্বানে তাঁকে হিমালয়ে যেতে হয়েছে। কারণ সমাজ প্রস্তুত না হলে কেবল বিদ্রোহে দেশের মঙ্গল হতে পারে না।

'দেবীচৌধুরাণী'তে তিনি মানুষের চিত্তশুদ্ধি ও চিত্তসংযমের উপর জোর দিয়েছেন। 'আনন্দমঠে' ভক্তির নির্দেশ দিয়ে শেষ করছেন, 'দেবীচৌধুরাণীতে' প্রফুল্ল চরিত্রে ভক্তিব বা নিষ্কাম সাধনার বাস্তবরূপ দিতে চেয়েছেন। এখানে বঙ্কিমচন্দ্র 'অনুশীলন' 'ধর্মতত্ত্ব' ও 'কৃষ্ণ-চরিত্রের' ব্যাখ্যাতা। কৃষ্ণকে আদর্শ চরিত্র হিসাবে সামনে স্থাপন করে বৃত্তির অনুশীলন করতে বলেছেন।

বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন—"আগে অনুশীলন ধর্ম পুণর্মুদ্রিত তৎপরে কৃষ্ণচরিত্র পুণর্মুদ্রিত হইলে ভাল হইত। কেননা, 'অনুশীলন ধর্ম' যাহা তত্ত্বমাত্র, কৃষ্ণচরিত্রে তাহা দেহবিশিষ্ট। অনুশীলনে যে আদর্শে উপস্থিত হইতে হয়, কৃষ্ণচরিত্র কর্মক্ষেত্রস্থ সেই আদর্শ। আগে তত্ত্ব বুঝাইয়া তারপরে উদাহরণের দ্বারা তাহা স্পষ্টীকৃত করিতে হয়। কৃষ্ণচরিত্র সেই উদাহরণ।

বঙ্কিমচন্দ্র এখানে সব কথা বলেননি অন্যত্র বলেছেন; অনুশীলন ও কৃষ্ণচরিত্র মাঝখানে 'দেবীচৌধুরাণী'। অনুশীলনে তত্ত্ব, দেবীতে কাল্পনিক দেহ এবং কৃষ্ণচরিত্রে ঐতিহাসিক দেহ। একধারায় আনন্দমঠ, দেবীচৌধুরাণী ও কৃষ্ণচরিত্র। দুই ধারা পরস্পরকে একবার সন্ধিস্থানে অতিক্রম করেছে দেবীচৌধুরাণীতে। এইজন্য দেবীর একটু বিশেষ গুরুত্ব।" (বঙ্কিম সরণী—প্রমথ নাথ বিশী—দেশ ৪০ সংখ্যা, ১৩৭৩—৫০ পৃঃ)।

'দেবীচৌধুরাণী'র অনুশীলন যদি রাজ্য পরিচালনার গুণ হিসাবে ধরা যায় তবে তা ব্যর্থ হয়েছে। 'আনন্দমঠ' ও 'দেবীচৌধুরাণী' এই বই দুটির মাধ্যমে বঙ্কিম বলতে চেয়েছেন, নতুন সমাজ অর্থাৎ বুদ্ধিজীবী মধ্যবিত্তশ্রেণীর সচেতন ও সংঘবদ্ধ অনুশীলন ভিন্ন দেশের রাজনীতির পরিবর্তন সম্ভব নয়। রাজশক্তির দ্বারা দেশের শিক্ষা, উৎপাদন সমস্ত নিয়ন্ত্রিত হয়। তাই ইংরেজের হাতে তিনি রাজ্য শাসনের ভার দিয়ে প্রস্তুতি পর্ব চালাতে বলেছেন। আমাদের দেশে সে সময় দেশাত্মবোধের বা স্বাজাত্যবোধের কোন স্পষ্ট ভাবধারা বা রাজনৈতিক সচেতনা বিশেষ কিছু ছিল না। 'সীতারামে' দেখা যায় প্রজারা রাজার উত্থান পতনে সম্পূর্ণ নিরাসক্ত, নির্বিকার। তাই মাত্র একজন দেশনায়কের পক্ষে রাষ্ট্রশক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে কোন স্থায়ী অবস্থা আনা সম্ভব হয়নি। সীতারাম নিজের প্রচণ্ড শক্তিতে রাজ্যস্থাপন করেন। কিন্তু সে রাজ্য তাঁর নিজেরই দুর্বলতার জন্য ভেঙ্গে পড়ে। শ্রীর প্রতি রূপমোহ সীতারামের মত শক্তিধরের পতনের কারণ। সেক্সপীয়ারের ট্রাজেডির অপ্রতিরোধনীয় নিয়তির খেলা অলক্ষ্যে সীতারামকে পরিচালিত করেছে। বঙ্কিম 'দেবীচৌধুরাণী'তে নারীর নিষ্কাম ধর্মের অনুশীলন দেখিয়েছেন, আর সীতারামে পুরুষের অনুশীলনের প্রয়োজনীয়তা বুঝিয়েছেন, অন্যথায় সীতারামের মত শক্তিধর পুরুষকেও অন্তরের দুর্বলতার জন্য হেরে যেতে হয়।

ধর্ম ও রাজনীতিকে তিনি একই সুত্রে গাঁথতে চেয়েছেন। ধর্মীয় আচরণ বা অনুশীলন দ্বারা প্রস্তুত হয়েই দেশমাতৃকার সেবায় লাগতে হবে; আর এই তিনটি উপন্যাসের বক্তব্য—সুষ্ঠু সচেতন সমাজ সৃষ্টি না হলে রাজনৈতিক আন্দোলন ব্যর্থ হতে বাধ্য।

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর উপন্যাসগুলিতে মানব জীবনের মূল কথা নিয়ে আলোচনা করেছেন। পরিণত বয়সের লেখাগুলিতে আরও অন্তর্মুখী ভাবনায় ভাবিত হয়েছেন। 'কমলাকান্ত'তে এক জায়গায় বলেছেন, 'এজীবন লইয়া কি করিব? সমস্ত জীবন কেবল ইহারই উত্তর খুঁজিয়াছি। উত্তর খুঁজিতে খুঁজিতে জীবন প্রায় কাটিয়া গিয়াছে।' "ত্রয়ী" রচনার কালে তিনি যেন এই জিজ্ঞাসায় ব্যাকুল হয়ে উঠেছিলেন। দেশাত্মবোধ, নরনারীর হৃদয়ের দুর্বলতা ও মনুষ্যত্ব তাঁর চিন্তায় প্রাধান্য পেয়েছে।

"দপ্তরে কথিত, রূপবহ্নিতে দগ্ধ নগেন্দ্রনাথ ও গোবিন্দলাল; ইন্দ্রিয়বহ্নিতে রোহিণী, দেবেন্দ্রনাথ ও হীরা; জ্ঞানবহ্নিতে চন্দ্রশেখর; (অস্তি) মান বহ্নিতে

ভ্রমর, ভোগবহ্নিতে সীতারাম, ধন ও মান বহ্নিতে আওরেঙ্গজেব।" বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে "সংসার বহ্নিময়। এই সময় থেকে সাহিত্য সৃষ্টির অপর উদ্দেশ্যটাও ক্রমে প্রবল হয়ে উঠেছে। সত্য ও ধর্মই সাহিত্যের উদ্দেশ্য।" "সাহিত্য ধর্ম ছাড়া নহে। কেননা সাহিত্য সত্যমূলক। যাহা সত্য, তাহা ধর্ম। সূক্ষ্ম বিচারে নামলে দেখা যাবে যে সত্যে, ধর্মে ও সৌন্দর্যে মূলগত পার্থক্য নাই, তবে পার্থক্য দাঁড়ায় ঝোঁকের ফলে। 'ত্রয়ী'তে ঝোঁকটা ধর্ম ও সত্যের উপরে;" (বঙ্কিম সরণী-প্রমথনাথ বিশী-দেশ ৩৪ বর্ষ ৩ সংখ্যা, ১৩৭৩ সাল—২৬৩ পৃঃ)।

'ত্রয়ী'র এই তিনখানি উপন্যাসে তিনি নরনারীর চিরকালের লীলার কথা বলেছেন, তার থেকে মুক্তির উপায় হিসাবে চিত্তের অনুশীলন দ্বারা নিষ্কাম কর্মসাধনা অর্থাৎ অনাসক্তি যোগের দিকেও নির্দেশ দিতে চেয়েছেন আর এই উপায়েই সমস্যার সমাধান হওয়া সম্ভব মনে হয়।

রবীন্দ্রনাথের মানসিকতা ভিন্ন ভিন্ন পর্বে কাব্যে, গানে, নাটকে ও ছোট গল্পে বিচিত্ররূপ গ্রহণ করেছে। বিপুল রচনা সম্ভারের মধ্যে তাঁর উপন্যাসগুলিও কাব্যসৌন্দর্য ও তীক্ষ্ণ মননধর্মী আধুনিক বক্তব্যে পর্ব থেকে পর্বান্তরে নতুন নতুন স্বাদে ও সৌন্দর্যে আপন বৈশিষ্ট্যে ও বৈচিত্র্যে ভরপুর। রবীন্দ্রকাব্যের মত উপন্যাসেও পর্ব থেকে পর্বান্তরে যাবার লক্ষণ দেখা যায়।

রবীন্দ্র-উপন্যাসকে প্রধানতঃ তিনটি পর্বে ভাগ করা যায়। প্রথম পর্বে 'বৌঠাকুরানীর হাট' এবং 'রাজর্ষি'। দ্বিতীয় পর্বে 'চোখের বালি', 'নৌকাডুবি' ও 'গোরা'। এরপরের সমস্ত উপন্যাসগুলিকে তৃতীয় পর্বের অন্তর্ভুক্ত করা যায়। প্রথম থেকে দ্বিতীয় পর্বের সময়ের ব্যবধান ষোল বছরের।

এই দ্বিতীয় পর্বের উপন্যাস রচনার সময় রবীন্দ্রনাথ এক মানসদ্বন্দ্বে অস্থির হয়েছিলেন। এই উপন্যাসগুলি আরম্ভ হবার কিছু আগে থেকে তিনি হিন্দুত্বের ভাবোচ্ছ্বাসে ভরপুর ছিলেন। এই সময়কার বিশিষ্ট মানসিক চিন্তাধারার বাহক হিসাবে এই উপন্যাসগুলির বৈশিষ্ট্য আরও পরিস্ফুট। তাই বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ', 'দেবীচৌধুরাণী' ও 'সীতারাম'কে যেরকম বঙ্কিমচন্দ্রের 'ত্রয়ী' বলা হয় রবীন্দ্রনাথের বিশেষ সময়ের এক চিন্তাসূত্রে গ্রথিত এই উপন্যাস তিনটি—'চোখের বালি', 'নৌকাডুবি' ও 'গোরা'কেও রবীন্দ্রনাথের 'ত্রয়ী' আখ্যা দেওয়া যায়।

দেশের রাজনৈতিক অবস্থার ক্রম অবনতি, বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠের'

জাতীয়তাবাদের প্রভাব, দেশের শিক্ষিত মহলের বিদেশী শাসকদের ব্যবহারে প্রচণ্ড মনোক্ষোভ, সাম্প্রদায়িক গোলমালের সূচনা ও সাধারণ লোকের অবস্থা দিন দিন খারাপ হতে থাকায় রবীন্দ্রনাথের মনেও দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। দেশের সাধারণ লোকের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা বা দেশাত্মবোধের উন্মেষ কিভাবে ঘটান যায় সে কথা তখনকার মনীষীরা চিন্তা করেছিলেন। প্রথম যুগে যেমন জাতির মনে স্বাজাত্যবোধ জাগানোর জন্য অতীতের গৌরবময়, বীরত্বপূর্ণ কাহিনীর অবতারণা করা হয়েছিল, তেমনি এই সময়ের স্বদেশ ভাবনায় ভাবুকরা মনে করেছিলেন 'হিন্দুর ভাব' বা হিন্দুজাতীয়তার একটি একতার ভাবকে জাগ্রত করতে পারলে এদেশের বিপুল জনশক্তিকে সংঘবদ্ধ করা যাবে। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় ও অন্যান্য বরেণ্য দেশ-প্রেমিকরা হিন্দুত্বের এক উন্নত আদর্শ তুলে ধরতে চাইলেন। রবীন্দ্রনাথও এই সময় প্রাচীন ভারতবর্ষের তপোবন ও বর্ণাশ্রম ধর্মকে প্রকাশ্যে সমর্থন করতে থাকেন। তিনিও হিন্দুত্বের পুনর্গঠন সম্পর্কে প্রচারে মন দিলেন। হিন্দুত্বের জয়গান গাওয়ার পিছনে স্বামী বিবেকানন্দ ও ভগিনী নিবেদিতার প্রভাবও কাজ করেছে বলে মনে হয়। বিশেষ করে নিবেদিতার প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। সে যুগের বুদ্ধিজীবিরা যাঁরা তাঁর সংস্পর্শে এসেছেন তাঁদের উপরই তিনি অসীম প্রভাব বিস্তার করেছেন। নিবেদিতা মনে করতেন ভারতের জাগরণের জন্য হিন্দুত্বের আদর্শ স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা আছে। গোরা চরিত্রে স্পষ্টতঃ নিবেদিতার চরিত্রের দৃঢ়তা, আবেগপ্রবণতা ও আত্মবিশ্বাস লক্ষ্য করা যায়। 'চোখের বালি' ও 'নৌকাডুবিতে' তিনি হিন্দু আদর্শের উপর নরনারীর সম্পর্ক স্থাপন করতে চেয়েছেন।

'নৈবেদ্য' রচনার সময় থেকেই রবীন্দ্রনাথ প্রাচীন ভারতীয় পারিবেশে ঘুরেছেন। তিনি ছিলেন রোমাণ্টিক কবি। তাই স্বভাবতঃই বর্ত্তমানের কঠোর সত্যের চাইতে অতীতের ছায়াচ্ছন্নলোকে বা ভবিষ্যতের এক অপরূপ কল্পনায় বিভোর হতে ভালবাসতেন। এই কাল্পনিক জগতের প্রতি মোহের ফলে প্রাচীন ভারতের সব কিছুকেই তিনি মধুর দৃষ্টি দিয়ে দেখলেন। 'নৈবেদ্য'র যুগে তিনি বর্ত্তমান ভারতে প্রাচীন ভারতের ভাবধারা প্রবর্ত্তনের কথা সর্বদা ভাবতে থাকেন। কাব্যে এই মত প্রকাশের স্থান অল্প হওয়াতে প্রবন্ধ ও পরে উপন্যাসে এই ভাব ফোটাতে চেয়েছেন। 'বিনোদিনী' গল্পটি 'চোখের বালি' উপন্যাসে রূপান্তরিত হবার আগে কেমন ছিল জানা যায় না। জানতে ইচ্ছে করে

বিনোদিনী কি তাঁর এই নতুন ভাবনার জন্যই কামনা বাসনা ত্যাগ করে সন্ন্যাসিনী হয়েছে না 'চোখের বালিতে' রূপান্তরিত হবার আগেই তার এই রকম পরিণতি ছিল। সমগ্র রবীন্দ্রসাহিত্যে প্রেমের এমন জ্বালা, এরকম তীব্রতা ও ঈর্ষা আর দেখা যায়নি বললেই চলে। 'চতুরঙ্গের' দামিনীর মধ্যে খানিকটা প্রকাশ্যভাব থাকলেও এমনটি রবীন্দ্র সাহিত্যে আর দেখা যায়নি। কবি প্রেমের শান্ত মঙ্গলময় রূপই সর্বত্র দেখিয়েছেন, এখানেও কি তাঁর সেই ভাব শেষে ফিরে এসেছে? সব মানুষেরই পরিবর্তন হতে পারে আর বিনোদিনীর মত মেয়ের পক্ষে সে পরিবর্তন হয়তো রাতারাতিই সম্ভব তবুও সংশয় থেকে যায় যে হিন্দুত্বের আদর্শের জন্যই কি বিনোদিনীকে তিনি কল্যাণী নারী মূর্তিতে ফিরিয়ে এনেছেন?

'নৌকাডুবি'র মধ্যে এই অনুমান আরও দৃঢ় হয়। 'চোখের বালি'তে বিনোদিনী হঠাৎ রূপান্তরিত দেখে অনেকে যেমন হতাশ হয়েছেন তেমনি 'নৌকাডুবি'র পরিণতিও যেন ঠিক স্বাভাবিক নয়। রমেশ ও কমলার মিলনের অল্প পরেই রমেশের সম্পর্ক জেনে সরে থাকা স্বাভাবিক। হেমনলিনী সম্বন্ধে তার আগের আগ্রহ ফিরে আসাও অস্বাভাবিক নয়। হেমনলিনীকে না পেয়ে আবার কমলার দিকে সরে যেতে চাওয়ার মধ্যেও কোন খুঁত নেই। কমলার রমেশের প্রতি এতদিনকার আগ্রহ ও ভালবাসা, সম্বন্ধের বাঁধন সেই জানামাত্র একেবারে বিরূপ হয়েছে, এটা অস্বাভাবিক হয়তো নয়, কারণ কমলা গ্রামে মানুষ হয়েছে তাই তার কাছে ধর্ম ও সংস্কার বড় এবং রমেশের ব্যবহারে অনেকদিন ধরেই তার মনে ক্ষোভ জমা হচ্ছিল। রমেশ তাকে চিঠি লিখে জানিয়েছে যে তার কাছে ধরা দেবে, আর এদিকে তখন সে আসল সম্বন্ধ জেনেছে। তখন তার রমেশকে নীচ মনে হওয়া অস্বাভাবিক নয়। পনরো বছরের মেয়ের পক্ষে রমেশের ত্যাগের ও অন্তর্দ্বন্দ্বের কথা উপলব্ধি করা সম্ভব নয় তাই বিরূপ হয়ে চলে যেতে পারে। নলিনাক্ষর প্রতি হিন্দু মেয়ের আজন্মের সংস্কার হিসাবে আগ্রহ দেখা দিলেও দ্বিধাশূন্য হয়ে স্বামীকে আত্মসমর্পণ করার মধ্যে সন্দেহ জাগে। রমেশের জন্য তার একটুও কষ্ট হয়নি? এখানেও কি হিন্দুত্বের জন্য তিনি কমলাকে একেবারে দ্বিধাহীন করে স্বামীর ঘরে পাঠিয়েছেন? না তার মনে যে বিরূপতার বীজ স্টীমার থেকে দেখা গিয়েছিল সেটাই ক্রমশঃ পরিপূর্ণ রূপ নিয়ে রমেশকে একেবারে আলাদা করে দিয়েছে,

তাই দ্বিধা আসেনি ? তবে একথা মানতেই হবে তাঁর উদ্দেশ্য থাকলেও আর্ট দুটি বইয়েরই বজায় আছে।

'গোরা' উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ হিন্দুত্বের বিশ্বাস নিয়ে যতখানি জোরে ও প্রকাশ্যে এগিয়েছেন ততখানি স্পষ্টভাবে অন্যদুটিতে নয়। তবে 'গোরা'র আসল গৌরব এই আবহাওয়া থেকে মুক্তি। নিবেদিতার চরিত্রের ছায়া গোরা চরিত্রে পড়েছে একথা অনস্বীকার্য। ঐ পাশ্চাত্ত্য মহিলাকে হিন্দু হবার সাধনা করতে দেখেই তাঁর মনে গোরা চরিত্র রূপগ্রহণ করে। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা তাঁকে এমন জীবন্ত চরিত্র গঠনে সাহায্য করেছে। কিন্তু তিনি শিল্পী তাই তিনি নিবেদিতার চরিত্রের প্রভাবে প্রথম দিকটায় প্রভাবান্বিত হলেও ধীরে ধীরে তাকে অতিক্রম করে নিজের মনের কল্পনা ও আদর্শ দিয়ে তাকে পূর্ণ পরিণতি দিয়েছেন, তাঁর মানসিক আচ্ছন্নতা কাটিয়ে উঠেছেন। সেই প্রথমযুগে যেমন তাঁর মনে হয়েছিল "হৃদয় আজি মোর কেমনে গেল খুলি, জগৎ আসি সেথা করিছে কোলাকুলি" তেমনি আবার 'গোরা'য় এসে হিন্দুত্বের গণ্ডি অতিক্রম করে সর্বমানবের মধ্যেই ভারতের মুক্তি অনুভব করলেন। উপন্যাসের মধ্যে ধীরে ধীরে এই জাগরণের প্রবাহ লক্ষ্য করা যায় গোরা তার জন্ম বৃত্তান্ত জানা মাত্রই আকস্মিকভাবে মত পরিবর্ত্তন করেনি। সুচরিতাকে দেখার পর থেকে তার অন্তরে পরিবর্ত্তনের সূচনা দেখা দেয়। নিজের দুর্বলতাকে জয় করার জন্যই তার বিদেশ যাত্রা। চর ইস্‌লাম্‌পুরে গিয়ে মানুষের দুঃখ দুর্দশা দেখে, উচ্চবর্ণের লোকদের স্বরূপ বুঝতে পেরে মানুষকে ভালবাসার আগ্রহ আরও বাড়ে। তার হিন্দুত্বের অভিমান যেন আঘাত পায়। জেলে তার অন্তরের পরিবর্তন হয় আরও সহজে। আত্মবিশ্লেষণ করে সে নিজের মনকে যেন ছুঁতে পারে। বিনয়ের বিয়ের সময় তার পরিবর্ত্তন আরও ধরা পড়ে। সে জোর করে নিজেকে ধরে রাখলেও মনের প্রবণতা অনুভব করে। সুচরিতার সংস্পর্শে এসে তার মনে আগে থেকেই সত্যকে স্বীকার করার আগ্রহ ছিল। জন্ম পরিচয় তাকে দ্রুত এগিয়ে নিয়ে গিয়েছে। গোরা চরিত্র আলোচনা করলে দেখা যায় তার হিন্দুত্বের মধ্যে ধর্মের আকর্ষণ কাজ করেনি দেশের প্রতি তীব্র ভালবাসা ও বিদেশী শাসকদের অত্যাচারের উত্তর হিসাবে তার এই হিন্দুত্বের অনুষ্ঠান। প্রথম জীবনে গোঁড়া হিন্দুর আচরণ নিয়ে তাকে রসিকতা করতে দেখা গিয়েছে, কেশবচন্দ্র সেনের বক্তৃতার প্রতি তার আগ্রহ ছিল কিন্তু পরে শাস্ত্র চর্চা করে পত্রিকায় হিন্দুধর্মের স্বপক্ষে লিখে

তার মনে হয় ভারতীয় জাতীয়তাবোধ জাগরণের জন্য এই অনুষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা আছে। এই জায়গায় ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের সঙ্গেও যেন একটু সাদৃশ্য দেখতে পাই। রবীন্দ্রনাথ রাজনৈতিক নেতাদের মত জাতীয়তা-বোধের সমর্থক ছিলেন না। তাই উগ্র জাতীয়তায় আচ্ছন্ন থাকতে পারেননি। গোরার অন্তর্দ্বন্দ্ব, সাধনা ও মুক্তি রবীন্দ্রনাথের মানসিক দ্বন্দ্ব, সাধনা ও মুক্তি। জাতীয়তার মধ্যেই বিশ্বমানবত্বের চিরন্তন মহিমাকে অনুভব করেছে গোরা। তৎকালীন রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রভাব ও জাতীয়তাবোধের সমস্যায় রবীন্দ্রনাথ 'চোখের বালি', 'নৌকাডুবি' ও 'গোরা' পর্বে ক্ষত বিক্ষত হয়েছেন। 'গোরা'র প্রথম অংশ রবীন্দ্র-অন্তর্দ্বন্দ্বের সাক্ষ্য বহন করেছে। কিন্তু ধীরে ধীরে তিনি এই সঙ্কীর্ণ গণ্ডী অতিক্রম করে তাঁর মনের চিরসত্যের মধ্যে মুক্তি পেয়েছেন।

'ত্রয়ী' রচনার আগে রবীন্দ্র-কাব্য-সাধনার ও বাংলার সামাজিক সংকটের সময়—এই সংকটের প্রভাব রবীন্দ্রসাহিত্যেও পড়েছে। 'গোরা'য় প্রথমদিকে এই প্রভাবের তীব্রতা দেখা দেয়। অনেকে মনে করেন শান্তিনিকেতন স্কুল সৃষ্টির পিছনে ইংরাজী ও পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রতি বিরাগ কাজ করেছে। কিন্তু আসলে তিনি 'নৈবেদ্য' রচনার সময় থেকে যে প্রাচীন ভারতীয় পরিমণ্ডলে ভ্রমণ করেছিলেন এটা তারই পরিচয় বহন করে। প্রাচীন ভারতের ত্যাগ তাঁকে মুগ্ধ করে। কালিদাস ও অন্যান্য প্রাচীন কবিও রবীন্দ্রনাথকে অনেকখানি প্রভাবিত করেছেন। তাঁর ধারণা হয়েছিল তপোবনের পদ্ধতিতে বর্ত্তমান ভারতে শিক্ষা প্রচলন করলে সেই অতীতের মহিমা ফিরে আসবে। শান্তিনিকেতন স্থাপনের অল্প পরেই তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে প্রাচীন ধারা বর্ত্তমানে অচল, তাই সে পথ তিনি ত্যাগ করেছিলেন। গোরার সমস্যা ও তার সমাধান যেন লেখকেরই সমস্যার সমাধান।

বঙ্কিমচন্দ্রের এক বিশেষ ভাবনা—জাতীয়তাবোধ ও ধর্মতত্ত্বের বাণী, বহন করেছে 'আনন্দমঠ', 'দেবীচৌধুরানী' ও 'সীতারাম'। তাই এই তিনটি উপন্যাসকে 'ত্রয়ী' নামে উল্লেখ করেছিলেন পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়। তারপর থেকেই এই উপন্যাস তিনটি 'ত্রয়ী' নামে প্রতিষ্ঠিত। এদের চিন্তাধারা ও সঙ্গতি লক্ষ্য করে নামকরণ সম্পূর্ণ সার্থক বলা যায়।

রবীন্দ্রনাথও তাঁর ২য় পর্বে যে তিনখানি উপন্যাস লেখেন তাতে প্রাচীন ভারতের আদর্শের প্রতি লক্ষ্য রেখে তৎকালীন ভারতীয় জাতীয়তাবাদের

সমস্যা সমাধান করতে চেয়েছেন। বঙ্কিমচন্দ্র যেমন 'ত্রয়ী'তে তাঁর জীবনসত্য, জাতীয়তাবোধ ও অনুশীলনতত্ত্ব তথা সমন্বয়বাদ পরিবেশন করেছেন, রবীন্দ্রনাথও তেমনি এই বই তিনটিতে তাঁর জাতীয় ভাবনা ও ধর্মবোধ তথা বিশ্বমানবতাবোধকে পরিবেশন করেছেন। এই তিনটি উপন্যাসের ভাবধারার প্রতি লক্ষ্য রেখে 'চোখের বালি', 'নৌকাডুবি' ও 'গোরা' উপন্যাস তিনটিকে রবীন্দ্রনাথের 'ত্রয়ী' বলা হয়েছে। এই উপন্যাস তিনটির সঙ্গতি ও পারম্পর্য লক্ষ্য করে নামকরণ সম্পূর্ণ সার্থক হয়েছে বলা যায়।

বঙ্কিমচন্দ্রের ঐতিহাসিক পটভূমিকা রচনা ও কালগত আবহাওয়া সৃষ্টির ক্ষমতা ছিল অপরিসীম তাই তিনি নিজের বক্তব্যকে ঐতিহাসিক কাহিনীর মধ্যে উপস্থিত করেছেন। রবীন্দ্রনাথ প্রথম যুগে ইতিহাস আশ্রিত পটভূমিকায় উপন্যাস লিখেছিলেন কিন্তু সেখানে তাঁর প্রতিভা যেন ঠিক মুক্তি পায়নি। সামাজিক উপন্যাসে তাঁর বক্তব্য সুপরিস্ফুট হয়েছে ; আর ইতিহাসের দিকে ফিরে যাননি। এই দিক থেকে দু জনের 'ত্রয়ী'র পার্থক্য আছে।

একটু মন দিয়ে লক্ষ্য করলেই দেখা যায় যে দুই মনীষীই তাঁদের উপন্যাসের মাধ্যমে দেশের মানুষকে যে কথা জানাতে চেয়েছেন তা এই যে মানবিকতা ও জাতীয়তার বিরোধ নেই। আর দেশের মানুষের চারিত্রিক উন্নতি ভিন্ন স্বাধীনতার মূল্য নেই। বঙ্কিমের মতে শিক্ষা ও সংযম দ্বারা চরিত্রের দৃঢ়তা না এনে দেশের দশের উন্নতি তো হয়ই না নিজের পতনও অনিবার্য। রবীন্দ্রনাথ নব্য হিন্দুত্বের মধ্যে দিয়ে তৎকালীন সমস্যার সমাধান করতে গিয়ে বিশ্বমানবিকতার মধ্যেই মুক্তির পথ দেখেছেন। দু জনের কালের ব্যবধান বক্তব্যকে কিছুটা ভিন্ন করলেও রাতারাতি স্বাধীনতা না চেয়ে দেশের মানুষের চারিত্রিক উন্নতি কামনা করার মধ্যে একমত লক্ষ্য করা যায়। রবীন্দ্রনাথ জাতীয়তাবাদের থেকে মানবিকতাকে বরাবরই উচ্চে বসিয়েছেন। বঙ্কিমচন্দ্রও বলতে চেয়েছেন দেশ ও জাতির সংগঠন না হলে জাতীয়তা রক্ষা হয় না। বঙ্কিমের সময়ে জাতীয়তা অনেকটা ideaর আকারে ছিল। তাই তিনি যা স্পষ্ট অনুভব না করেছেন রবীন্দ্রনাথের পক্ষে তাকে প্রত্যক্ষভাবে অনুধাবন করা অনেক সহজ হয়েছে। রাজনীতিবিদ্‌দের মত তাই ইংরেজ শাসনের উচ্ছেদের জন্য উভয়েই খুব জোরের সঙ্গে লড়েননি। বঙ্কিমচন্দ্র চাকরী বাঁচাবার জন্য দ্বিধাগ্রস্ত বলে একদল সমালোচক দ্বারা নিন্দিত। রবীন্দ্রনাথও সমকালীন সমস্যাকে এড়িয়ে পলায়নী মনের পরিচয় দিয়েছেন বলে অনেকের মত। কিন্তু তাঁরা দুজনেই

জাতির জীবনের সবচেয়ে বড় সমস্যাকে অত হাল্কাভাবে দেখেননি। অনেক চিন্তার সুপরিণত ফল হিসাবেই বঙ্কিমচন্দ্র তৎকালীন সমস্যার সমাধানের জন্য জাতিকে অনুশীলনের মাধ্যমে আত্মিক উন্নতি করতে বলেছেন, অন্যথায় স্বাধীনতা মূল্যহীন। সেদিনের কথা আজ আমাদের কাছে পরম সত্য বলে বোঝবার দিন এসেছে। রবীন্দ্রনাথ মানবিকতাকে সমস্ত কিছুর উপরে স্থান দিয়েছেন। তাঁর জাতীয়তা আন্তর্জাতিকতার নামান্তর। সেদিন সেটা পলায়নীবাদ বলে নিন্দিত হলেও আজ পরম বরণীয় ও চরম সত্য বলে প্রমাণিত হচ্ছে। এই দুইজন সম্বন্ধে রবীন্দ্র-জীবনীকার লিখেছেন—

"বঙ্কিমের নিকট রবীন্দ্রনাথ যে কত বিষয়ে ঋণী ছিলেন তাহার সম্পূর্ণ গবেষণা এখনো হয় নাই; কিন্তু আলোচনা হইলে দেখা যাইবে বহু বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমকে অনুবর্ত্তন করিয়া তাঁহার আরব্ধ কার্য সংচালিত করিয়াছিলেন। এর সঙ্গেই বলা উচিত উভয়ের জীবনাদর্শ বা দার্শনিক ও ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি সম্পূর্ণ পৃথক ছিল, সুতরাং তাহাদের মধ্যে মিল হইতে অমিল মিলিবে বেশি। তবে একথা নিশ্চিত যে সাহিত্যের মধ্যে দিয়া দেশপ্রীতি উদ্‌বোধন বিষয়ে উভয়ে সহধর্মী।" (রবীন্দ্রজীবনী—১ম খণ্ড, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, সংশোধিত সংস্করণ—১৩৬৭ পৌষ—বিশ্বভারতী, ৩৬৪ পৃঃ)।

দুই মনীষীর প্রতিভার মধ্যে পার্থক্য আছে—একথা সম্পূর্ণ সত্য "বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভা মূলত extrovert, বহির্মুখী। তাঁর ভাষা পেশীবহুল, উপন্যাসগুলির প্যাটার্ণ নাটক ও এপিক মিলিয়ে গঠিত। তুলনায় রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা মূলত introvert, অন্তর্মুখী। তাঁর ভাষার প্রধান লক্ষণ নমনীয়তা, কবিতা তো বটেই, এমনকি নাটক, উপন্যাস, গল্পগুলিও লিরিক ধর্মাক্রান্ত।" (বঙ্কিম সরণী-প্রমথনাথ বিশী-দেশ ৩৪ বর্ষ-২৬ কার্ত্তিক-১৩৬৩ বঙ্গাব্দ, ১৬৯ পৃঃ)।

'ত্রয়ী' দ্বয়ের মধ্যে দুজনের এই ভিন্ন প্রতিভার লক্ষণ আছে। আমরা পৃথক পৃথক আলোচনা করে দেখেছি যে রূপে, আঙ্গিকে ও ভাষার পার্থক্য থাকলেও ভাবনায় একটা যেন যোগাযোগও আছে। দুই ভিন্ন যুগের পটভূমিকায় কিছু পার্থক্য অনিবার্য তবু সাদৃশ্যের পরিমাণও নগণ্য নয়। দুজনেই 'ত্রয়ী'তে মানবজীবনের প্রেমকে বড় করে দেখিয়েছেন, প্রেমের শক্তি যে কতখানি এই উপন্যাসগুলিতে তা ব্যক্ত করেছেন।

দুই মনীষীই তাঁদের এই রচনাগুলির মাধ্যমে তাঁদের কালকে অতিক্রম

করে ভাবীকালের মধ্যে বাণীকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তাই 'ত্রয়ী' দ্বয়ের ঐতিহাসিক, সাহিত্যিক ও দার্শনিক মূল্য অপরিসীম। দুজনেই উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে রচনায় হাত দিয়েছিলেন কিন্তু তাঁদের প্রতিভার গুণে তা শিল্পের মর্য্যাদা পেয়েছে।

— —

॥ গ্রন্থপঞ্জী ॥

(গবেষণাপত্রে বিশেষভাবে ব্যবহৃত)

বঙ্কিম প্রসঙ্গে

১। বঙ্কিম সরণী—প্রমথনাথ বিশী।

২। বঙ্কিম প্রসঙ্গ—সুরেশচন্দ্র সমাজপতি সঙ্কলিত। মুখার্জি বোস কোং।

৩। বঙ্কিমচন্দ্র—সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত। ৩য় সং, এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স।

৪। বঙ্কিমচন্দ্র—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ।

৫। বঙ্কিম মানস—অরবিন্দ পোদ্দার—ইণ্ডিয়ানা লিঃ। ১ম সংস্করণ।

৬। রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ—শ্রীশিবনাথ শাস্ত্রী। এস, কে. লাহিড়ী এণ্ড কোং।

৭। উপন্যাস সাহিত্যে বঙ্কিম—শ্রীপ্রফুল্ল কুমার দাশগুপ্ত। সান্যাল এণ্ড কোং। ১ম প্রকাশ।

৮। বঙ্কিমচন্দ্র ও মুসলমান সমাজ—রেজাউল করিম। ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং কোং লিঃ।

৯। বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা—শ্রী শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

১০। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস—সুকুমার সেন—২য় খণ্ড। ইষ্টার্ণ পাবলিশার্স—চতুর্থ সংস্করণ।

১১। চরিতকথা—রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী—দাশগুপ্ত এণ্ড কোং। ৭ম সংস্করণ।

১২। বঙ্কিমচন্দ্র—শ্রীযুক্ত অক্ষয় কুমার দাশগুপ্ত, কবিরত্ন, এম, এ।

১৩। রামকৃষ্ণের জীবনী—রেঁামারেঁালা—অনুবাদ-ঋষি দাস। ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি। ৩য় সং।

১৪। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস। সমালোচনা। শ্রীশিবানন্দ, প্রথম প্রকাশ—১৩৫৭।

১৫। বঙ্কিম রচনাবলী—১ম ও ২য় খণ্ড—যোগেশচন্দ্র বাগল সম্পাদিত।

রবীন্দ্র প্রসঙ্গে—

১। রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ সমাজ—শিবনাথ শাস্ত্রী, নিউ এজ পাবলিশার্স লিঃ।

২। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর—অজিত কুমার চক্রবর্ত্তী। ইণ্ডিয়ান প্রেস, এলাহাবাদ (১৯১৬)

৩। সাহিত্য সাধক চরিতমালা, ৩য় খণ্ড। দেবেন্দ্রনাথ-সংখ্যা ৪৫। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ।

৪। রবীন্দ্রনাথ—ডঃ সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত—এম. সি, সরকার অ্যাণ্ড সন্স। ৩য় সং।

৫। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও স্বরচিত জীবন চরিত—সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী সম্পাদিত। ৩য় সং।

৬। বড়বাবু—সৈয়দ মুজতবা আলী—মিত্র ও ঘোষ, ১ম সংস্করণ, ২য় মুদ্রণ।
৭। জোড়াসাঁকোর ধারে—অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও রাণী চন্দ, বিশ্বভারতী-চৈত্র
৮। ভবঘুরে ও অন্যান্য—সৈয়দ মুজতবা আলী—বাক্ সাহিত্য-৩য় সংস্করণ।
৯। ঘরোয়া—অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও রাণী চন্দ, বিশ্বভারতী।
১০। রবীন্দ্রজীবনী ও রবীন্দ্রসাহিত্য প্রবেশক—শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়—১মখণ্ড। বিশ্বভারতী। সংশোধিত সংস্করণ
১১। রবীন্দ্র জীবনী ও রবীন্দ্রসাহিত্য প্রবেশক—শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়। ২য় খণ্ড।
১২। রবীন্দ্র সাহিত্যের পরিচয়—শচীন সেন—রীডার্স কর্ণার, ৩য় সংস্করণ।
১৩। রবীন্দ্র বিচিত্রা—প্রমথনাথ বিশী, ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি। তৃতীয় সংস্করণ,
১৪। রবীন্দ্র প্রতিভা—ক্ষুদিরাম দাস—পুঁথিঘর।
১৫। রবীন্দ্র সাহিত্যের ভূমিকা—নীহাররঞ্জন রায়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৪১।
১৬। ভগিনী নিবেদিতা—প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা, প্রকাশিকা। প্রব্রাজিকা শ্রদ্ধাপ্রাণা।
১৭। কথা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ—বিশ্বপতি চৌধুরী, মিত্র এণ্ড ঘোষ।
১৮। রবীন্দ্র দর্শন—হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, বিশ্বভারতী।
১৯। উপনিষদের পটভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ—শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত। মুখার্জি এণ্ড কোং। ১ম সংস্করণ।
২০। কালিদাস ও রবীন্দ্রনাথ—শ্রীবিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য—জিজ্ঞাসা, ১ম প্রকাশ।
২১। রবীন্দ্রনাথের জীবনবেদ—সত্যনারায়ণ মজুমদার। বুকল্যাণ্ড।
২২। রবীন্দ্রায়ণ—১মখণ্ড—পুলিন বিহারী সেন সম্পাদিত। বাক্ সাহিত্য।
২৩। তত্ত্ব কৌমুদী
২৪। উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব ও ভারতীয় জাতীয়তাবাদ—হরিদাস মুখোপাধ্যায় ও উমা মুখোপাধ্যায়।
২৫। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস-৩য় খণ্ড, সুকুমার সেন। ইষ্টার্ণ পাবলিশার্স।
২৬। বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা—শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, মডার্ণ বুক এজেন্সী। ৫ম সং।
২৭। নিবেদিতাকে যেমন দেখিয়াছি—সরলাবালা সরকার, রামকৃষ্ণ সারদা মিশন।
২৮। Heroines of Tagore—Bimanbehari Majumdar,
২৯। বিশ্বভারতী পত্রিকা—বৈশাখ, আষাঢ়
৩০। রবীন্দ্র রচনা—নৈবেদ্য, স্মরণ, উৎসর্গ, খেয়া, কথা ও কাহিনী, শিশু, গীতাঞ্জলি, নষ্টনীড়, দর্পহরণ, মাল্যদান, কর্মফল, মাষ্টারমশাই, গুপ্তধন, স্বদেশ সমাজ, পরিচয়, প্রাচীন সাহিত্য, আধুনিক সাহিত্য, ধর্ম, শান্তিনিকেতন, আত্মশক্তি ও সমূহ, রাজাপ্রজা, ভারতবর্ষ ও স্বদেশ, জীবনস্মৃতি, ছেলেবেলা, আত্মপরিচয়, লোকসাহিত্য, চরিত্রপূজা, বিচিত্র প্রবন্ধ, হাস্যকৌতুক, ব্যঙ্গকৌতুক, শারদোৎসব, প্রায়শ্চিত্ত, মুকুট, গোড়ায় গলদ, বৈকুন্ঠের খাতা, বৌঠাকুরাণীর হাট, রাজর্ষি।

—ভ্রম-সংশোধন—

পৃঃ	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৬	২৫	শতীশচন্দ্র	সতীশচন্দ্র
৭	২০	গোপিনী ভর্তা	গোপিনী-ভর্তা
২৩	২৮	সেই তেমনই	তেমনই সেই
২৯	১৮	আর শ্রীকৃষ্ণের এই প্রসঙ্গে	আর শ্রীকৃষ্ণের মধ্যেই তার পূর্ণ প্রকাশ দেখতে পেয়েছেন। এই প্রসঙ্গে
৩১	১	'স্বভাবধর্ম্ম'র পরে কমা থাকিবে না।	
৩১	২	স্বাতন্ত্র্যপ্রিয়তা কিন্তু সাহিত্যিধর্ম	স্বাতন্ত্র্যপ্রিয়তা, কিন্তু সাহিত্যিকধর্ম
৪৩	১২	১৮৮	১৮৮৬
৪৪	২১	রাজনারায়র্ণ	রাজনারায়ণ
৫০	২৪	প্রেমাবে	প্রেমাবেগ
৫৩	২৭	জাতীয় তাবোধের	জাতীয়তাবোধের
৫৩	২৯	আজকের দেনে	আজকের দিনে
৭৫	২০	তাঁর	তাঁর
৭৮	১৪	ব্রাহ্মন্দের	ব্রহ্মানন্দের
৮১	২৬	পূজাই	পূজার্হ
৮৬	১৬	১৩৩১	১৩০১
৯৪	৭	সাহিত্যার	সাহিত্যের
১০১	২৭	মহাষর	মহর্ষির
১০২	২৯	জোতিদাদ	জ্যোতিদাদা
১১২	২	উপয়ে	উপরে
১১৪	৪	মাঘোৎসবে সমান হবে গীত	মাঘোৎসবে গীত
১২৭	১৯	'স্মরণ'	'মরণ'

১২৮	১৫	১৩১	১৩১০
১২৮	২৫	৮ বৎসর	৮৯ বৎসর
১৩৫	২১	চেষ্টা করেছিলেন	চেষ্টা করেছিলেন।
১৩৫	২২	'স্বদেশী সমাজ'	'স্বদেশী সমাজে'
১৩৯	১৮	পাওয়া	পাওয়ায়
১৪২	১৫	দেশের লোকমান্য তিলক	লোকমান্য তিলক
১৪২	১৬	হয়। লোকের	হয়। দেশের লোকের
১৪৫	১৩	নররূপ	নবরূপ
১৪৫	১৭	কৌতুক দুই	কৌতুক, দুই
১৪৯	১৮	সৃষ্টি পাগ্‌লামি	সৃষ্টিতে পাগ্‌লামি
১৫১	২০	মধুর নামগুলি	নামগুলি
'৫১	২০	পছন্দ করে	পছন্দ করেছে।
১৫৬	১৮	ঊর্মিলা	ঊর্মিমালা
১৫৮	১৪	লাঞ্চিতত্ত	লাঞ্ছিতও
১৫৯	১৪	ওতোপ্রতোভাবে	ওতপ্রোতভাবে
১৬০	১৯	হাহাকার। প্রতিহিংসার চিত্র	হাহাকার ও প্রতিহিংসার চিত্র।
১৬০	৩০	এটির বিষময় ফলটি লেখক তুলে ধরেছেন। 'নৌকাডুবিতে'	—বাদ যাবে
১৬২	১৪	রহস্য মধুরচ রিত্র	রহস্যমধুরচরিত্র